কভার পেজ (উপরের অংশ)

প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ

আরিফ আজাদ

সূচিপত্র

কভার পেজ (পিছনের অংশ)

ঘুটঘুটে অন্ধকার! সেই অন্ধকার গ্রাস করে আছে সবকিছু। এমন সময় কোথা থেকে যেন ছুটে আসে এক উষ্ণ আলোক রশ্মি। সেই আলোর পরশে নিমিষেই মিলিয়ে যায় অন্ধকার রাত। প্রভাতী কিরণের মতোই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এই আলোক রশ্মি। যাত্রা হয় এক নতুন দিনের, নতুন সময়ের। এমনই আবহে সত্য ও পবিত্র পথের সন্ধানে দুঃসাহসিক অভিযাত্রার গল্প নিয়ে এগিয়ে যায় সাজিদ—আর অবিশ্বাসের দেয়ালে গেঁথে যায় বিশ্বাসের কথামালা। ভেঙে পড়ে অবিশ্বাসের দেয়াল। নির্মিত হয় সত্যের ইমারত। সত্য আর শুভ্রতার সেই গল্পে আপনিও একজন অংশীদার...

সমকালীন প্রকাশন

প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ

আরিফ আজাদ

প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ [২]

আরিফ আজাদ

প্রথম প্রকাশ

একুশে বইমেলা ২০১৯

একমাত্র পরিবেশক

চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ

বাঁধাই এবং মুদ্রণ

নুসরাহ পাবলিশিং সলিউশন : ০১৬১৪-১১১-০০০

ISBN: 978-984-94203-0-9

Published by Somokalin Prokashon, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 350.00 US $ 30.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবকিছু কেবল বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।

প্রকাশকের কথা

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই বিদ্যমান। সভ্যতার প্রতিটি যুগে, প্রতিটি সময়ে এবং প্রতিটি প্রেক্ষাপটে আমরা এই দ্বন্দ্বের লড়াই দেখতে পাই। দেখতে পাই তার চলমান ধারা। সত্য ও অসত্যের এই লড়াইয়ে সত্য সর্বসময় বিজয়ী হবে, এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছে। তাই, যখনই সভ্যতার মাঝে কোনো অসত্য, কোনো অবিশ্বাস ঝেঁকে বসেছে, তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেখানে সত্যের পক্ষে কথা বলার জন্য, সত্যের নিশান উড্ডীন করার জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তারা এসে মানুষকে সত্যের পথে ডেকেছেন। তাদের অনুপম স্পর্শে মুছে যেত অবিশ্বাস আর অসত্যের কালি। সত্যের আলোয় মুখরিত হয়ে উঠত অন্ধকার ধরণী। বিশ্বাসের সুশীতল বাতাস তারা বুলিয়ে দিতেন সকলের হৃদয়জুড়ে।

বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির। তথ্যপ্রবাহের অবাধ এবং স্বাধীন ব্যবহারের সুযোগে মানুষের জীবন যেমন সহজ হয়ে উঠেছে, তেমনি এই সহজলভ্যতা অস্থির করে তুলছে মানুষের অন্তরকে। তথ্যপ্রবাহের অবাধ ব্যবহারের এই সুযোগ পুঁজি করে ধর্মবিদ্বেষী একটি মহল খুবই চতুরতার সাথে সরলপ্রাণ মুসলিমদের মনে ঢুকিয়ে দিচ্ছে অবিশ্বাসের বিষ; হৃদয়-মনে বপন করে চলছে সন্দেহের বীজ। ইন্টারনেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের কৌশলী মিথ্যাচার। তাদের মিথ্যার বুলি ও প্রোপাগান্ডা এবং ইসলাম-বিদ্বেষী লেখাজোখা এমনভাবে আর এমন ঢঙে তারা উপস্থাপন করছে যে, সাধারণের কাছে তাদের কথাগুলোকে সত্য বলে মনে হতে পারে। তাদের এই মিথ্যার জালে পা দিয়ে ঈমানহারা হচ্ছে মুসলিম তরুণ-সমাজ।

ইসলামকে তারা পশ্চাদপদ, গোড়া, সেকেলে ও অসার এবং যুগের সাথে অসামঞ্জস্য প্রমাণ করতে চায়। এতে করে মুসলিম তারুণ্যকে তারা বোঝাতে চায়, আধুনিক জীবন মানেই হলো ঈশ্বর, ধর্ম ও ধর্মীয় জীবনাচরণমুক্ত জীবন ধারণ।

দুঃখের বিষয় হলো তাদের এরকম মিথ্যা ও প্রোপাগান্ডামূলক লেখালেখিতে প্রভাবিত হয়ে অনেক তরুণ-তরুণীরা বিপথে হাঁটছে। ধর্মকে তারা নিতান্তই মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত এবং খুবই আনকালচারড জ্ঞান করছে। তারা বেছে নিচ্ছে আধুনিকতার নামে ভ্রান্তিপূর্ণ বেহায়াপনার রাস্তা। নিজেরাও হয়ে উঠছে একেকজন চরম ও হিংসাত্মক ধর্মবিদ্বেষী। এভাবে, ইসলাম বিদ্বেষীদের ছড়ানো বিষবাষ্প গ্রাস করে নিচ্ছে আমাদের প্রজন্মকে। প্রজন্ম হয়ে পড়ছে অস্থির, দিশেহারা ও দিকভ্রান্ত।

প্রজন্মকে অস্থির ও ভ্রষ্ট গহ্বর থেকে বাঁচিয়ে তুলতে হলে দরকার তাদের নিয়ে কাজ করা। যে-মিথ্যা এবং প্রতারণার ফাঁদে তারা পা দিয়েছে, সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করতে হলে প্রয়োজন সেই মিথ্যা এবং প্রতারণার জাল উপযুক্ত ও ধারাল যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ছিন্ন করে দেওয়া। অবশ্যই সেটা করতে হবে তরুণদের মনস্তত্ত্ব বুঝে। তরুণরা কী চায় আর কীভাবে চায় সেটি প্রাধান্য দিয়ে এগোতে পারলেই তাদেরকে তুলে আনা যাবে বিভ্রান্তির ধ্বংসাত্মক মায়াজাল থেকে।

ইসলাম-বিদ্বেষী মায়াজাল ভেদ করে প্রজন্মকে সঠিক পথ দেখাতে যে ক'জন কাজ করে যাচ্ছেন, আরিফ আজাদ নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে একজন তরুণ তুর্কি। নিজে একজন তরুণ হয়ে তরুণদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে তিনি একদম ভুল করেননি। নাস্তিক তথা ইসলাম বিদ্বেষীদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে গিয়ে গৎবাঁধা প্রবন্ধ রচনা না করে, তিনি সেগুলোকে হৃদয়কাড়া গল্পে রূপ দিয়েছেন। পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখতে সেই গল্পগুলোতে রেখেছেন টানটান উত্তেজনা। 'সাজিদ' চরিত্রটি গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে তিনি সাজিয়েছেন সবগুলো গল্পের রহস্যময়ী-চিত্রপট। শুধু তাই নয়, গল্পগুলোর যে পরিবেশ আর কাহিনিপট, তা দেখলে যে-কারও মনে হবে, ওই গল্পের তিনিও একজন অংশীদার। পরিচিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে চেনাজানা মানুষগুলোর সাথে অনুসন্ধিৎসু আবহে এগিয়ে যায় গল্পের কাহিনি। এভাবেই সাজিদ রচনা করে যায় বিশ্বাসের পক্ষে যৌক্তিক কথামালা। সাজিয়ে যায় বিশ্বাসী হৃদয়ে ভালোবাসার পসরা। যুক্তি আর তথ্যের সাহায্যে কখনো-বা চুরমার করে দেয় অবিশ্বাসের অশুভ-দূর্গ। এভাবেই এগিয়ে যায় সাজিদ...।

বাংলা ইসলামী-সাহিত্যাঙ্গনে আরিফ আজাদ এখন নিত্য-আলোচিত, বহুলপ্রশংসিত ও পরিচিত মুখ। *প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ* লিখে চমক সৃষ্টি করেছেন বইমেলা-২০১৭-তে। এরপর রচনা করেছেন পাঠকনন্দিত বই *আরজ আলী সমীপে*। সম্পাদনা করেছেন *প্রত্যাবর্তন, তিনিই আমার রব* এবং *মা, মা, মা এবং বাবা*'র মতো সাড়া জাগানো বইয়েরও। তার অনবদ্য রচনা সাজিদ সিরিজের দ্বিতীয় বই-ই হলো *প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২*।

সাবলীল, প্রাঞ্জল ও যৌক্তিক লেখার মাধ্যমে বিশ্বাসী মানুষের মনে শক্ত-জায়গা করে নেওয়া লেখক আরিফ আজাদের জন্য সমকালীন পরিবারের পক্ষ থেকে শুভকামনা। সাজিদ সিরিজের দ্বিতীয় বই প্রকাশ করতে পেরে সমকালীন পরিবার গর্বিত এবং আনন্দিত। আমরা লেখকের দীর্ঘায়ু কামনা করছি। উম্মাহর জন্য আরও বিপুল পরিমাণে কাজ করার সুযোগ যেন মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের এই ভাইকে দান করেন। আমীন।

প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২ বইতে যদি কোনোরকম অসঙ্গতি বা ভুল চোখে পড়ে, তা সহৃদয় পাঠককে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল। আমরা অবশ্যই সেটা শুধরে নেব, ইন শা আল্লাহ।

সত্যবিশ্বাসের সাথে সকলের পথচলা সুন্দর হোক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সিরাতুল মুসতাকীমের পথে অটল ও অবিচল রাখুন। আমীন।

প্রকাশক
সমকালীন প্রকাশন

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার, যিনি আমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। দরূদ ও সালাম প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যাকে বিশ্বজাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। শান্তি বর্ষিত হোক তার পরিবার-পরিজন এবং তার সাহাবীদের ওপর যারা ইসলামের জন্য ত্যাগ করেছেন নিজেদের সর্বস্ব। রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

এখন চলছে এক উত্তাল সময়। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে মানুষের চিন্তা, চেতনা আর আদর্শ পৌঁছে যাচ্ছে সর্বত্র। একজন যা ভাবছে তা মুহূর্তেই জেনে যাচ্ছে অন্যরা। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের অবাধ সুযোগ এবং ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা যেন ব্যাপারটিকে আরও মোহনিয়া করে তুলেছে।

প্রযুক্তির এই ধারা-ই কাজে লাগিয়েছে ধর্মবিদ্বেষী একদল মানুষ। সোশ্যাল মিডিয়ার অবাধ ব্যবহারের এই সুযোগে ইসলাম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ইন্টারনেটে তারা এমন সব কথা ছড়াতে লাগল যা মুখ বুজে সহ্য করা যেকোনো ইমানদার ব্যক্তির জন্য ছিল অত্যন্ত কঠিন। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল অসচেতন মুসলিম তরুণ, যাদের ধর্ম নিয়ে খুব বেশি জানাশোনা ও পড়াশোনা নেই। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের এসকল তরুণদের টার্গেট করে তারা বিভিন্ন ব্লগে ও ফেইসবুকে ছড়াতে থাকে প্রোপাগান্ডা যার সবটাই-জুড়ে থাকে কেবল ইসলাম-বিদ্বেষ। ইসলামের নবী ও তার স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। যুবক-যুবতীদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি

করিয়ে তাদের ধর্ম থেকে বিমুখ এবং দূরে সরিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে তারা আপ্রাণ কাজ করে যাচ্ছে। দুঃখের সাথে বলতে হয়, তাদের এই প্রচেষ্টায় তারা অনেকটাই সফল হতে পেরেছে। তাদের ছড়ানো নীল-জগতের বিষে বিষাক্ত হতে থাকে বেশকিছু বিশ্বাসী তরুণের অন্তর। ধর্ম নিয়ে তাদের মনে ঢুকে পড়ে সীমাহীন সন্দেহ আর অবিশ্বাস। স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতাসহ নানান ব্যাপারে তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে।

চারদিকের এরকম অন্ধকার, অস্থিরতা আর অবিশ্বাসের বিষবাষ্প দেখতে দেখতে বিষিয়ে উঠছিল মন। চোখের সামনে পাল্টে যেতে থাকা মানুষগুলো দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। কেমন যেন অদ্ভুত এক অন্ধকার এসে গ্রাস করে নিচ্ছিল সুন্দর এই উপত্যকা।

এরকম অস্থির সময়ে একদিন ঠিক করেই ফেললাম, কলমের জবাব কলমেই হোক। লেখার বদলে লেখা আসুক। যুক্তির বিপরীতে যুক্তি। যে-কলম দিয়ে তারা বিশ্বাসী হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে চলছে, সেই কলমের প্রতিবাদে প্রয়োজন আরও শক্তিশালী কলম। যে-কলম বিশ্বাসের কথা বলবে। যে-কলম রচনা করবে বিশ্বাসী প্রাণের সুর।

আমার মনে আছে, এরকম দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, জোসনা প্লাবিত এক রাতে লিখে ফেলেছিলাম সাজিদ সিরিজের একদম প্রথম গল্পটা। ওই গল্পে একটি নতুন ধারার সূচনা করেছিলাম আমি। তখনো জানতাম না যে, এই ধারা একদিন বিপ্লব হয়ে উঠবে। আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলাম-বিদ্বেষীদের প্রশ্নগুলোকে একত্র করে, তাদের যুক্তিগুলোকে একাধারে সাজিয়ে নিয়ে আমি চেষ্টা করেছি তার বিপরীতে আমাদের যুক্তিগুলোকে উপস্থাপন করতে। এই কাজটা করতে গিয়ে আমি গৎবাঁধা কোনো প্রবন্ধ রচনা করিনি। আমি সবসময় চাইতাম যে, আমি যা-ই লিখব, তা যেন সকল শ্রেণির মানুষের কাছে বোধগম্য হয়। তারা যেন পড়ামাত্রই আমার কথা বুঝে নিতে পারে। আমি আমার লেখাতে, আমার যুক্তি, উপমা কিংবা উদাহরণে কোনোরকম দুর্বোধ্যতা রাখতে চাইনি। আমি তাদের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছি ধর্ম নিয়ে যাদের খুব বেশি জানাশোনা নেই; কিন্তু ধর্মবিদ্বেষীদের ছড়ানো প্রোপাগান্ডায় নিজের বিশ্বাস নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। আমি তাদের সহজ এবং সরল ভাষায় বোঝাতে চেয়েছি যে, ধর্মের বিপরীতে ধেয়ে আসা যুক্তিগুলো কতোটা ভঙ্গুর। প্রশ্নগুলো কতটা অবান্তর। আমি

তাদের কাছে ইসলামের মাহাত্ম্য তুলে ধরতে চেয়েছি। কুরআনের অনন্যতা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের সত্যতার ব্যাপারে অখণ্ডনীয় যে-সব প্রমাণ রয়েছে, সেগুলোকে এক জায়গায় করে ধীরে ধীরে তাদের অন্তরে প্রবাহিত করে দিতে চেয়েছি বিশ্বাসের ফল্গুধারা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ্।

জোসনা প্লাবিত রাতের সেই একটি গল্প থেকে ধীরে ধীরে সাজিদ সিরিজ মলাটবন্ধ হয়ে যায়। চারদিক থেকে প্রচুর মানুষের ভালোবাসা, সহযোগিতা এবং পরামর্শে ২০১৭ সালের একুশে বইমেলায় সাজিদ সিরিজের প্রথম বই প্রকাশিত হয় *প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ* নামে। সেই যে শুরু, সেই ধারা এখনো চলছে, আলহামদু লিল্লাহ্।

'সাজিদ' চরিত্রটাকে নিয়ে পাঠকদের মনে ভালোবাসার কমতি নেই, আলহামদুলিল্লাহ্। আমি এমন এমন রিভিউ-ও পেয়েছি এই বইয়ের, যেগুলো আমাকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে। একজন যুবক যখন 'আমি সাজিদ হতে চাই' বলে তার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, আমার চোখ দুটো তখন অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। যখন আমাকে এসে বলা হয় যে, তার জীবনের পরিবর্তনে, দ্বীনে ফিরে আসার পেছনে এই বইটি নিয়ামক হিশেবে কাজ করেছে; তখন আমার হৃদয়-মন অস্ফুটে 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলে ওঠে। আমি শুকরিয়া জানাই সেই মহান অধিপতির, যিনি এই কাজ সহজ করে দিয়েছেন আমার জন্যে। আলহামদু লিল্লাহ্।

'*প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ*'-প্রকাশ হওয়ার পরে সবার একটাই প্রশ্ন ছিলো আমার কাছে, 'সাজিদ-০২' কবে আসবে?'

যখন আমি এই সিরিজ লিখছিলাম, তখন ভাবতেও পারিনি যে এই লেখাগুলো কখনো মলাটবন্ধ হতে পারে। আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কাজটির জন্য আমাকে এতো সম্মানিত করবেন। আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল। সাজিদ সিরিজের পরবর্তী বইয়ের জন্য এত এত পাঠকদের অনুরোধ দেখে আমি সত্যিই বিস্মিত এবং আপ্লুত হয়েছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাহায্য আর ভালোবাসা যে কীরকম হতে পারে, তা আমি খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আলহামদু লিল্লাহ্।

সাজিদ এক মলাটেই শেষ হয়ে যাক, সেটা আমি নিজেও কখনো চাইনি। কারণ, প্রতিপক্ষের যে পরিমাণ বিদ্বেষ, মিথ্যাচার আর প্রোপাগান্ডা, তা কখনোই এক মলাটে

নিয়ে এসে শেষ করে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই সাজিদ সিরিজ এগিয়ে নিতে আমার ভেতরেও সবসময় একটি প্রণোদনা কাজ করত। এরই ধারাবাহিকতায় সাজিদ সিরিজের দ্বিতীয় বই *প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২* নামে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত। আলহামদু লিল্লাহ। অসংখ্য শুকরিয়া মহান রবের দরবারে।

সাজিদ সিরিজের প্রথম খন্ডের ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে দ্বিতীয় খণ্ড রচনার কাজটা ছিল খুবই চ্যালেঞ্জের। দ্বিতীয় মলাটে সাজিদকে কীভাবে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি সেটা ছিল আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। প্রথমত একটি চ্যালেঞ্জ, দ্বিতীয়ত আগের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে সাজিদকে নতুনভাবে প্রকাশ করতে বেশ দীর্ঘ একটা সময় নিয়েছি। তাই, মাঝখানের সময়টাতে সাজিদ আসেনি দেখে যারা আমার ওপরে অভিমান করে আছেন, তাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনাদের এই অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্যে হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা।

প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২ নিয়ে কিছু বলতে চাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অশেষ রহমতে এই খণ্ডে আমি এমনকিছু টপিক নিয়ে কাজ করতে পেরেছি যেগুলো নিয়ে কাজ করার স্বপ্ন ছিল দীর্ঘদিনের। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার অধম বান্দার জন্য সেই কাজটাকে সহজ করে দিয়েছেন আলহামদু লিল্লাহ্।

এবারের বইটিকে 'নাস্তিকতা বিরোধী' বললে মোটাদাগে ভুল করা হবে। কারণ, এবারের বইতে আমি যেমন নাস্তিকদের প্রশ্নের জবাব রেখেছি, রেখেছি খ্রিষ্টান মিশনারিদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবও। এর পাশাপাশি কুরআনের অলৌকিক কিছু ব্যাপার, ভাষাতাত্ত্বিক কিছু মিরাকল নিয়ে আলোচনাও স্থান পেয়েছে এবারের বইতে। আমার মনে হয়েছে, গৎবাঁধাভাবে নাস্তিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকলে পাঠকদের মনে এক ধরনের একঘেয়েমি সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য আনতেই আমি বইটি এভাবে সাজিয়েছি। তাছাড়া, আমি বিশ্বাস করি কুরআনের এ সব বিষয়াদি মানুষের জানা উচিত। তবেই মানুষের মধ্যে কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা জন্মাবে। তারা কেবল পড়ার জন্যে নয়, জানা এবং বোঝার জন্যে তখন কুরআন পড়বে, ইন শা আল্লাহ।

আগের মতোই এবারের বইটি লিখতে গিয়েও অনেক ভাইয়েরা আমাকে সহায়তা করেছেন বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত আর পরামর্শ দিয়ে। তাদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ। বইটি লিখতে গিয়ে আমি শরণাপন্ন হয়েছি বিভিন্ন স্কলার,

শাইখ এবং দাঈ ইলাল্লাহ ভাইদের ইংরেজিতে মজুদ থাকা রিসোর্সের। বিশেষ করে ভাই আবু জাকারিয়া, উস্তায হামযা জর্জিস এবং 'ইকরা' টিমের। মুশফিকুর রহমান মিনার ভাই এবং জোবায়ের আল মাহমুদ ভাইয়ের কাছেও কৃতজ্ঞতা তাদের সার্বক্ষণিক সাহায্য এবং পরামর্শের জন্য। আল্লাহ যেন তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

সবশেষে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে আমি আবারও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সাজিদ সিরিজের দ্বিতীয় বই *প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২* তিনি যেন কবুল করে নেন। এই বইতে যা কিছু ভালো আর কল্যাণের, তার সবটুকু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে। আর, এই বইতে যা কিছু ভুল ও অকল্যাণকর, তার সব-ই আমার পক্ষ থেকে।

পাঠকের কাছে সবিনয় অনুরোধ, বইটি নিয়ে যদি আপনার কোনো অভিযোগ বা অনুযোগ থাকে, তা আমার বরাবর কিংবা প্রকাশনী বরাবর জানাবেন। কল্যাণের উদ্দেশ্যে দেওয়া আপনাদের সবরকম পরামর্শকে সাদরে গ্রহণ করা হবে, ইন শা আল্লাহ। বইটি যদি আপনি কল্যাণকর মনে করে থাকেন, তাহলে দয়া করে আপনার কাছে রেখে দেবেন না; আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার কোনো এক শুষ্ক হৃদয়ের বান্দার কাছে হস্তান্তর করে দেবেন। যদি এই বই তার শুকিয়ে যাওয়া হৃদয়ে কল্যাণের বারিধারা ফেরাতে পারে, অন্তরের অনুর্বর মাটিতে এই বই যদি এক পশলা বৃষ্টির কারণ হতে পারে, তাহলে সেই কাজের নেকি সমানভাবে আপনি এবং আমিও পেয়ে যাব, ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কাজগুলো কবুল করুন। আ-মী-ন।

আরিফ আজাদ
arifazad.bd@outlook.com

কুরআন কি নারীদের শস্যক্ষেত্র বলেছে?

অনেকদিন পর শাহবাগে হঠাৎ নীলু দা'র সাথে দেখা। প্রথমে খেয়াল করিনি। পেছন থেকে এসে আমার মাথায় টোকা দিয়ে বললেন, 'কী খবর কবি সাহেব?'

পেছন ফিরতেই দেখি হাতে একগাদা বই নিয়ে নীলু দা দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে মোটা ফ্রেমের কালো চশমা লাগিয়েছেন বলে দেখতে একদম স্কুল মাস্টারের মতো লাগছে। খয়েরি রঙের টি-শার্ট গায়ে। আমি খুবই অপ্রস্তুত ছিলাম। বললাম, 'আরে দাদাভাই যে! কেমন আছ?'

'ভালো। তুই কেমন?'

'ভালো।'

কুশলাদি বিনিময় করতে করতে আমরা একটি ফাঁকা স্থানে এসে দাঁড়ালাম। নীলু দা জিজ্ঞেস করল, 'সাজিদ কোথায়?'

এই মুহূর্তে সাজিদ কোথায় তা আমিও জানি না। একটু আগেও সে আমার সাথে ছিল। আমি মোবাইলে টাকা রিচার্জ করে এসে দেখি সে উধাও। কখন থেকে ফোন করেই যাচ্ছি! যদিও জানি, সে আমার ফোন ওঠাবে না, তবুও ব্যর্থ চেষ্টা করে যাওয়া আরকি! কতক্ষণই বা এরকম কাঠফাটা রোদে দাঁড়িয়ে থাকা যায়?

নীলু দা'র প্রশ্নের জবাবে বললাম, 'আছে হয়তো এদিকে কোথাও।'

বলতে-না-বলতেই সাজিদ আমাদের সামনে এসে উপস্থিত। যেরকম বাতাসের মতোই উবে গিয়েছিল, সেরকম বাতাসের মতোই এসে হাজির হয়েছে। মাঝে মাঝে তাকে আমার ভারি অদ্ভুত লাগে। এই মুহূর্তে মন চাচ্ছে তাকে কানের নিচে দুচারটা দিয়ে জিজ্ঞেস করি—ফোনটা ওঠালে কী অপরাধ হতো?

কোনোরকমে রাগ সংবরণ করে বললাম, 'ফোন উঠাসনি কেন?'

সে আমার কথা গ্রাহ্য করেছে বলে মনে হলো না। হাত বাড়িয়ে নীলু দার সাথে হ্যান্ডশেক-পর্ব সেরে নিল। আমার রাগ আরও বেড়ে গেল। পৃথিবীতে আমি সবকিছু সহ্য করতে পারি; কিন্তু কেউ আমাকে পাত্তা না দিলে, সামনাসামনি আমাকে ইগনোর করলে আমি সেটি একদমই মেনে নিতে পারি না। নীলু দা না-থাকলে হয়তো এই মুহূর্তে তার গায়ে এক ঘুসি লাগিয়ে দিতাম; কিন্তু সিনিয়র একজন সামনে আছেন বলে ধৈর্যের সর্বোচ্চ পরীক্ষা দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'এতক্ষণ তুই ফোন উঠাসনি কেন?'

পাশ দিয়ে একজন চা-বিক্রেতা যাচ্ছিল। সাজিদ তাকে থামিয়ে নীলু দার দিকে ফিরে বলল, 'চা খাবে নীলু দা?'

'খাওয়া যায়' নীলু দার সম্মতি।

এরপর সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই খাবি?'

রাগে আমার গা ঘিনঘিন করছিল তখন। ব্যাটা! নীলু দার মতো লোকের সামনে অপমান করার পরেও জিজ্ঞেস করছে চা গিলব কিনা! আহাম্মক কোথাকার!

রাগ চেপে বললাম, 'না, খাব না।'

আমার ব্যাপারে আর বেশি আগ্রহ না দেখিয়ে সাজিদ আর নীলু দা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে একটি বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। তাদের পেছন পেছন আমিও গেলাম।

'কোথায় ছিলে এতদিন?' সাজিদ নীলু দার কাছে জানতে চাইল।

'ছিলাম শহরেই।'

'আত্মগোপনে?'

নীলু দা এমনিতেই সদাহাস্য মানুষ। যেকোনো কিছুতে হো হো করে হাসতে পারে। সাজিদের কথা শুনে হাসতে হাসতেই বলল, 'তুই কি আমাকে চোর-ডাকাত টাইপ কিছু ভাবিস নাকি রে?'

'না। তবে যেভাবে তুমি একেবারে সবকিছু থেকে ইস্তফা দিয়ে বেখবরে চলে গেলে, তাই ভাবলাম আত্মগোপনে আছ কি না।'

দুজনের মধ্যে কথোপকথন চলছিল। মুখ গোমড়া করে আমি নীলু দার পাশে বসে আছি। একপর্যায়ে নীলু দা বলল, 'তবে ভালোই হয়েছে তোর সাথে দেখা হয়ে। কিছুদিন ধরে মনে মনে আমি তোকেই খুঁজছিলাম।'

সাজিদ বলল, 'তুমি খুঁজছিলে আমাকে! অবাক করা ব্যাপার!'

'বিস্মিত হলি বলে মনে হলো' বলল নীলু দা।

'বিস্মিত হবারই তো কথা। তোমার মতো লিজেন্ডারি পারসন আমার খোঁজ করছে, এই খুশিতে তো আমার বাকবাকুম বাকবাকুম করতে মন চাইছে।'

নীলু দা চোখ রাঙিয়ে বলল, 'মজা করবি না একদম। আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলেছি। তোর কাছে একটি ব্যাপার জানার ছিল আমার।'

এবার সাজিদ বেশ আগ্রহ দেখিয়ে জানতে চাইল, 'ব্যাপার কী?'

নীলু দা গা ঝেড়ে উঠে বলল, 'তুই তো জানিস, আমি উইমেন রাইটস নিয়ে কাজ করি। নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, নিরাপত্তা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করাই আমার প্যাশন বলতে পারিস।'

সাজিদ বলল, 'তা তো আমি জানিই। নতুন করে বলার কী দরকার?'

'দরকার আছে। যেখানেই আমরা নারীর অমর্যাদা আর অসম্মান দেখব, আমাদের উচিত সেখানেই প্রতিবাদ করা, রাইট?'

'হুম।'

'সেই অসম্মানটা ধর্মের নামে হোক বা অধর্মের নামে, আমাদের প্রতিবাদ সব জায়গাতেই জারি থাকা উচিত। তাই নয় কি?'

সাজিদ 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়ল।

'তাহলে বল, একটি ধর্মগ্রন্থ যদি নারীদের শস্যক্ষেতের সাথে তুলনা করে এবং যদি বলে যে তাদের যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করতে, তখন ব্যাপারটি কেমন দেখায়?'

সাজিদ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। বুঝতে পেরেছি লম্বা একটি লেকচার ঝাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। তবে এই মুহূর্তে তার লেকচার শোনার কোনোরকম ইচ্ছে আমার নেই। উঠে হাঁটতে পারলেই বাঁচি; কিন্তু সম্মানিত এক সিনিয়র বড় ভাই সাথে আছেন বলে এভাবে ওঠা-ও সম্ভব না। তাই ইচ্ছে না থাকলেও সাজিদের লেকচার গলাধঃকরণ ছাড়া এই মুহূর্তে আর কোনো উপায় নেই।

এবার সাজিদ বলতে শুরু করল, 'বুঝতে পেরেছি। তুমি নিশ্চয়ই সূরা বাকারার ২২৩ নাম্বার আয়াতের কথা বলছ, তাই না?'

নীলু দা না জানার ভান করে বলল, 'আমি আসলে জানি না কুরআনের কোথায় এটা বলা আছে। তবে আমি নিশ্চিত হয়েছি এরকম কিছু ব্যাপারে। এরকম কিছু যদি থেকে থাকে, তাহলে এই বক্তব্যের সাথে কি তুই একাত্মতা পোষণ করিস, সাজিদ?'

সাজিদ আবারও কয়েক মুহূর্ত ভাবল। এরপর বলল, 'আমি একাত্মতা পোষণ করি কি না, সেটি জরুরি নয়। জরুরি হচ্ছে কুরআনের এই আয়াত থেকে তুমি কী বুঝেছ সেটি।'

নীলু দা বলল, 'নতুন করে আর কী বুঝব? ওখানে তো খুব স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে নারীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা তাদের যেভাবে মন চায় ব্যবহার করো। নারীর জন্য এর চেয়ে অপমানজনক কথা আর কিছু কি থাকতে পারে, বল?'

সাজিদ নীলু দার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'এভাবে উত্তেজিত হচ্ছ কেন দাদা ভাই? কুল! আমি তো তোমাকে ঠান্ডা মাথার লোক হিশেবেই জানি। তোমার কাছ থেকে এরকম তাড়াহুড়ো কিন্তু একদম আশা করি না।'

সাজিদের কথা শুনে নীলু দা একটু নরম হলো বলে মনে হচ্ছে। নীলু দা বলল, 'কিন্তু সাজিদ, ব্যাপারটা খুবই সাংঘাতিক নয় কি? একটি ধর্মগ্রন্থে কীভাবে এরকম

কথা লেখা থাকতে পারে বল? আবার এই কথা কোটি কোটি মানুষ পড়ে এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করে। কী অদ্ভুত!'

'তুমি যেভাবে ভাবছ ব্যাপারটি আসলে সেরকম নয়।'

সাজিদের কথা শুনে বেশ অবাক হলো নীলু দা। বলল, 'মানে কী? তুই বলতে চাইছিস কুরআনে এমন কোনো কথা নেই?'

'থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে।'

'তাহলে?'

'কুরআনের ওই কথাগুলোকে তোমরা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে থাক।'

বিতর্ক জমে উঠছে। সাজিদের সাথে রাগ করে উঠে না গিয়ে ভালোই করেছি। আমার সাবেক তার্কিক বড় ভাইয়ের সাথে বর্তমান বন্ধুর তর্কটা উপভোগ্য হবে বলেই মনে হচ্ছে। এই মুহূর্তে নীলু দার জায়গায় মফিজুর রহমান স্যার হলে নিশ্চিত সাজিদকে 'মহামতি আইনস্টাইন' বলে ঠাট্টা করত; কিন্তু নীলু দা সেরকম নয়। খুবই ঠান্ডা মেজাজের লোক। বলল, 'তুই বলতে চাচ্ছিস যে, কুরআনের এই কথার অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী সেটি?' জানতে চাইল নীলু দা।

সাজিদ দীর্ঘ বক্তব্য শুরুর আগে যা করে এবারও তাই করল। প্রথমে ঝেড়ে কেশে নিল। এরপর বলতে শুরু করল, 'সবার আগে আমরা কুরআন থেকে ওই অংশটুকু দেখে নিই যা নিয়ে তুমি কথা উঠিয়েছ। এটি আছে সূরা বাকারার ২২৩ নাম্বার আয়াতে। কুরআনে বলা হয়েছে, 'Your wives are a tilth for you, so go to your tilth when or how you will.' অর্থাৎ 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। সুতরাং, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো।'

আয়াতটির অর্থ বলা শেষ হলে সাজিদ আবার বলতে লাগল, 'আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এই আয়াতটি দ্বারা কুরআন নারীদের অতি তুচ্ছ শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা তো করেছে, সাথে তাকে পুরুষের যৌন-চাহিদা মেটানোর জন্য নারীদের যেভাবে ইচ্ছা

ব্যবহার করার অনুমতিও দিচ্ছে, তাই না?'

নীলু দা বলল, 'তা নয়তো কী?'

হাসল সাজিদ। হেসে বলল, 'দেখা যাক কুরআন আসলে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছে। আচ্ছা নীলু দা, তোমাকে একটি প্রশ্ন করি। তুমি কি জানো, কুরআন কার ওপর নাযিল হয়েছিল?'

নীলু দা বলল, 'নবী মুহাম্মদের ওপর।'

'এক্সাক্টলি। তাহলে কুরআনকে আমাদের ঠিক সেভাবেই বুঝতে হবে, যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝেছেন এবং বুঝিয়েছেন, তাই না?'

মাথা নাড়ল নীলু দা। সাজিদ তার বক্তব্য চালিয়ে গেল, 'কুরআনের আয়াতগুলো বুঝতে হলে সবার আগে সেগুলো নাযিলের প্রেক্ষাপট, অবস্থা এবং ঘটনার পরম্পরা বুঝতে হবে। 'সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো' এই অংশ দিয়ে কি সত্যিই নারীদের ওপর পুরুষের যেমন ইচ্ছা যৌন-ক্ষুধা নিবারণের নির্দেশ কুরআন দেয় কি না এটা জানার আগে তোমাকে তৎকালীন আরবে ইহুদীদের একটি কুসংস্কার সম্পর্কে জানাই। সেটি হচ্ছে, তৎকালীন আরবের ইহুদীরা বিশ্বাস করত যে, যদি স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের সাথে পেছনের দিক হতে সহবাস করে তাহলে উক্ত মিলনের ফলে তাদের গর্ভে ট্যারা সন্তানের জন্ম হবে। অর্থাৎ পেছনের দিক হতে সহবাস করাটা তৎকালীন ইহুদীরা নাজায়েয মনে করত। তারা ভাবত এতে করে নাকি ট্যারা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইমাম ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত তাফসীর *তাফসীরে ইবনে কাসীর*-এ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এসম্পর্কিত বেশকিছু বিশুদ্ধ হাদীসের রেফারেন্স টেনেছেন। সেখানে একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, একবার ইবনু উমার কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে তিনি যখন এই আয়াতে, অর্থাৎ 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। সুতরাং, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো'-তে এলেন, তখন পাশের একজন সাহাবীকে ডেকে বললেন, 'নাফী! এইমাত্র আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করলাম সেটি নাযিলের প্রেক্ষাপট কি তুমি জানো?'

ইবনু উমারের প্রশ্নের জবাবে ওই সাহাবী বললেন, 'না। আমি জানি না।' তখন ইবনু উমার বললেন, 'আমরা স্ত্রীদের সাথে পেছনের দিক হতে সহবাস করতাম;

কিন্তু যখন আমরা মদীনায় হিজরত করলাম এবং সেখানে যখন আমরা আনসারী নারীদের বিয়ে করলাম, আমরা তাদের সাথেও একইভাবে মিলিত হতে চাইতাম; কিন্তু আনসারী নারীরা, যারা একসময় ইহুদী ছিল, তারা এটা পছন্দ করত না। তারা এতকাল মেনে আসা ইহুদী রীতিই মেনে চলতে চাইল। তখনই আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন, 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো।'

এতটুকু বলা শেষ করে সাজিদ আবার বলতে শুরু করল, 'এই ঘটনা থেকে কী বোঝা গেল? বোঝা গেল যে, এই আয়াত নারীদের ওপর পুরুষের অবাধ যৌন-কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি নয়; বরং ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত একটি কুসংস্কার উঠিয়ে দিতেই নাযিল হয়েছে। ইহুদীরা বিশ্বাস করত, স্ত্রীদের সাথে পেছন দিক থেকে সহবাস করলে ট্যারা সন্তান হয়। এই কুসংস্কার দূরীকরণার্থেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—'তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো।' অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যেভাবে ইচ্ছা সহবাস করো।' একটি কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করতেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে। এখানে নারীদের সাথে যখন যেভাবে ইচ্ছা মিলিত হওয়াটা গৌণ, মূলত কুসংস্কারের পতন ঘটানোই ছিল মুখ্য।'

নীলু দা তার কপালে বিরক্তির ভাঁজ টেনে বলল, 'আরও সহজ করে বলত ভাই। আমি এত প্যাঁচগোছ বুঝি না।'

নীলু দার কথা শুনে সাজিদ আবারও হাসল। বলল, 'ঠিক আছে, আমি সহজ করেই বলছি। আমাদের গ্রামাঞ্চলে একটি কুসংস্কার চালু আছে। সেটি হলো—যখন চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয়, তখন যদি কোনো গর্ভবতী নারী শরীর বাঁকা করে দাঁড়ায়, তাহলে নাকি পেটের সন্তান বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়। এখন এই কুসংস্কার দূর করতে কেউ যদি বলে, 'সূর্যগ্রহণের সময়ে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা দাঁড়িয়ে থাকো, তাহলে এই কথার দ্বারা কি এটাই বোঝানো হয় যে, নারীদের কেবল দাঁড়িয়েই থাকতে হবে? বসতে পারবে না? হাঁটতে পারবে না? আর এই দাঁড়িয়ে থাকতে বলায় কি নারীদের অপমান-অপদস্থ করা হয়? না। বরং এই কথার উদ্দেশ্য হলো—সূর্যগ্রহণের সময় বাঁকা হয়ে দাঁড়াও বা সোজা হয়ে, হাঁটো কিংবা বসো, যা-ই ইচ্ছা করো—কোনো সমস্যা নেই। এতে গর্ভের সন্তান বিকলাঙ্গ হবে না। এই কথার মূল উদ্দেশ্য হলো একটি কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করা। আর কিছু নয়।'

নীলু দা কিছু না বলে চুপ করে আছে।

সাজিদ আবার বলতে লাগল, ‘ঠিক সেরকম, কুরআনের ওই আয়াতের উদ্দেশ্য কিন্তু পুরুষদের অযাচিতভাবে নারীদের ওপর যৌন-ক্ষুধা মেটানোর নির্দেশনা নয়; বরং একটি কুসংস্কারের মূলোৎপাটন।’

বিকেলের সূর্যটা আরও কিছুটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে। রোদের তীব্রতাও কমে এসেছে অনেকটা। এরকম পড়ন্ত বিকেলে ধোঁয়া-ওড়া চায়ের কাপ হাতে যদি শরতের বইতে মগ্ন হওয়া যেত তাহলে বেশ হতো; কিন্তু দুই বন্ধুর এই জ্ঞানমূলক তর্ক-বিতর্ক ছেড়েও উঠে যাওয়া যাবে না।

নীলু দা বলল, ‘তা না-হয় বুঝলাম; কিন্তু নারীদের যে শস্যক্ষেতের সাথে তুলনা করল, সেটির ব্যাপারে কী বলবি?’

সাজিদ আবার বলতে শুরু করল, ‘কুরআনের অনন্যতার একটি বড় দিক হচ্ছে—চমৎকার ভাষাশৈলী। কিছু কিছু ব্যাপার সহজে বোঝানোর জন্য কুরআনে মাঝে মাঝে উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে ব্যবহৃত উপমাগুলো এতই সুন্দর, প্রাসঙ্গিক আর চমৎকার যে, সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে তুমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে।’

নীলু দা গাল বাঁকা করে বলল, ‘তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস যে নারীদের শস্যক্ষেত্র বলাটা একটি উপমা? নারীদের শস্যক্ষেত্র বলে কুরআন মূলত উপমা দিয়েছে?’

সাজিদ বলল, ‘হ্যাঁ।’

হাসল নীলু দা। বলল, ‘মাই গুডনেস! এই ‘শস্যক্ষেত্র’ শব্দটির মধ্যে তুই উপমা খুঁজে পাচ্ছিস সাজিদ! তুই এতটা অন্ধবিশ্বাসী হয়ে বসলি কবে থেকে?’

মুচকি হেসে সাজিদ বলল, ‘শস্যক্ষেত্র শব্দটি কি ‘ঝলসানো রুটি’ শব্দের চেয়ে খারাপ?’

নীলু দা চোখ কপালে তুলে বলল, ‘মানে কী?’

‘মানে হলো, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য যখন পূর্ণিমার চাঁদকে ‘ঝলসানো রুটি’র সাথে তুলনা করে উপমা দেয়, তখন কিন্তু তোমাদের কাছে বেখাপ্পা লাগে না; কিন্তু কুরআন কেন নারীদের শস্যক্ষেত্র বলেছে সেটি নিয়ে তোমাদের ঢের আপত্তি। জাত গেল-জাত গেল অবস্থা!’

চুপ মেরে গেল নীলু দা। সম্ভবত সাজিদের যুক্তির কাছে কুপোকাত হয়ে গেছে মনে মনে। নীলু দা মুখ খুলে কিছু বলার আগেই সাজিদ আবার বলতে লাগল, 'শস্যক্ষেতের উপমা দিয়ে কুরআন তো নারীদের অপমান করে-ই-নি, বরঞ্চ, প্রকৃতিগতভাবে নারীর যে অবস্থান আর সম্মান, কুরআন তাকে ঠিক সেভাবেই তুলনা করেছে।'

'এই উপমার মধ্যে তুই নারীর জন্য সম্মান খুঁজে পাচ্ছিস? বাহ! তোর যুক্তির তো তারিফ করা লাগে, সাজিদ।' উপহাসের সুরে বলল নীলু দা।

সাজিদ বলল, 'দেখো নীলু দা, নারী হচ্ছে এমন—যে সন্তান জন্ম দেয় এবং তাদের বুকে আগলে রাখে এবং যার বুকের দুধ পান করে সন্তান বেড়ে ওঠে। একজন নারী তার সবটুকু দিয়ে নিজের সন্তানের জন্য লড়ে যায়। তাহলে চিন্তা করো তো, আমরা যদি সন্তানদের শস্য তথা ফসলের সাথে মিলিয়ে দেখি, একজন নারী কি তখন শস্যক্ষেতের ভূমিকায় থাকে না? শস্যক্ষেতের বুক থেকে যেমন চারাগাছগুলো পানিসহ যাবতীয় উপাদান গ্রহণ করে বেঁচে থাকে, মায়ের বুকের দুধ পান করে একজন শিশুও কি ঠিক সেভাবে বেড়ে ওঠে না? তাহলে এই উপমাতে ভুল কী আছে বলো?'

নীলু দা বলল, 'যত যুক্তিই থাকুক না কেন, শস্যক্ষেত্র শব্দটি নারীর জন্য যথেষ্ট অপমানজনক এবং অসম্মানের বলে মনে করি।'

'একজন কৃষক এবং তার শস্যক্ষেত্র নিয়ে ভুল ধারণা থাকলেই কেবল এই উপমাটিকে অপমানজনক বলা যায়। একজন কৃষকের কাছে তার শস্যক্ষেত্রের চেয়ে বেশি আপন আর কী হতে পারে? একজন কৃষক কতটা যত্নের সাথে, পরিচর্যার সাথে তার শস্যক্ষেতের দেখভাল করে তুমি জানো? তাছাড়া, এখানে শস্যক্ষেত্রের উপমাটি এজন্যেই টানা হয়েছে; কারণ, একজন কৃষক তার শস্যক্ষেত্রকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চাষ করতে পারে। সে চাইলে লম্বালম্বি চাষ করতে পারে, অথবা আড়াআড়িভাবে চাষ করতে পারে। এতে কিন্তু ফসলের কোনোই ক্ষতি হয় না। কুরআনও ঠিক একই উপমা টেনে বলছে—'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যেভাবে ইচ্ছা সহবাস করো। সামনের দিক হতে অথবা পেছনের দিক হতে। এতে করে তোমাদের সন্তানেরা অবশ্যই ট্যারা হয়ে জন্মাবে না। এটা একটি কুসংস্কার। এই কুসংস্কার থেকে তোমরা বেরিয়ে আসো।' কুরআন পুরুষদের কৃষক বানিয়ে বলছে—'নারীরা হলো তোমাদের শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। তোমাদের শস্যক্ষেত্রের জন্য যেমন তোমরা উত্তম বীজ, উত্তম সার, উত্তম পরিচর্যার ব্যবস্থা করে থাকো, ঠিক

সেভাবেই তোমাদের স্ত্রীদের সাথেও তোমরা উত্তম ব্যবহার, উত্তম আচরণ, উত্তম কর্ম সম্পাদন করবে।'

সাজিদের কথা শুনে নীলু দা আবারও চুপ হয়ে গেল। সাজিদ বলতে লাগল, 'নারীদের 'শস্যক্ষেত্র' বলে কুরআন যদি তাদের অপমান করে থাকে, তাহলে একই সূরার ১৮৭ নাম্বার আয়াতে যে বলা আছে—'They (your wives) are clothing for you and you are clothing for them.' অর্থাৎ 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য বস্ত্রস্বরূপ, আর তোমরা তাদের জন্য বস্ত্রস্বরূপ।' এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পুরুষদের নারীর বস্ত্রের সাথে তুলনা করেছেন। বলো তো, কাপড়ের মতো খুবই তুচ্ছ জিনিসের সাথে তুলনা দিয়ে কুরআন কি তাহলে পুরুষদের অপমান করেছে? একদমই না। মূলত এই উপমা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বুঝিয়েছেন যে—'স্বামী আর স্ত্রী একে-অপরের খুবই কাছের। তারা এতই কাছের যেভাবে কাপড় শরীরের সাথে লেপ্টে থাকে।'

মাগরিবের আযান পড়তে শুরু করেছে। এতক্ষণ পরে নীলু দা আমার দিকে তাকাল। আমি তখনো মন খারাপ করে বসে আছি। নীলু দা আমার পিঠে হালকা চিমটি কেটে বলল, 'কবি ভাই, আপনার কবিতার জন্য কিন্তু আমি অপেক্ষা করে আছি এখনো।'

আমার মনে পড়ল নীলু দাকে কবিতার একটি পাণ্ডুলিপি দেবো বলেছিলাম। পরীক্ষার চাপে সে কথা বেমালুম ভুলে বসে আছি আমি। নীলু দার দিকে তাকিয়ে হালকা হাসার চেষ্টা করে বললাম, 'পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই।'

আমার কথায় মুচকি হাসল নীলু দা। বলল, 'দেখো ভাই, সুনীলের কবিতার মতো হয়ে যেয়ো না যেন!'

বললাম, 'সুনীলের কোন কবিতা?'

'ওই যে, 'কেউ কথা রাখেনি'...। হা-হা-হা।'

নীলু দার কথা শুনে আমরা তিনজনই হেসে উঠলাম। নীলু দাকে বিদায় জানিয়ে সালাত পড়ার জন্যে আমরা ছুটে এলাম সেন্ট্রাল মসজিদে। প্রথম রাকআতে ইমাম সাহেব তিলাওয়াত করছেন সূরা দোহা। সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াতে পুরো মসজিদ এক অপূর্ব সুরের মূর্ছনায় ছেঁয়ে গেছে।

A Reply to Christian Missionary

ভদ্রলোকের তারুণ্যদীপ্ত চেহারা। চুল আর দাড়িতে পাক ধরায় মনে হচ্ছে হঠাৎ করেই যেন বয়স বেড়ে গেছে; কিন্তু চেহারার মধ্যে তারুণ্যের ছাপ স্পষ্ট। এই মুহূর্তে তিনি খুব মন খারাপ করে আমার সামনে বসে আছেন। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের মুখ ভারী হলে আশপাশের পরিবেশ গুমোট আকার ধারণ করে। ভদ্রলোকও সেরকম একজন মানুষ। মনখারাপ অবস্থাটা ওনার সাথে একদমই যাচ্ছে না।

তার ফোন বেজে উঠল। কপাল কুঁচকে তিনি ফোনের দিকে তাকালেন। দেখে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে তিনি খুবই বিরক্তি বোধ করছেন। ফোনটি বাজতে বাজতেই বন্ধ হয়ে গেল। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন। তাকিয়ে হালকা হাসার চেষ্টা করলেন; কিন্তু কৃত্রিম হাসিতে তাকে একদম মানায়নি।

তাকে প্রশ্ন করলাম, 'তো, আপনি খ্রিষ্টান মিশনারিদের কোথায় পেলেন?'

প্রশ্ন শুনে তিনি কিছুটা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন। বোতল থেকে ঢকঢক করে পানি পান করলেন। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'আমার এক বৃটিশ বন্ধু লন্ডনে মিশনারিদের একটি দাওয়া-প্রোগ্রামে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল; সেখানেই।'

'আপনার বন্ধু কি মুসলিম?'

'না। খ্রিষ্টান।'

'ও আচ্ছা।'

ভদ্রলোকের সমস্যা সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া দরকার। তিনি সম্প্রতি খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছ থেকে একটি তথ্য পেয়েছেন। এই তথ্যটি এতটাই বিদঘুটে যে, এর সত্যাসত্য না জানা অবধি ভদ্রলোক কোনো শান্তি পাচ্ছেন না। তথ্যটি হলো—কুরআনে নির্দিষ্ট করে বলা নেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সেদিন ঠিক কাকে কুরবানী করার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে নাকি ইসহাক আলাইহিস সালামকে? হাদীসেও এটির তেমন কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না; কিন্তু মুসলিমরা নাকি অন্ধভাবেই বিশ্বাস করে যে—ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সেদিন ইসমাঈল আলাইহিস সালামকেই কুরবানী করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কুরআন এই ইস্যুতে কোনো নির্দিষ্ট নাম ব্যবহার না করলেও বাইবেলে উল্লেখ পাওয়া যায়, সেদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে নয়, ইসহাক আলাইহিস সালামকে কুরবানী করতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আমাদের আলাপ আরও কিছুদূর গড়াল। বললাম, 'তো, এখন আপনি কী বিশ্বাস করছেন?'

ভদ্রলোক আমার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। সম্ভবত তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। এরই মধ্যে আমাদের মাঝে সাজিদ এসে উপস্থিত। হাতে একগাদা বই। লাইব্রেরি থেকে ফিরেছে। এসেই সে আমার পাশে ধপাস করে বসল। কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। কাঁধ থেকে ব্যাগটি টেবিলে রাখতে রাখতে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল—'আচ্ছা, তোকে যদি বলি ক্লাসিক্যাল একটি সীরাতগ্রন্থের নাম বলতে, তুই কোন সীরাতটির কথা বলবি?'

তার চুল উসকোখুসকো। চশমার ফ্রেম ঠিক করতে করতে উত্তর পাবার আশায় সে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম—'ইবনু ইসহাক অথবা ইবনু হিশামের সীরাতগ্রন্থ। যদি আরও আপডেটেড সীরাতের কথা জানতে চাস তাহলে হাল আমলের *আর রাহীকুল মাখতূমের* কথা বলতে পারি।'

সাজিদ জোরে একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'হুম। আমি জানতাম তুই এই উত্তরটাই দিবি। ৯৫ ভাগ শিক্ষিত বাঙালী মুসলিম এই উত্তরই দেবে।'

'তুই কী বলতে চাচ্ছিস, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সে আবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সীরাতের নাম উঠলেই লাফ দিয়ে ইবনু ইসহাক অথবা ইবনু হিশামে চলে যাস; কিন্তু বাংলা ভাষায় যে অত্যন্ত ক্লাসিক্যাল সীরাত মজুদ আছে, সেটা কি জানিস?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবলাম। বাংলা ভাষায় সীরাত! তাও আবার ক্লাসিক্যাল পর্যায়ের! ঠিক মনে করতে পারছি না। হয়তো বা আমার জানা নেই। বললাম—'না তো। কোনটার কথা বলছিস?'

সাজিদ বলল, 'মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ এর *মোস্তফা চরিত*'।

'বইটির কথা আমি অনেক শুনেছি। কখনো পড়া হয়নি অবশ্য। এটি যে এত উঁচু এবং ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ের সীরাত সেটাই আমি জানতাম না। বললাম—বলিস কী? এত বিখ্যাত সীরাত অথচ আমিই জানি না? বাই দ্য ওয়ে, তুই কি পড়েছিস সেটি?'

সাজিদ কোনো উত্তর দেয়নি। আমি জানতাম সে উত্তর দেবে না। পড়েছে তো অবশ্যই, নয়তো এখানে এসে এটা নিয়ে লেকচার ঝারত না। পাশে বোমা ফাটলেও যার মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না, সে এসেই যখন এত্তবড় লেকচার দিয়ে দিল, তাহলে নিশ্চিত সামথিং ইজ দেয়ার।

আমাদের আলাপের মাঝখানে ভদ্রলোক কথা বলে উঠলেন। ও হ্যাঁ, ভদ্রলোকের নাম বলা হয়নি। তার নাম আহসান ইমতিয়াজ। আহসান সাহেব সাজিদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'তুমিই কি সাজিদ?'

সাজিদ তার দিকে তাকাল। সে মনে হয় এতক্ষণ খেয়াল করেনি। সালাম দিয়ে বলল, 'জি, আমিই সাজিদ'।

ভদ্রলোক 'ওয়া আলাইকুম আসসালাম' বলে সাজিদের দিকে হাত বাড়াল। আমি বললাম—'সাজিদ, আহসান আঙ্কেল সেই সকাল দশটা থেকে তোর জন্য অপেক্ষা করছেন।'

সাজিদের প্রশ্ন, 'তুই কি গতকাল তার কথাই বলছিলি?'

'হ্যাঁ।'

সাজিদ আহসান আঙ্কেলের দিকে তাকিয়ে বলল—'সরি আঙ্কেল! আসলে আজ আমার এক্সট্রা ক্লাস ছিল বলে লেইট হয়ে গেল।'

'না না! ইটস ওকে' আহসান আঙ্কেল বললেন। এরপর নানা রকম আলাপের মাধ্যমে আহসান আঙ্কেল তার মনের খচখচানির ব্যাপারটি সাজিদকে খুলে বলতে লাগলেন—'আসলে হয়েছে কি জানো, খ্রিষ্টান মিশনারিদের পাল্লায় পড়ে খুব শঙ্কার মধ্যে আছি। তারা বলতে চায় যে—ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে নয়, ইসহাক আলাইহিস সালামকেই সেদিন কুরবানী দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাইবেলে নাকি এমনটাই বলা আছে।'

সাজিদ চুপচাপ, ঠান্ডা মাথায় সবকিছু শুনে বলল—'বাইবেলের যে জায়গায় ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বদলে ইসহাক আলাইহিস সালামের কথা আছে তা কি আপনি পড়েছেন?'

'হ্যাঁ' বললেন আহসান আঙ্কেল।

'মনে আছে সেই অংশটুকু?'

'হ্যাঁ'

'বলুন তো।'

আহসান আঙ্কেল এবার বাইবেলের সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করে বললেন—'বাইবেলের *ওল্ড টেস্টামেন্টের* জেনেসিস অধ্যায়ে বলা আছে—'And He (God) said, 'Take now thy son, thine only (son) whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of.'[১]

এই রেফারেন্স টেনে মিশনারিরা প্রমাণ করতে চায় যে সেদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাইলকে নয়; বরং ইসহাককে কুরবানী দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন'।

সাজিদ বলল, 'আঙ্কেল, আপনি এইমাত্র বাইবেলের যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা আছে—'ঈশ্বর ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তার একমাত্র সন্তান, যাকে তিনি নিজপ্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, তাকে নিয়ে ঈশ্বরের দেখানো পর্বতে গিয়ে কুরবানী দিতে।'

---

১ *জেনেসিস*, ২২: ২

আহসান আঙ্কেল বললেন, 'হ্যাঁ; কিন্তু বাইবেল এও বলছে যে সেই পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম নয়, ইসহাক আলাইহিস সালাম।'

সাজিদ বলল 'সেই আলোচনায় আমরা একটু পরে আসছি। আগে আপনি এই অংশটুকু খেয়াল করুন। এখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আদেশ করে বলা হচ্ছে—Take your only son. বিষয়টি গভীরভাবে বোঝার জন্য বাইবেলের এই শব্দচয়ন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। মূল হিব্রু ভাষায় Only শব্দের জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো—Yachiyd. হিব্রুতে Yachiyd শব্দ দিয়ে 'এবসলিউট সিঙ্গুলারিটি' বোঝায়। মানে—কেবল একজনই—Just One.

আমি আর আহসান আঙ্কেল মনোযোগ দিয়ে সাজিদের কথা শুনছি—'তাহলে, ঈশ্বর যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে 'তোমার একমাত্র পুত্রকে নিয়ে যাও' বলে আদেশ দিচ্ছেন, তখন সেই আদেশে আসলে কাকে বুঝানো হচ্ছে? ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে? না ইসহাক আলাইহিস সালামকে?

আমরা দুজনই চুপ করে আছি। সাজিদ বলে চলল—'এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের এই ঘটনার পেছনের ইতিহাস খতিয়ে দেখতে হবে। ইহুদী, খ্রিষ্টান, মুসলিম অর্থাৎ আব্রাহামিক ধর্মের সকল স্কলারগণ এই ব্যাপারে একমত যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জীবনের অধিকাংশ সময় সন্তানহীন ছিলেন। তখন তার স্ত্রী ছিলেন সারা আলাইহাস সালাম। যখন সারা আলাইহাস সালামের গর্ভে কোনো সন্তানের জন্ম হচ্ছিল না, তখন তিনি তার একজন দাসীর সাথে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বিয়ের বন্দোবস্ত করেন। সেই দাসীর নাম ছিল হাজেরা আলাইহাস সালাম। রাইট?'

'হুম' আমি বললাম।

'তাদের বিয়ের পরে হাজেরা আলাইহাস সালামের গর্ভ থেকে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ভূমিষ্ট হন যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বয়স ছিল চুরাশি বছর, তাই না?'

আহসান আঙ্কেল মাথা নেড়ে সায় দিলেন। সাজিদ বলতে লাগল—'অর্থাৎ ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং ইসলাম ধর্মের স্কলারগণ এই ব্যাপারে একমত যে, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রথম পুত্র। ইসমাঈলের বয়স যখন ১৪ বছর, তখন সারা আলাইহাস সালাম, অর্থাৎ ইবরাহীম আলাইহিস

সালামের প্রথম স্ত্রী, গর্ভবতী হন এবং পরে ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। মোদ্দাকথা, ইসহাক আলাইহিস সালাম, ইসমাঈল আলাইহিস সালামের চেয়ে ১৪ বছরের ছোট ছিলেন। আরও পরিষ্কারভাবে বললে—ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এবং ইসহাক আলাইহিস সালামের মধ্যে ১৪ বছরের একটা টাইম-গ্যাপ থেকে যায়। এতটুকু কি ক্লিয়ার?'

আহসান আঙ্কেল আবার 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়লেন।

'তাহলে, এখান থেকে, অর্থাৎ বাইবেল থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে—ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জন্মের পরে আরও ১৪ বছর পর্যন্ত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কেবল একজন সন্তানেরই পিতা ছিলেন। মানে তখন শুধু তার সন্তান ছিলেন—ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। রাইট?'

'হুম।'

'এখন, আমরা আবার বাইবেলের সেই অংশে ফিরে যাই, যে অংশে বলা হচ্ছে—'তোমার পুত্রকে, তোমার একমাত্র পুত্রকে নিয়ে যাও আমার দেখানো পর্বতে।' দেখুন আঙ্কেল, বাইবেল কিন্তু খুব স্পষ্ট করেই বলছে—'তোমার একমাত্র পুত্রকে।' এখন আমরা যদি খ্রিষ্টান মিশনারিদের কথামতো ধরেও নিই যে, এখানে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম নয়, ইসহাক আলাইহিস সালামকে বুঝানো হচ্ছে, তাহলে 'তোমার একমাত্র পুত্রকে' বলার কারণ কী? ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের পর তো ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মোট দুটো সন্তান হয়ে গেল। এখানে তো বলা উচিত 'তোমার পুত্রদের মধ্য থেকে' অথবা 'তোমার দুই পুত্রের মধ্য থেকে' ইত্যাদি। কারণ, এই ঘটনায় যদি ইসহাক আলাইহিস সালামকে টানি, তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান সংখ্যা দাঁড়ায় দুজন। তাহলে দুজন সন্তান থাকা সত্ত্বেও এখানে বাইবেল কেন 'তোমার একমাত্র পুত্রকে' বলল? এটি এজন্যেই যে, এই একমাত্র পুত্র ছিলেন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। এই ঘটনা অর্থাৎ সন্তান কুরবানীর ঘটনা যখন ঘটছে, তখন ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মও হয়নি। তখন কেবল ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একজনই সন্তান ছিল—ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। তাহলে বাইবেল এবং বাইবেলীয় ইতিহাস মতে—ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সেদিন ইসহাক আলাইহিস সালামকে নয়, ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে কুরবানী দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

এতটুকু বলে সাজিদ একটু থামল। আহসান আঙ্কেল বললেন—'কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে, সাজিদ। খ্রিস্টানরা ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে নবী হিশেবে এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বৈধ পুত্র হিশেবে স্বীকৃতি দিতে চায় না। কেন দিতে চায় না, জানো? কারণ, ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল একজন দাসীর গর্ভে, তাই।'

আহসান আঙ্কেলের এই কথা শুনে সাজিদ হাসল। এরকম সিরিয়াস ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে সে কখনো হাসে না। আজ ব্যতিক্রম হলো। হাসি থামিয়ে বলল—কিন্তু আঙ্কেল, বাইবেল যে এ ব্যাপারে একদম ভিন্ন কথা বলে।'

'যেমন?' আহসান আঙ্কেলের উৎসুক প্রশ্ন।

বাইবেলই বলছে, হাজেরা আলাইহাস সালাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বৈধ স্ত্রী ছিলেন। বাইবেলের জেনেসিসে বলা হয়েছে—'Sara, Abram's wife, took Hagar the Egyptian, her slave-girl, and gave her to her husband Abram as his wife.'[১]

অর্থাৎ 'সারা, যিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী ছিলেন, তার দাসী হাজেরা আলাইহাস সালামকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে দিলেন স্ত্রী হিশেবে।' এখান থেকে একেবারে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে হাজেরা আলাইহাস সালাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বৈধ স্ত্রী ছিলেন।'

আহসান আঙ্কেল বললেন, 'আই সী।'

'তাছাড়া, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম শুধু মুসলিম নয়, খ্রিস্টান এবং ইহুদীদের কাছেও একজন সম্মানিত প্রফেট। তাহলে তারা কীভাবে এটা ভেবে নিতে পারে যে এরকম সম্মানিত একজন প্রফেটের কারও সাথে অবৈধ সম্পর্ক থাকতে পারে এবং অবৈধ সন্তানও আসতে পারে?'

সাজিদের কথায় ভীষণ যুক্তি আছে। আসলেই তো। যাকে নবী হিশেবে মানে, তার বিরুদ্ধে এরা কীভাবে এরকম ধারণা পোষণ করে?

---

১ *জেনেসিস* : ১৬:৩

আহসান আঙ্কেল বললেন—'তোমার কথা বুঝতে পেরেছি আমি। তবে এ ব্যাপারে তাদের কাছে একটি যুক্তি আছে। তারা বলে—শিশু ইসমাঈল নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান হিশেবে ততদিন পর্যন্ত স্বীকৃত ছিলেন যতদিন ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্ম হয়নি। ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সাথে সাথে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান হবার মর্যাদা হারিয়ে ফেলেন।'

গ্লাস থেকে ঢকঢক করে পানি পান করল সাজিদ। এরপর গ্লাসটি টেবিলের ওপরে রাখতে গিয়ে বলল, 'এটাও কিন্তু একটা বাইবেল বিরোধী ঈমান, আঙ্কেল।'

সাজিদের কথায় আহসান আঙ্কেল বেশ অবাক হলেন। অবাক হলাম আমিও। চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে আহসান আঙ্কেল জানতে চাইলেন—'কোনটা?'

সাজিদ বলতে লাগল—'একটু আগে যে বললেন, যতদিন ইসহাক আলাইহিস সালাম জন্মাননি, ততদিন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র ছিলেন। ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সাথে সাথে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম পুত্রের মর্যাদা হারান।'

'হ্যাঁ। তারা এরকমই বলে' জবাব দিলেন আহসান আঙ্কেল।

'কিন্তু বাইবেল কী বলে জানেন?'

'কী?'

'বাইবেল বলছে—And his sons Isaac and Ishmael buried him (Abraham) in the cave of Machpelah.[১]

অর্থাৎ—'ইবরাহীমের পুত্র ইসহাক এবং ইসমাঈল ইবরাহীমকে দাফন করল মাকপেলাহ নামক একটি গুহায়'। দেখুন, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পরেও বাইবেল বলছে—And his sons Isaac and Ismael. লক্ষ্যণীয়, বাইবেল কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পরেও ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে তার পুত্র বলেই স্বীকৃতি দিচ্ছে, আর খ্রিষ্টান মিশনারিরা কিনা ইসহাক আলাইহিস

১ *জেনেসিস* : ২৫:৯

সালামের জন্মের পরেই ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পুত্রের খাতা থেকে বাতিল করে দিচ্ছে। এ যেন বাইবেলের ওপরেই একধরনের খবরদারি!'

আসলেই তো! সাজিদের কথা শুনে মনে হচ্ছে খ্রিস্টান মিশনারিগুলো তাদের বাইবেলটা ভালোমতো পড়েও দেখেনি। পড়লে তো এরকম আহাম্মকি যুক্তি দেখানোর কথা নয়।

আহসান আঙ্কেল বললেন—'বেশ যৌক্তিক আলোচনা; কিন্তু মিশনারিরা বলে, এই ঘটনায় কুরআনও ইসমাঈল নয়, ইসহাকের দিকেই নাকি ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ কুরআনের ইঙ্গিত থেকেও নাকি জানা যায়, সেদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাঈলকে নয়, পুত্র ইসহাককেই কুরবানী দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

আহসান আঙ্কেলের কথা শুনে আমি বেশ অবাক হলাম। কুরআন এরকম একটি কথা কীভাবে বলতে পারে?

সাজিদ বলল—'যেমন?'

আহসান আঙ্কেল বলতে লাগলেন—'সূরা সাফফাতের ৯৯ থেকে ১১২ নম্বর আয়াতগুলো দেখো—

[৯৯] সে (ইবরাহীম) বলল, আমি আমার রবের পথেই চলব। তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাবেন।

[১০০] হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সৎকর্মশীল একটি পুত্র সন্তান দান করুন।

[১০১] এরপর, আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম।

[১০২] অতঃপর সে (পুত্র সন্তানটি) যখন তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছাল, তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, 'বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি, তোমায় আমি জবেহ করছি। এখন বলো, তোমার অভিমত কী? সে বলল—হে পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন।

[১০৩] দুজনেই যখন আনুগত্যে মাথা নুইয়ে দিল। আর ইবরাহীম তাকে উপুড়

করে শুইয়ে দিল।

[১০৪] আমি তাকে ডাক দিলাম ‘হে ইবরাহীম!’

[১০৫] তুমি তোমার ওয়াদা পূর্ণ করেছ। নিশ্চয়ই, আল্লাহ এভাবে সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করেন।

[১০৬] এটি ছিল একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

[১০৭] এবং আমি তাকে এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে ছাড়িয়ে নিলাম।

[১০৮] এবং আমি তাকে পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় করে রাখলাম।

[১০৯] ইবরাহীমের ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক।

[১১০] এভাবেই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করেন।

[১১১] সে (ইবরাহীম) ছিল সৎকর্মশীলদের একজন।

[১১২] আর তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, যে ছিল সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবী।[১]

এখান থেকে খ্রিষ্টান মিশনারিরা বলতে চায় যে, আয়াতের প্রথম দিকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু তার নাম উল্লেখ করা নেই। সূরাটিতে আরও কিছুদূর পরে এসে আবারও সুসংবাদ সংবলিত একটি পুত্রের কথা বলা হয় এবং নামও উল্লেখ করা হয়। এবার যার নাম উল্লেখ করা হয় তিনি হলেন ইসহাক আলাইহিস সালাম, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম নয়। অর্থাৎ কুরআন থেকেই সুস্পষ্ট যে, সেদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে নয়, ইসহাক আলাইহিস সালামকেই কুরবানী করার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন।’

সাজিদ একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, ‘আঙ্কেল, মিশনারিদের এই যুক্তি খুবই দুর্বল।’

---

১ সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৯৯-১১২

'কীভাবে?' প্রশ্ন করলেন আহসান আঙ্কেল।

'প্রথমে সূরা সাফফাতের একশতম আয়াতটি খেয়াল করুন। ওখানে কী বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে—হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সৎকর্মশীল একজন পুত্র সন্তান দান করুন।'

এখন আমাদের জানতে হবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই প্রার্থনা কবে করেছিলেন। এই প্রার্থনা তিনি তখন করেছিলেন যখন তিনি সন্তানহীন ছিলেন। আগেই বলেছি, জীবনের দীর্ঘ চুরাশি বছর পর্যন্ত তিনি কোনো সন্তানের মুখ দেখেননি। ঠিক?'

'হ্যাঁ' বললাম আমি।

'এর পরের আয়াতে কী আছে দেখুন। পরের আয়াতে আছে 'এরপর আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিলাম।'

খেয়াল করুন, সন্তানহীন অবস্থায় তিনি একজন সন্তানের জন্য প্রার্থনা করলেন। এরপর আল্লাহ তাকে পুত্র-সন্তান দান করলেন। সে কে তাহলে? ইহুদী, খ্রিষ্টান ও ইসলাম এই তিন ধর্মের স্কলারগণ এই ব্যাপারে একমত যে—প্রার্থনার পরে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে-সন্তান লাভ করেছিলেন তিনি-ই ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।

তাহলে, ঘটনার পরম্পরা এবং ইতিহাস বলছে—প্রথম সন্তান ইসহাক আলাইহিস সালাম নয়, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। এইটুকু কি ক্লিয়ার?'

আমরা উভয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। সাজিদ আবার বলতে লাগল, 'এরপরের আয়াতে যান। বলা হচ্ছে—'অতঃপর পুত্র-সন্তানটি যখন তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছাল, তখন ইবরাহীম বলল, 'বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন বলো, এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কী? সে বলল, 'হে পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন।'

আগের দুই আয়াত থেকে একটি ব্যাপার ক্লিয়ার যে, উক্ত সন্তান ছিলেন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, ইসহাক আলাইহিস সালাম নন এবং যাকে কুরবানী করার স্বপ্ন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দেখলেন, সেও তাহলে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।

আর তখন কিন্তু ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মও হয়নি। কথাগুলোকে যদি আমরা প্রশ্নোত্তর-আকারে সাজাই তাহলে কীরকম দাঁড়ায় দেখা যাক—

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সন্তানের জন্য কখন প্রার্থনা করলেন?

যখন তিনি সন্তানহীন ছিলেন।

আল্লাহ তার দোয়া কবুল করে যখন তাকে একজন পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দেন, সে কি প্রথম সন্তান না দ্বিতীয়?

প্রথম সন্তান।

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রথম সন্তানের নাম কী?

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।

আয়াতে কোন সন্তানকে কুরবানী করার কথা বলা আছে?

দোয়া কবুলের পর সুসংবাদ-প্রাপ্ত সন্তানকে।

সেই সন্তান কে ছিলেন?

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।

সুতরাং, এখান থেকে এটি প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে উল্লিখিত সন্তান ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, ইসহাক আলাইহিস সালাম নয়।'

এতটুকু বলে সাজিদ থামল। আমাদের দুজনের কেউ কোনো কথা বলছি না দেখে সে আবার বলতে শুরু করল—'এবার তাহলে মিশনারিদের লজিকে আসা যাক। তারা বলছে—কুরআন প্রথমে একজন পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছে; কিন্তু কারও নাম উল্লেখ করেনি। কিছুদূর এসে কুরআন আবারও সুসংবাদসহ ইসহাক আলাইহিস সালামের নাম উল্লেখ করেছে। এখান থেকে তারা ধরে নিচ্ছে যে, কুরবানী করতে নিয়ে যাওয়া পুত্র ইসহাক ছিলেন, ইসমাঈল নয়; কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা এই আয়াতগুলো থেকে এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, ইসহাক আলাইহিস সালামের নয়।

যদি তাদের দাবি মেনেও নিই, তাহলে ব্যাপারটি কেমন দাঁড়ায়? ধরে নিই যে এখানে ইসমাঈল নয়, ইসহাক আলাইহিস সালামের কথাই বলা হচ্ছে। তাহলে আয়াতের পরম্পরা অনুযায়ী দেখুন তো কেমন দেখায় ব্যাপারটি—

প্রথমে পুত্র ইসহাক আলাইহিস সালামের সুসংবাদ দেওয়া হলো। এরপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসহাক আলাইহিস সালামকে কুরবানী করার স্বপ্ন দেখলেন এবং ইসহাক আলাইহিস সালাম রাজি হলেন। ইসহাককে কুরবানী করতে নিয়ে যাওয়া হলো। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কুরবানী করতে উদ্যত হলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনুগ্রহ করে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। এরপর? এরপর আরও নিচে এসে আবারও ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হলো।

ব্যাপারটা কেমন বেখাপ্পা দেখাচ্ছে দেখুন। একবার ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ। এরপরে তার বেড়ে ওঠার কাহিনি। তারপরে তাকে কুরবানী করার ও তাকে বাঁচিয়ে নেওয়ার কাহিনি। শেষে এসে আবার তার জন্মের কাহিনি। কেমন না ব্যাপারটা?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, পুরোই বিদঘুটে ব্যাপার।'

'ইসহাক আলাইহিস সালামকে এখানে বসাতে হলে কুরআন নিজেই তার বাচনভঙ্গি থেকে সরে যাচ্ছে; কিন্তু কুরআন এখানে ইসহাক আলাইহিস সালামকে নয়, ইসমাঈল আলাইহিস সালামকেই বুঝিয়েছে। তাছাড়া, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছার কাছে নিজের জীবন এভাবে উৎসর্গ করে দিতে সর্বোচ্চ ধৈর্য শক্তির পরিচয় দিতে হবে। কুরআনের অনেক জায়গায় ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে 'ধৈর্যশীল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] অন্যদিকে, কুরআনে ইসহাক আলাইহিস সালামকে উল্লেখ করা হয়েছে 'জ্ঞানবান' হিশেবে।[২]

এখান থেকেও উপসংহারে পৌঁছানো যায় যে, সেদিনের ঘটনায় ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন, ইসহাক আলাইহিস সালাম নয়।

---

১ সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৫

২ সূরা যারিআত, ৫১ : ২৮

এছাড়াও, বিখ্যাত তাফসীরকারক ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত বই *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে ইবনু আব্বাস রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতি টেনে লিখেছেন, 'সেদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে-পশু দিয়ে কুরবানী করেছিলেন তার শিং কাবা শরীফের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে সংরক্ষিত ছিল।'[১]

এখান থেকেও বোঝা যায় যে, উক্ত ঘটনায় সেদিন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-ই ছিলেন, ইসহাক আলাইহিস সালাম নয়। কারণ, এই বিষয়ে সকল ইতিহাসবিদ একমত যে, কেবল ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-ই মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। ইসহাক আলাইহিস সালাম কখনোই মক্কায় আসেননি। তিনি ছিলেন মিশরে। সুতরাং, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মেরও হাজার বছর আগে থেকে আরবরা জানত, এখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজপুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে কুরবানী দিতে এনেছিলেন। তাই ইসমাঈল আলাইহিস সালামের সেই স্মৃতি রক্ষার্থে তারা যুগ যুগ ধরে সেটা সংরক্ষণ করে রেখেছিল। যদি ইসমাঈলের জায়গায় ইসহাক আলাইহিস সালাম হতেন, তাহলে পশুর এই শিং প্রাচীন মক্কার আরবদের পাওয়ার কথাই না। এখান থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, সেদিন ঘটনাস্থলে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন, ইসহাক আলাইহিস সালাম নয়।'

আহসান আঙ্কেল আরও কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলেন। তিনি কিছু বলার আগেই সাজিদ বলে উঠল—আঙ্কেল, Encyclopedia Judaica-তে কী বলা আছে আপনি জানেন?

আহসান আঙ্কেল বললেন, 'কী বলা আছে?'

'বলা আছে—It is related that a renowned traditionalist of Jewish origin, from the Qurayza tribe, and another Jewish scholar, who converted to Islam, told that Caliph Omar Ibn Abd al- c Aziz (717-20) that the Jews were well informed that Ismail was the one who was bound, but that they concealed this out of jealousy.'[২]

---

১ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ০১; পৃষ্ঠা : ১৫৭

২ Encyclopedia Judaica, Volume : 09

অর্থাৎ ইহুদীরাও খুব ভালোভাবে জানত যে, সেদিনকার ঘটনায় ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-ই ছিলেন, ইসহাক আলাইহিস সালাম নয়; কিন্তু ঈর্ষান্বিত ইহুদীরা এটা খুব সুকৌশলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।'

আমি বললাম, 'এটা স্বীকার করে নিলে তাদের ক্ষতি কী?'

সাজিদ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরাও খুব ভালোভাবে জানত যে, শেষ যামানায় একজন ঈশ্বরের দূত আসবে। তারা আশা করে রেখেছিল, সেই দূত হবে ইসহাক আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্য থেকে। কারণ, ইসহাক আলাইহিস সালাম ছিলেন সারা আলাইহাস সালামের গর্ভের, যিনি একজন স্বাধীন নারী ছিলেন। পক্ষান্তরে, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জন্মেছেন হাজেরা আলাইহাস সালামের গর্ভে, যিনি ছিলেন একজন দাসী। অর্থাৎ একজন দাসীর পেটে জন্ম নেওয়া সন্তানের বংশে ঈশ্বর এরকম একজন সম্মানিত দূত পাঠাবে, এটি অহংকারী ইহুদী-খ্রিষ্টানরা মেনে নিতে পারেনি, তাই।'

এতটুকু বলে সাজিদ তার হাতে থাকা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আঙ্কেল, আমার আরেকটি ক্লাস আছে। আজকে উঠতে হবে যে।'

টেবিলে রাখা বইগুলো সাজিদ হাতে তুলে নিচ্ছে। দেখলাম বইগুলোর মধ্যে মাওলানা আকরাম খাঁ রচিত *মোস্তফা চরিত* বইটিও রয়েছে। আমি টান দিয়ে সেটা ওর হাত থেকে নিয়ে নিলাম। এত ভালো মানের সীরাত এভাবে হাতছাড়া করা যায় না।

সাজিদ আহসান আঙ্কেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আঙ্কেল, আজ তাহলে আসি?'

আহসান আঙ্কেল আরেকবার হাত বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। হ্যান্ডশেক করা হলে আহসান আঙ্কেল সাজিদের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'Live long my son'।

সাজিদ মুচকি হাসল। তার ক্লাসের তাড়া আছে। সালাম দিয়ে সে ক্লাসের উদ্দেশ্যে ছুটল। সাজিদ চলে যাবার পরে আমি আহসান আঙ্কেলের দিকে তাকালাম। মনে হচ্ছে, এই লোকটার বয়স হওয়া উচিত ছিল ৩০ বছর; কিন্তু লোকটা ইতোমধ্যেই ৫০ এর কোঠা পার করে ফেলেছে। তার চেহারা থেকে বিরক্তির আভাটুকু চলে গেছে। বিরক্তির বদলে সেখানে জায়গা করে নিয়েছে এক চিলতে হাসি।

ইসলাম কি অমুসলিমদের অধিকার নিশ্চিত করে?

ভ্যাকেশনের সময়টাতে আমরা সাধারণত ঘুরতে বেরিয়ে পড়ি। ঘোরাঘুরির প্রতি আমার আগ্রহ বা কৌতূহল—কোনোটাই কোনোকালে ছিল না। ক্লাস, ল্যাব, এক্সাম—এসবের ভিড়ে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকতাম কবে একদিন ছুটি পাব আর পুরোদিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবো। করতামও তাই। ছুটির দিন মানেই আরামসে ঘুম; কিন্তু এই অভ্যাসের যবনিকাপতন ঘটে সাজিদের হাতে। যখন থেকে তার সাথে পরিচয়, ঠিক তখন থেকেই তার মধ্যে দুটি নেশা প্রবলভাবে দেখে আসছি। একটি হচ্ছে বই পড়া আর অন্যটা ঘোরাঘুরি।

'ট্রাভেলিং' বিষয়ক বাংলা এবং ইংরেজিতে যতগুলো বই আছে মোটামুটি সবগুলো তার পড়া। সে শিডিউল করে রেখেছে, ফাইনাল সেমিস্টারের পরে আমাকে নিয়ে নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম যাবে। আমস্টারডামের কোথায় কোথায় ঘুরব তারও একটি শর্ট লিস্ট রেডি করে রেখেছে সে।

সেই শিডিউলে আছে Anne Frank House, যে গৃহটির ওপর নির্মিত হয়েছে বিখ্যাত মুভি 'The Diary of a Young Girl', পৃথিবীর একমাত্র ভাসন্ত ফুলের মার্কেট Bloemenmarkt, Tuschinski Theater, Dam Square-সহ আরও বিভিন্ন বিখ্যাত জায়গা। সাজিদের ভাষ্যমতে, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই পৃথিবীকে এত সুন্দর করে সাজিয়েছেন—যাতে মানুষ তার অবসরে এইসব সৌন্দর্য অবলোকন করে নৈসর্গিক আনন্দ লাভ করতে পারে। অন্যথায় একটি ছোট্ট ফুলের পাঁপড়ির মধ্যে এরকম অঢেল লাবণ্য আর কারুকাজ দেওয়ার কোনো দরকার ছিল না।

আমাদের কাছে সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ মাপকাঠি হচ্ছে জান্নাত। সাজিদ বলে, সৌন্দর্যের এই পরম মাত্রা বুঝাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খুবই কমন কিছু জিনিস উপমা হিশেবে ব্যবহার করেছেন। যেমন—ঝরনা, বাগান ইত্যাদি, যা আমাদের হাতের নাগালের মধ্যেই। আমরা হরহামেশাই চাইলে দুনিয়ায় এসব দেখতে পারি। এসব উপমা দেওয়ার কারণ হতে পারে এই—আল্লাহ চাইছেন আমরা এসব দেখে, এসবের সৌন্দর্য দেখে বিমুগ্ধ হই এবং ভাবি—'আহ! এগুলোই এত মনোহর! জান্নাতের নহর আর বাগান না জানি কত সুন্দর!' আল্লাহ চান মানুষ ভ্রমণ করুক। দেখুক। বুঝুক। অনুধাবন করুক।

এই সব আলাপ সামনে এলে সাজিদ 'ট্রাভেলিং' ইস্যুতে বিখ্যাত মনীষীদের উক্তি কপচানোর সাথে সাথে 'ভ্রমণ' বিষয়ক কুরআনের আয়াতগুলোও শুনিয়ে দেয়। আমরা যারা ভ্রমণকে নেহায়েত সময় আর অর্থ নষ্ট ভেবে ছুটির দিনে রুমের দরজা-জানালা বন্ধ করে অঘোর ঘুমে মজে থাকি, তাদের তখন চেহারা মলিন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

ফিরছিলাম রাজশাহী থেকে। গিয়েছিলাম দাওয়াতে। সাজিদের ফুফাত ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান। একসাথে দুটি কাজ সেরে ফেলা হলো। দাওয়াত-খাওয়া আর মহাস্থানগড় ভ্রমণ করা। সাহিত্যের ভাষায় যাকে 'রথ দেখা আর কলা বেচা' বলে।

সে যাহোক, রাতের ট্রেন। তিন দিনের সফর শেষে বাসায় যাচ্ছি। আমি খুব ক্লান্ত। মনে হচ্ছে বিছানায় শোয়া মাত্রই ঘুম চলে আসবে। সাজিদের দিকে তাকালাম। সে বসে আছে আমার পাশেই। তার চেহারায় ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই। মনে হচ্ছে এক্ষুনি কেউ যদি তাকে ৫০০ মিটার দৌড়ে আসতে বলে তবুও সে হাসিমুখেই রাজি হয়ে যাবে।

আমাদের ঠিক উল্টোদিকের সামনের সিটে, সাজিদের মুখ বরাবর মধ্যবয়স্ক একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। চুল আর দাড়িতে মেহেদীর কলপ করেছেন বলে বয়স তেমন বোঝা যাচ্ছে না। খুবই শৌখিন মানুষ হয়তো। শৌখিন মানুষগুলোই চুল-দাড়িতে মেহেদীর কলপ করে থাকে সাধারণত। আমার দাদা ছিলেন ব্রিটিশ আমলের সরকারি চাকুরিজীবী। দাদাও প্রতিমাসে তার চুল আর দাড়িতে মেহেদীর কলপ লাগাতেন। আমাদের বাড়ির উঠোনে ইয়া বড় একটি মেহেদী গাছ ছিল। দাদির দাবি, এই গাছের দুই-তৃতীয়াংশ পাতা দাদাই ব্যবহার করতেন। মৃত্যুর মাস

দেড়েক আগেও দাদা চুল-দাড়িতে মেহেদীর কলপ লাগিয়েছিলেন বলে দাদির কাছে শুনেছিলাম। সে যাহোক, আমাদের সামনে যে ভদ্রলোক বসে আছেন, তার হাতে একটি ইংরেজি পত্রিকার ম্যাগাজিন। নাম-*Lifestyle.*

দাড়িতে মেহেদী লাগিয়ে সেগুলোকে কৃষ্ণচূড়া ফুলের মতো টকটকে লাল করে ফেলার পদ্ধতিটি হয়তো এই ম্যাগজিন থেকেই শেখা। এই মুহূর্তে আমার খুব ঘুম দরকার; কিন্তু ট্রেন চলার শব্দ আর ঝাঁকুনির কবলে পড়ে চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেছে ততক্ষণে।

সাজিদ একমনে বই পড়ছে। বইটির নাম *'There is a God: How World's most notorious Atheists changed his mind.'* একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ ফিলোসফারের লেখা বই, যিনি একসময় কট্টর নাস্তিক ছিলেন। পরে নাস্তিকতা থেকে ফিরে এসে তিনি এই বই লিখে ব্যাপক হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। সাজিদের পাশে বসে আমি কেবল হাই তুলছি আর ঝিমুচ্ছি।

একটুপরে আমাদের সামনের ভদ্রলোক কথা বলে উঠলেন। তিনি একটি চিপসের প্যাকেট খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন—'Please Take.'

ভদ্রলোকের আবদার দেখে আমার হাই আর ঝিমুনি দুইটাই উবে গেল। মুহূর্তেই আমি স্বাভাবিক চেহারা বানিয়ে বললাম—'No, Thanks.'

ভদ্রলোক একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, 'ভয় পাচ্ছ নাকি?'

আমি কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। ভদ্রলোক ভাবছেন হয়তো তাকে কোনো হাইজ্যাকার-টাইজ্যাকার ভেবে আমি তার কাছ থেকে চিপস নিতে চাচ্ছি না। আমার হয়ে জবাব দিল সাজিদ। বলল, 'আঙ্কেল, ওর আসলে ফাস্টফুডে এলার্জি আছে।'

'ওহ আচ্ছা। তাই বলো' ভদ্রলোক বললেন। এরপর সাজিদের দিকে প্যাকেটখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি নাও।'

সাজিদ নিল। দুটুকরো পটেটো চিপস মুখে পুরে দিয়ে সে ভদ্রলোককে বলল, 'Thank You.'

'তোমার নাম?' ভদ্রলোকের প্রশ্ন।

'সাজিদ'

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'রাজশাহীতে বেড়াতে এসেছিলাম। ঢাকা ফিরছি।'

এতটুকু আলাপের পরে সাজিদ আবার বই পড়ায় মন দিল। ততক্ষণে ভদ্রলোক পটেটো চিপসের প্যাকেটটি খালি করে সেটি জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। একটুপরে তিনি সাজিদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খুবই পারসোনাল একটি প্রশ্ন করতে পারি?'

সাজিদ সাতপাঁচ না ভেবে বলল, 'কোনো সমস্যা নেই।'

'তোমার হাতে থাকা বইটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। কিছু মনে না করলে আমি কি বইটি একটু দেখতে পারি?'

সাজিদ হাসি মুখে 'অবশ্যই' বলতে বলতে ভদ্রলোকের দিকে বইটি এগিয়ে দিল। তিনি বইটি হাতে পেয়ে বেশ কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখলেন। এরপর বইটি আবার সাজিদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। বেশ ভালো বই বলে মনে হলো।'

সাজিদ কিছু না বলে বইটি খুলে আগের জায়গা থেকে পড়তে শুরু করল। ভদ্রলোক একটু পরে আবার বললেন, 'সরি, ইফ আই মাইট হ্যাভ বদারড ইউ। আমার মনে হচ্ছে তুমি কম্পারেটিভ রিলিজিওনের ছাত্র। আসলে তোমার হাতে থাকা বইটি দেখেই অনুমান করছি।'

সাজিদ বলল, 'জি না। কম্পারেটিভ রিলিজিওন আমার অ্যাকাডেমিক সাবজেক্ট নয়। তবে বিষয়টি আমার খুব ফেভারিট। এজন্যেই সুযোগ পেলে আমি এটা নিয়ে পড়াশোনা করি।'

সাজিদের উত্তর শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'দ্যাট'স গ্রেট।' এরপর সাজিদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নাইস টু মিট ইউ।'

সাজিদ মুখে কোনোকিছু না বলে হাত মিলাল। করমর্দন-পর্ব শেষ হতেই তিনি আবার বললেন, 'কিছু মনে না করলে আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতাম।'

সাজিদ তার হাতে থাকা বইটি বন্ধ করে বলল, 'জি, অবশ্যই।'

মুচকি হাসলেন ভদ্রলোক। সম্ভবত আড্ডা দেওয়ার মানুষ পেয়ে তিনি যারপরনাই খুশি এই মুহূর্তে।

প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে তিনি বললেন, 'আসলে, পারিবারিকভাবে আমি মুসলিম পরিবারের সন্তান। ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয়েছে ইসলাম হলো একটি সাম্যের ধর্ম। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমার মনে নানা ধরনের প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করে। আমি অবশ্য ধর্ম কিংবা স্রষ্টা কোনোটিই অস্বীকার বা অবিশ্বাস করি না। ইসলাম নিয়েও আমার ঢের কোনো আপত্তি নেই। তবুও মাঝে মাঝে আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগে। আমার খুব করে জানতে মন চায়—ইসলাম অমুসলিমদের স্বাধীনতা রক্ষায়, অধিকার রক্ষার ব্যাপারে আদৌ তৎপর কি না? তুমি প্রশ্ন করতে পারো, আমার মধ্যে এই প্রশ্ন জাগল কেন? আসলে, ব্যক্তিগত জীবনে এবং চাকরির সুবাদে দেশে-বিদেশে প্রচুর অমুসলিমের সাথে আমি লেনদেন করেছি। তাদের অধিকাংশকেই আমি সৎ ও ভালো মানুষ হিশেবে পেয়েছি। এমতাবস্থায়, যদি ধরে নিই যে, দেশে শারয়ী আইন বাস্তবায়িত হচ্ছে, তাহলে তাদের সাথে ইসলামিক পারস্পেক্টিভ থেকে কীরকম আচরণ করা হবে? তাদের অধিকার কতটুকু নিশ্চিত করা হবে? তাদের ধর্মান্তকরণে জোর-জুলুম, জবরদস্তি করা হবে কি না?'

ভদ্রলোক এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন কথাগুলো। কোথাও একটিবারের জন্যও থামেননি। প্রশ্ন করা শেষে তিনি উৎসুক চোখ নিয়ে সাজিদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন উত্তর পাবার আশায়। সাজিদ খানিকটা সময় নিয়ে কিছু চিন্তা করে বলল, 'ভেরি গুড কোয়েশ্চান। এই ব্যাপারে সঠিক ধারণাটি আমাদের প্রত্যেকেরই জানা উচিত। এমন নয় যে, এটা আমাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রশ্ন। ইসলামকে আক্রমণ করতে আসা অনেকে এই প্রশ্নটা করে থাকে। তারা বলে, শারয়ী আইন নাকি অমুসলিমদের অধিকার খর্ব করে, তাদের ধর্মান্তকরণে জোর জবরদস্তি করে ইত্যাদি।'

আমার চোখেমুখে ঘুমের যে লেশটুকু অবশিষ্ট ছিল, এখন তাও লাপাত্তা। এদের দুজনের আলোচনা শোনার জন্য একটু নড়েচড়ে বসলাম। ট্রেনের জানালার ফাঁক গলে বাইরের বাতাস এসে ভেতরে ঢুকছে। তাতে হালকা শীত শীতও লাগছে। ভদ্রলোক সাজিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী যেন নাম তোমার?'

সাজিদ সুন্দর করে তার নাম বলল। তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমাকেও জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম?'

বললাম, 'আরিফ।'

'বেশ! শুরু করা যাক তাহলে?'

দুর্বার গতিতে ছুটে চলছে ঢাকাগামী ট্রেন। শামসুর রাহমানের কবিতার মতো ঝকঝক শব্দ করে করে এটি পার করছে একটির পর একটি স্টেশন। আশপাশের গাছপালা, মানুষগুলোকে খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির মনে হচ্ছে।

সাজিদ বলল, 'ব্যাপারটি ভালোমতো বোঝার জন্য প্রথমে আমাদের দেখতে হবে এই ইস্যুতে কুরআন কী বলছে। কুরআন বলছে, 'There shall be no compulsion in (acceptance of) the religion.' অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে কোনোরকম জোরজবরদস্তি নেই।'[১]

কথাটি খুবই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিচ্ছেন যে, ধর্মে কোনোরকম চাপাচাপি নেই। আপনি হিন্দু ধর্ম পালন করতে চান? খ্রিস্টান অথবা ইহুদী ধর্ম? ফাইন। ইসলাম বলছে, আপনি সেটি অবশ্যই পারেন। ইসলাম এক্ষেত্রে আপনাকে বাঁধা দেবে না।'

তিনি বললেন, 'তাহলে কেউ অন্য ধর্ম মানতে চাইলে তাকে তার ধর্ম ছেড়ে আমার ধর্মে আসার জন্য বলতে পারব না?'

সাজিদ বলল, 'অবশ্যই পারবেন। এটা তো জোরজবরদস্তি নয়। এটা আপনার বিশ্বাসের প্রচারণা। আর এই প্রচারণা কীভাবে করতে হবে সেটারও খুব সুন্দর উপায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'Invite (all) to the way of ur Lord with wisdom & beautiful preaching; And argue with them in ways that are best & most gracious.'[২] অর্থাৎ 'স্বীয় রবের পথে মানুষকে আহ্বান করুন জ্ঞান এবং হিকমার মাধ্যমে। আর তাদের সাথে কথা বলুন সুন্দরভাবে।' দেখুন, এখানে খুবই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া আছে মানুষদের দ্বীনের পথে ডাকার পদ্ধতি। ইসলাম বলছে, আপনি তাদের সাথে অহেতুক, অযৌক্তিক কথা বলতে পারবেন না। আপনি যদি দাবি করেন যে আপনার বিশ্বাস সত্য, আপনার ধর্ম সত্য, তাহলে উপর্যুপরি যুক্তি, প্রমাণ, দলীল দেখিয়ে তাদের সাথে তর্ক করতে বলা হয়েছে এবং তর্কের সময়ে আপনাকে তাদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহারটাই করতে বলা হয়েছে।'

---

১ সূরা বাকারা, ০২ : ২৫৬

২ সূরা নাহল, ১৬ : ১২৫

'হুম; কিন্তু কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে মুশরিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করতে। এটা কেন?'

'খুবই সহজ জিনিস। হ্যাঁ, কুরআন বলেছে মুশরিকদের যেখানেও পাও, হত্যা করো; কিন্তু, আপনাকে এই আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট জানতে হবে। এই আয়াত নাযিল হয়েছিল যুদ্ধের উত্তপ্ত সময়ে যখন মুসলিম বাহিনী এবং মুশরিক বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি। এই আয়াতে যে-নির্দেশ এসেছে সেটি কেবল ওই প্রেক্ষাপটে। যেমন—৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার কালজয়ী ভাষণে বলেছিলেন, 'আমরা ওদের ভাতে মারব, পানিতে মারব।' তার এই কথাগুলো তখন যুদ্ধশিবিরে অবস্থানরত সৈনিকদের উদ্দীপ্ত করেছিল; প্রেরণা জুগিয়েছিল; কিন্তু আজকে এই সময়ে কি আমরা বলি, 'পাকিস্তানীদের আমরা ভাতে মারব, পানিতে মারব? বলি না। ঠিক একইভাবে, কুরআনের সেই আয়াত বিশেষ একটি সময়, প্রেক্ষাপট ও একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছিল। এটা কোনোভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, এই আয়াত দিয়ে ইসলাম সবসময় অমুসলিমদের হত্যার বিধান দিয়েছে বা এরকম কিছু।'

সাজিদ থামল। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, 'কুরআন কি এমন কারও সাথে রক্তারক্তিতে জড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিচ্ছে না, যারা আদতে সংখ্যালঘু এবং নিরপরাধ?'

আমি সাজিদের মুখ থেকে কথা কেড়ে নেওয়ার মতো করে বললাম, 'একদমই না। প্রথমত এই আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন কাফির-মুশরিকরা সংখ্যালঘু ছিল না; বরং মুসলিমরা ছিল সংখ্যালঘু।'

সাজিদ বলল, 'আপনার পয়েন্টটি দারুণ। কুরআন কি অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বলেছে? দেখুন, আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলছেন, 'Fight in the way of Allah (with) those who fight you.'[১] অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, 'তাদের সাথেই কেবল যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।' পৃথিবীর কোনো জাতি কি এই থিওরিতে বিশ্বাস করে যে, অন্য একটি জাতি এসে তাদের মেরে সাফ করে যাবে, আর তারা তাদের জামাই আদর দিয়ে বরণ করে নেবে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না।'

---

১ সূরা বাকারা, ০২ : ১৯০

সাজিদ আবার বলল, 'এরপরেই কুরআন বলছে, 'But do not transgress.' অর্থাৎ কিন্তু সীমা অতিক্রম কোরো না।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, তোমাদের সাথে যারা যুদ্ধ করবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিন্তু সীমা ছাড়িয়ো না। এটা কীরকম সীমা? মানে, যারা যুদ্ধ করতে চায় না বা করে না, যারা মুশরিক-কাফির; কিন্তু অত্যাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, যারা নিরপরাধ, তাদের যেন জান এবং মালের কোনো ক্ষতি না হয়। এরকম বাড়াবাড়ি করলে কী হবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একই আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদের ভালোবাসেন না।' এটাই হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে মুসলিমদের জন্য যুদ্ধের শর্ত এবং বাউন্ডারি। বলুন তো এরমধ্যে আপনি এমন কিছু কি দেখছেন যেটা আপনার দৃষ্টিতে খারাপ বা বাড়াবাড়ি?'

লোকটা 'না' সূচক মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, 'ধর্মগ্রহণে ইসলাম কখনোই জোরজবরদস্তি করে না। কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে—'তোমার ধর্ম তোমার জন্য, আমার ধর্ম আমার জন্য।'[১]

সাজিদ আবার বলতে শুরু করল, 'গেল কুরআনের কথা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী দেখলেই বোঝা যায়, তিনি অমুসলিমদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে কতটা তৎপর ছিলেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'যেমন?'

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সাবধান! তোমাদের যে-ব্যক্তি কোনো নিরপরাধ অমুসলিম ব্যক্তির ওপর নির্যাতন চালাবে, তার অধিকার খর্ব করবে, তাকে দুঃখ দেবে, অথবা তার অনুমতি ব্যতীত তার কাছ থেকে কোনোকিছু ছিনিয়ে নেবে, জেনে রাখো কিয়ামতের মাঠে আমি তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবো।'[২] এরচেয়ে উত্তম কিছু আর কী হতে পারে বলুন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম স্বয়ং সেই মুসলিমের সাথে যুদ্ধে নামার ঘোষণা দিচ্ছেন, যে একজন নিরপরাধ অমুসলিমকে কষ্ট দেয়, আঘাত করে, অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তিনি আরও

---

১ সূরা কাফিরুন, ১০৯ : ০৬

২ *সুনানু আবি দাউদ*, ৩/ ১৭০

বলেছেন, ‘যদি কোনো মুসলিম কোনো নিরপরাধ অমুসলিমকে বিনা কারণে হত্যা করে, তাহলে সে জান্নাতের খুশবু পর্যন্ত পাবে না, যদিও জান্নাতের এই খুশবু ৪০ হাজার বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।’[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সঙ্গীরা যখন নিজেদের ওপর অকথ্য, অবর্ণনীয় অত্যাচার, নির্যাতনের পরে প্রিয় স্বদেশ ত্যাগ করে মদীনায় চলে যান, কয়েক বছর পরে তারা মক্কা বিজয় করে আবার স্বদেশে ফিরে আসেন। মক্কায় ফেরার পরে মুসলিমদের এক সেনাপতি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে বসেন, ‘আজ হচ্ছে আমাদের প্রতিশোধ নেবার দিন।’ তার মুখে এই কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, ‘না! আজ হচ্ছে উন্মুক্ত ক্ষমার দিন।’ এরপরে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার মুশরিকদের দিকে ফিরে বললেন, ‘আজ তোমরা আমার কাছ থেকে কেমন আচরণ আশা করো?’ মুশরিকরা বলল, ‘আমরা আপনার কাছ থেকে তেমন আচরণই আশা করি, যেমন আচরণ ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার পাপিষ্ঠ ভাইদের সাথে করেছিলেন।’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক সেই কথাটাই বললেন যা ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার ভাইদের সাথে বলেছিলেন—‘আজ তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন করা হবে না। আজ তোমরা সকলেই মুক্ত।’[২]

সাজিদ বলে চলল, ‘কতটুকু নরম, কোমল প্রকৃতির অধিকারী হলে একজন নেতা তার পরম শত্রুদের এত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ক্ষমা করে দিতে পারে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘অমুসলিমদের অধিকার রক্ষা করা আমার ওপর আরোপিত বিশেষ কর্তব্যগুলোর একটি।’[৩]

আমরা গভীর মনোযোগ দিয়ে সাজিদের কথা শুনছি। সে বলে যাচ্ছে—‘একবার মিশরের এক মুসলিম শাসক একজন অমুসলিমকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন। এই খবর যখন খলিফা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এর কানে এলো, তখন তিনি সেই অমুসলিমকে নির্দেশ দিলেন; মুসলিম শাসককে ঠিক সেভাবেই শাস্তি দেওয়ার জন্য

---

১ *সহীহ আল-বুখারী*, ০৩ / ২২৯৫

২ *ফাতহুল বারী*, ইমাম ইবনু হাজার আল-আসকালীন, খণ্ড : ০৮; পৃষ্ঠা : ১৮

৩ *সুনানু বায়হাকী*, খণ্ড : ০৮; পৃষ্ঠা : ৩০

যেভাবে অমুসলিম ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তিনি তখন ক্ষুব্ধস্বরে মুসলিম শাসককে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, 'কখন থেকে মানুষকে তুমি তোমার দাস ভাবা শুরু করেছ?'[১]

দেখুন, এই ঘটনাগুলোই প্রমাণ করে অমুসলিমদের অধিকার, মর্যাদা রক্ষায় ইসলাম কতটা উদার ও তৎপর।'

সাজিদ থামল। ভদ্রলোক বললেন, 'ইসলামী শাসন চালু হলে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের সাথে কী করা হবে?'

সাজিদ পানির বোতল থেকে পানি ঢেলে মুখে ছিটিয়ে নিল হালকা। এরপরে বলল, 'আরেকটি চমৎকার প্রশ্ন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজরান অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের ভূমি এবং তার শাসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদের জীবন, তাদের ভূমি, তাদের সম্পদ, তাদের উপসনালয় সবকিছুরই নিরাপত্তা দেওয়া হবে। কোনো যাজককে তার কাজ হতে, কোনো অফিসারকে তার চাকরি থেকে চাকরিচ্যুত করা হবে না।'[২]

শুধু তাই নয়, মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত কোনো অমুসলিম বহিঃশত্রুদের সাথে কোনো প্রকার যুদ্ধে অংশ নিতেও বাধ্য নয়। বাইরের কোনো শত্রু যদি মুসলিমরাষ্ট্র আক্রমণ করে, তাহলে মুসলিমরাই তাদের প্রতিহত করবে। সেই মুসলিমরাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমরা কোনো ধরনের যুদ্ধে যেতে বাধ্য নয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'অমুসলিমরা কি এমনিতেই সুফল ভোগ করবে কোনোরকম ত্যাগ ছাড়াই?'

সাজিদ বলল, 'না। অমুসলিমদের হয়ে মুসলিমরা সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ সামলাবে ঠিক, তবে অমুসলিমদেরও কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সেটি হলো অমুসলিমরা এর পরিবর্তে সামান্য ট্যাক্স দেবে কেবল।'

আমি বললাম, 'ও আচ্ছা। যেটিকে জিজিয়া কর বলা হয়, তাই না?'

---

১ *কানযুল আমাল,* খণ্ড : ০৪; পৃষ্ঠা : ৪৫৫

২ *তাবাকাত ইবনু সাদ,* খণ্ড : ০১; পৃষ্ঠা : ২২৮

'ঠিক ধরেছিস। এটার নাম জিজিয়া কর। তবে ইসলামী আইনশাস্ত্রে বলা আছে, গরিব, বৃদ্ধ এবং অসমর্থলোক এই জিজিয়া কর প্রদানের বিধানমুক্ত। শুধু তাই নয়, ইসলামী রাষ্ট্রের রাজকোষ 'বায়তুল মাল' থেকে রাষ্ট্রের গরিব, দুঃস্থ, অসহায় অমুসলিমদের অর্থ প্রদান করে সহায়তারও বিধান রয়েছে ইসলামী আইনে।'[১]

আমাদের সামনে বসে থাকা ভদ্রলোকের চেহারায় হাসির আমেজ দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে তিনি তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। ইসলাম যে অমুসলিমদের সাথে কোনো অন্যায় করে না, তাদের অধিকার দানে যে কোনো কারচুপি করে না, সেটি হয়তো তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন। লোকটির সাথে আমাদের আরও আলাপ হলো। জানতে পারলাম তার নাম মুহাম্মদ আজহার উদ্দীন। একটি বেসরকারী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে আছেন। রাজশাহীতে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরছিলেন।

ট্রেন থেকে নামার আগে ভদ্রলোক আমাদের হাতে তার অফিসের কার্ড দিয়ে বললেন, 'বয়েজ, সময় করে আমার অফিস থেকে কফি খেয়ে যেয়ো।'

আমি তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে বললাম, 'জি আচ্ছা।'

আমার উত্তর শুনে তিনি বললেন, 'তোমার আবার কফিতে এলার্জি নেই তো আরিফ?'

এটা বলে ভদ্রলোক হা-হা-হা করে হাসলেন। আমি খুব লজ্জা পেলাম। সাজিদের দিকে তাকালাম। সেও মুচকি হাসছে।

---

১ *কিতাব আল-খিরাজ,* ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা : ১৫৫

কুরআনে বৈপরীত্যের সত্যাসত্য

সকালবেলায় ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকায় একটি চক্কর না দিলে আমার চলে না। পুরো পার্কটি একবার ঘুরে আসা চাই। যদিও পার্ক এলাকাটিতে যুবকদের তুলনায় বয়স্কদের আনাগোনাই বেশি।

এখানে এসে এই বয়স্ক লোকগুলোর চেহারা দেখতে আমার খুবই ভালো লাগে। আমি এদের দেখি। এই যে লোকগুলো, এরা আজ থেকে বিশ বছর আগে কেমন ছিল? টগবগে তরুণ। তাদের গায়ে তখন যৌবনের উন্মত্ততা। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা হয়তো এদের গর্জন আর হুংকারে প্রতিনিয়ত প্রকম্পিত হতো। শার্টের কলার খোলা রেখেই এরা ঢুকত আর বের হতো। এরা চাইলেই ক্লাস হতো নয়ত হতো না।

এরা মিছিল করত, মিটিং করত। এদের কেউ হয়তো-বা ছিল পাক্কা রাজনীতিবিদ। মোদ্দাকথা, এদের শিরদাঁড়া তখন তালগাছের মতো খাড়া ছিল। বুক ফুলিয়ে হাঁটত এরা ক্যাম্পাসজুড়ে।

কিন্তু নিয়তির কী নির্মম পরিহাস! ঠিক বিশ বছর পরে এসে এদের তালগাছের মতো খাড়া-শিরদাঁড়া নুয়েপড়া কলাগাছের মতো ঝুঁকে গেছে। যে তারুণ্য নিয়ে অহংকারে মাটিতে তাদের পা পড়ত না, আজ তা অতীত। যে শরীর নিয়ে তাদের অহংকারের অন্ত ছিল না, তা আজ নেতিয়ে পড়েছে। যাদের পায়ের শব্দে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা গমগম করত, আজকে তারা দু-মিনিট হাঁটতেই হাঁপিয়ে উঠছে! এই দৃশ্যগুলো থেকে মানুষের অনেককিছু শেখার আছে। বোঝার আছে।

বেলা বাড়তেই ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকাটি সরগরম হয়ে ওঠে। চারদিকে বাড়তে থাকে মানুষের কোলাহল। বাদাম-বিক্রেতা, আইসক্রিম-বিক্রেতারা তাদের মালপত্র নিয়ে হাজির হয়। পাশেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রছাত্রীদের আগমনে পুরো এলাকাটি আরও মুখরিত হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে বড় কথা, বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় যে জায়গাটিকে, সেই বাংলাবাজার এলাকা তো ভিক্টোরিয়ার ঠিক পাশেই। কত কবি, সাহিত্যিক, লেখক, গল্পকার, রাজনীতিবিদ, কলা-কুশলী রোজ এই পথ মাড়িয়ে যায়, তার ইয়ত্তা নেই। তবু ভিক্টোরিয়া তার মতোই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

আজ আমার সাথে সাজিদও আছে। তার হাতে একটি বই। ড্যান ব্রাউনের লেখা *অ্যাঞ্জেলস এন্ড ডেমনস*।

বিখ্যাত ডিটেক্টিভ ক্যারেক্টার 'রবার্ট ল্যাঙডন'-এর স্রষ্টা ড্যান ব্রাউনের নাম শোনেনি—এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়াই এখন দুষ্কর বলতে গেলে। পার্কের পশ্চিম দিকটায় এসে সাজিদ বসে পড়ল। বই পড়বে। মঈনুল নামে আমার এক বন্ধু আছে। ভালো কবিতা লিখত একসময়ে। একবার একটি কবিতা লিখে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল। সেই কবিতার সবটা আমার মনে নেই, তবে দু-লাইন মনে করতে পারি অবশ্য। লাইন-দুটো ছিল এরকম—

'একদিন লাশেরা চিৎকার করে উঠবে
চিহ্নিত হবে খুনীদের চেহারা ...'

এই কবিতা লিখে মঈনুল তখন রাতারাতি ক্যাম্পাসে 'কবি' বনে যায়। এরপর থেকে দৈনিক পত্রিকাগুলো নিয়ম করে ওর কবিতা ছাপাতে শুরু করে। পত্রিকায় কবিতা ছাপা হওয়াতে আমাদের মঈনুল তখন 'ক্যাম্পাসের কবি'র বদলে 'দেশের কবি' খেতাবে উন্নীত হয়ে যায়।

মঈনুলের একটি কবিতা পত্রিকায় ছাপা হতো, আর আমরা সবাই মিলে মিন্টু দার দোকানে গিয়ে ফুচকা খেয়ে ওর পকেট সাবাড় করতাম। বেচারা কবিতা লিখে টুকটাক যা কিছু কামাই করে, দেখা যেত তার সবটাই আমাদের পেটে ঢুকে পড়ত।

মঈনুলের সাথে খুব একটা যোগাযোগ হয় না আজকাল। দুনিয়ার ঘূর্ণাবর্তে আমরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। নিয়মের এই বেড়াজালে বন্দি হয়ে পড়লে সম্পর্কগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারাটা অনেক কঠিন হয়ে ওঠে। বন্ধু প্রতীমের কাছে জানতে পারলাম, মঈনুল এখন নাকি কবিতাচর্চা ছেড়ে নাস্তিকতা-চর্চায় বিভোর হয়েছে। শুনে কিছুটা মর্মাহত হলাম। নটরডেমে আমরা একসাথে পড়েছি। ভালো ধার্মিক ছিল সে। নিয়মিত নামাজ-কালাম পড়ত। ওর বাবা ছিলেন মৌলবী। ছোটবেলায় পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষা যে পায়নি, তাও বলা যাচ্ছে না।

ভিক্টোরিয়া পার্কে সেদিন সকালবেলা চতুর্থ চক্করটা দিতে যাব ঠিক তখন দেখলাম, উত্তর-পূর্ব দিক থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে মঈনুল আসছে। দেখতে অনেক নাদুস-নুদুস হয়েছে অবশ্য। ভুঁড়িও বেড়েছে অনেকটা। হালকা পাতলা ধরনের একটি বাদামী টি-শার্ট গায়ে থাকায় তার ভুঁড়িটা সামনের দিকে আরও হেলে এসেছে।

কাছাকাছি আসতেই মঈনুল আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কীরে ভ্যাবলা! কেমন আছিস?'

মঈনুল কলেজ-লাইফ থেকেই আমাকে 'ভ্যাবলা' বলে ডাকে। আমার চেহারা নাকি দেখতে ভ্যাবলা টাইপের, তাই। নিজেকে 'ভ্যাবলা' ভাবতেই আমার গা ঘিনঘিন করত; কিন্তু মঈনুলকে কিছু বলতেও পারতাম না। কারণ, মঈনুল ছিল আমাদের ক্লাসে অঙ্কের বস। এমন কোনো অঙ্ক ছিল না, যা সে পারত না। দু-দুবার সে গণিত অলিম্পিয়াডে প্রথম হয়েছিল।

'ভালো আছি, তুই কেমন আছিস?'

'ভালো। অনেকদিন পরে। থাকিস কোথায়?'

'কাছাকাছিই। তুই?'

'আমিও এদিকে থাকছি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কবিতা লিখিস আজকাল?'

মঈনুল কিছু না বলে হাঁপাচ্ছে। আমি আবার বললাম, 'শুনলাম, তুই নাকি বিগড়ে গিয়েছিস?'

মঈনুল আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল। আমি কী বলতে চাচ্ছি সেটা মনে হয় সে বুঝতে পেরেছে। চোখমুখ শক্ত করে বলল, 'সত্য জানতে চাওয়া মানে কি বিগড়ে যাওয়া?'

আমি বুঝতে পারলাম মঈনুল খুব সিরিয়াস মুডে আছে। এই মুহূর্তে তাকে পাল্টা উত্তর দিয়ে কাবু করে ফেলার ইচ্ছে আমার নেই। হাঁটতে হাঁটতে আমরা তখন পার্কের পশ্চিম দিকটায় চলে এসেছি। সাজিদ তখনো বই পড়ছে। আমি এসে সাজিদের সাথে মঈনুলের পরিচয় করিয়ে দিলাম। সাজিদের একটি গুণ এই, সে অপরিচিত কারও সাথে মুহূর্তেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

প্রাথমিক পরিচয়-পর্ব সেরে আমি আর মঈনুল সাজিদের পাশে বসে পড়লাম। দুজনেই হাঁপাচ্ছি। মঈনুল মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। সাজিদ তার ব্যাগে থাকা পানির বোতলটি মঈনুলের দিকে বাড়িয়ে দেয়। মঈনুল হাত বাড়িয়ে বোতলটি নিয়েই ঢকঢক করে বোতলের অর্ধেক পানি পেটের ভেতরে চালান করে দেয়। এরপর সে বোতলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নে, পানি খা।'

পানি পান করে শার্টের হাতায় মুখ মুছে নিয়ে বললাম, 'তা তোর বিগড়ে যাওয়ার রহস্যটা কীরে, মোটকু?'

মঈনুল দাঁতমুখ খিঁচে আমার দিকে তাকাল। তাকে তখন আলিফ লায়লার কান খাড়া করা পিশাচের মতো দেখাচ্ছিল। আমি বললাম, 'সরি! সরি! আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম, তোর এই পরিবর্তনের কারণ কী?'

আমার কথা বেশ গায়ে লাগল তার। ভারী মুখ নিয়েই বলল, 'পড়াশোনা কর, জানতে পারবি...'

'তুই পড়াশোনা করেই এরকম বিগড়ে গিয়েছিস? মাই গুডনেস।'

আমাদের এই ঝগড়া বেশিদূর আগাতে দিল না সাজিদ। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী নিয়ে তর্ক করছিস তোরা?'

মঈনুলের দিক থেকে কঠিন দৃষ্টি ফিরিয়ে আমি সাজিদের দিকে তাকালাম। বললাম, 'মঈনুল নাকি নাস্তিক হয়ে পড়েছে। আমাদের ধর্ম নিয়ে সে নাকি এত বেশি পড়াশোনা করে ফেলেছে যে, সে আস্ত একটা অশ্বডিম্ব হয়ে বসে আছে।'

আমার কথায় বেশ রাগ ঝরছে দেখে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল সাজিদ। বলল, 'একজন লোক তো চাইলে অনেক বেশি পড়াশোনা করতে পারে। সেটি ধর্ম নিয়ে হোক বা অন্যকিছু।'

'তাই বলে নাস্তিক হয়ে যেতে হবে?' আমার প্রশ্ন।

'সেটি তো তোর মর্জিমাফিক হবে না। কে আস্তিক থাকবে আর কে নাস্তিক থাকবে ব্যাপারটি তো আমি আর তুই ঠিক করব না, তাই না?

এমনিতেই প্রচণ্ড রেগে আছি। তার ওপর সাজিদের এমন দরদমার্কা কথা শুনে আমার তো একেবারে গা জ্বলে যাওয়ার মতো অবস্থা।

আমাকে দুচার-কথা শুনিয়ে এবার সে মঈনুলের দিকে ফিরে খুব শান্ত গলায় বলল, 'মঈনুল ভাই, আরিফের কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না। সে আসলে অল্পতেই রেগে যায়। অস্থির স্বভাবের; কিন্তু বন্ধু হিশেবে সে যথেষ্টই ভালো মনের মানুষ।'

সাজিদের কথা শুনে আমার রাগের মাত্রা যেন আরও বেড়ে গেল। গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালা হচ্ছে! খেয়াল করলাম মঈনুলের মুখ থেকে রাগের আভাটুকু সরে গেছে। সাজিদের কথাগুলো সে হয়তো পছন্দ করেছে। তাই বলল, 'না, কী মনে করব? ও আর আমি তো কলেজ-লাইফ থেকেই এরকম খুনসুটি করতাম। এগুলো আমাদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার।'

সাজিদ হেসে বলল, 'বাহ। তাহলে তো আর কোনো ঝামেলাই নেই। তা, কোন ডিপার্টমেন্টে আছেন?'

মঈনুল বলল, 'ম্যাথমেটিক্স।'

'খুব ভালো। আপনার কথা আরিফের কাছে আগে কখনোই শুনিনি। আজকে পরিচয় হয়ে খুব ভালো লাগল।'

মঈনুল ইতস্তত করে বলল, 'আমরা তো একই বয়সের বলা চলে। আমাদের মধ্যে 'আপনি' সম্বোধনটা না থাকলেই ভালো হবে বলে মনে হচ্ছে।'

মঈনুলের কথায় সায় দিয়ে সাজিদ বলল, 'ঠিক আছে।' ঠিক আছে বলার পরে সাজিদ পুনরায় প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, যদি কিছু মনে না করো আমি কি তোমাকে

একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'অবশ্যই অবশ্যই' বলল মঈনুল।

'আরিফ একটু আগে বলল, তুমি নাকি নাস্তিক হয়ে গেছ। আমি অবশ্য জানতে চাইব না যে, কেন তুমি নাস্তিক হয়ে গেছ। আমি শুধু এটুকু জানতে চাচ্ছি, কোন জিনিসটা তোমাকে নাস্তিক হতে অনুপ্রাণিত করেছে?'

'আমি কুরআন নিয়ে পড়াশোনা করেছি। পড়াশোনা করে বুঝতে পেরেছি যে, এটা কখনোই স্রষ্টার বাণী হতে পারে না। স্রষ্টাকে যদি আমরা আউট অব মিসটেক হিশেবে ধরে নিই, তাহলে স্রষ্টার বাণীর মধ্যে কোনোরকম অসামঞ্জস্য কিংবা বৈপরীত্য থাকতে পারে না; কিন্তু কুরআনে এরকম অসামঞ্জস্য, বৈপরীত্য রয়েছে।'—বলল মঈনুল

আমি ধৈর্য ধরে চুপ করে আছি। সাজিদ হাসিমুখে বলল, 'বুঝতে পেরেছি তোমার কথা। আচ্ছা, তুমি কুরআন নিয়ে কোথায় বা কার কাছে পড়াশোনা করেছ?'

চুপ করে আছে মঈনুল। কুরআন নিয়ে কোথায় বা কার কাছে পড়েছে সে তার কোনো উত্তর দিতে পারল না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সাজিদ আবার বলল, 'আচ্ছা, বাদ দাও সেটা। তুমি বললে যে কুরআনে অসামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছ। দয়া করে আমাকে একটু বলবে কি, সেগুলো কীরকম? আমিও আসলে কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করি। এজন্যেই জানতে চাইছি।'

মঈনুল কিছুটা সময় নিল। এরপর বলতে লাগল, 'যেমন ধরো, কুরআনের এক জায়গায় বলা হচ্ছে আল্লাহর একদিন হলো একহাজার বছরের সমান। আবার অন্য জায়গায় বলা হচ্ছে আল্লাহর একদিন হলো পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। ব্যাপারটি কি পরস্পরবিরোধী নয়? এখান থেকে আমরা কোনটা বুঝব? আল্লাহর একদিন মানে দুনিয়ার একহাজার বছর নাকি পঞ্চাশ হাজার বছর?'

এবার আমি কথা বলে উঠলাম, 'কুরআনের কোন জায়গায় এই কথাগুলো বলা আছে রেফারেন্স দেখা। তুই নিজের মতো করে কথা বললে তো আর হবে না।'

সাজিদ বলল, 'আরিফ, মঈনুল কিন্তু ঠিকই বলেছে। কুরআনের এক জায়গায় বলা আছে আল্লাহ তাআলার একদিন, একহাজার বছরের সমান। আবার অন্য জায়গায়

বলা হয়েছে তার একদিন হলো পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।'

সাজিদের কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। মঈনুলের এই নাস্তিক্যধর্মী কথাকে সে ডিফেন্ড করল কি না বুঝতে পারলাম না। তাকে প্রশ্ন করলাম, 'কুরআনের কোথায় বলা হয়েছে এরকম কথা?'

সাজিদ উত্তর দিল, 'সূরা হজ, সাজদা এবং মাআরিজে।'

মঈনুল বেশ উৎফুল্ল গলায় বলল, 'রাইট রাইট। এই সূরাগুলোতেই আছে। আমি পড়েছিলাম; কিন্তু রেফারেন্সগুলো মনে নেই।'

সাজিদ মঈনুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু মঈনুল ভাই, অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এই ব্যাপারগুলোতে আমি তোমার সাথে মোটেও একমত নই।'

অবাক হলো মঈনুল। বলল, 'কেন?'

'আমার দৃষ্টিতে এই ব্যাপারগুলোতে আসলে কোনোরকম অসামঞ্জস্য বা বৈপরীত্য নেই।'

'কী অদ্ভুত!' বলল মঈনুল। 'স্পষ্টভাবে দু-জায়গায় দু-রকম ইনফরমেশান দেওয়া আছে। তারপরেও তুমি বলছ এখানে কোনোরকম বৈপরীত্য নেই?'

'হ্যাঁ। আমি আমার বিশ্বাসের জায়গা থেকে শক্তভাবেই বলছি, এই জায়গাগুলোতে বিন্দুমাত্র বৈপরীত্য নেই।'- সাজিদ বলল।

সকালের রোদ চড়ে বসতে শুরু করেছে। বেড়ে চলেছে কর্মমুখী মানুষের আনাগোনা। গাড়ির হর্ন আর মানুষের আওয়াজে এলাকাটি কোলাহলপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমরা পাশের একটি রেস্টুরেন্টে এসে বসলাম। চা-পরোটা অর্ডার করে সাজিদ আর মঈনুল আবারও তর্কে জড়িয়ে পড়ল। মঈনুল বলল, 'তার-মানে তুমি বলতে চাচ্ছ, এই আয়াতগুলো বৈপরীত্য নির্দেশ করে না, তাই তো?'

'হ্যাঁ'

'তোমার দাবির পক্ষে প্রমাণ কী?'

নড়েচড়ে বসে সাজিদ বলল, 'তোমার আপত্তির ব্যাপারটা আছে সূরা হজের ৪৭ নম্বর আয়াতে, সূরা সাজদার ৫ নম্বর আয়াতে এবং সূরা মাআরিজের ৪ নম্বর আয়াতে। প্রথম দুই আয়াত, অর্থাৎ সূরা হজ এবং সূরা সাজদার আয়াতে বলা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একদিন হলো একহাজার বছরের সমান। আবার, সূরা মাআরিজের আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহর একদিন হলো পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এখন, এই আয়াতগুলোতে সত্যি কোনো বৈপরীত্য আছে কি না—তা জানতে হলে একটি বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। তোমার হাতে কি সময় আছে শোনার জন্য?'

সম্মতি জানিয়ে মঈনুল বলল, 'অবশ্যই আছে।'

সাজিদ বলল, 'ঠিক আছে। ব্যাপারটি আমি দুইভাগে বোঝানোর চেষ্টা করব। প্রথমে আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে দলীল টেনে ব্যাখ্যা করব। এরপরে আয়াতগুলো দিয়েই আয়াতগুলোকে পর্যালোচনা করব। ব্যাখ্যায় যাওয়ার আগে আমরা কুরআনের সেই আয়াতগুলো দেখে নিই যেগুলো নিয়ে আজকের আলাপ।'

এতটুকু বলে সাজিদ তার ফোন থেকে কুরআনের এ্যাপস ওপেন করে সেখান থেকে সূরা হজের ৪৭ নম্বর আয়াতটি তিলাওয়াত এবং অর্থ পড়ে শোনাল আমাদের।

'তারা আপনাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি নিয়ে আসতে বলে (কিন্তু শাস্তি তো আসবে আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে); কেননা, আল্লাহ কক্ষনো তাঁর ওয়াদার খেলাফ করেন না। তোমার প্রতিপালকের একদিন হলো তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।'

এরপর সে তিলাওয়াত করল সূরা সাজদার ০৫ নম্বার আয়াত—

'তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সকল কার্য পরিচালনা করেন, অতঃপর সকল বিষয়াদি তাঁরই কাছে একদিন উত্থিত হবে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছর।'

এরপর সূরা মাআরিজের ০৪ নম্বর আয়াত—

'ফেরেশতা এবং রূহ (অর্থাৎ জিবরীল) আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।'

আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রথম আয়াত এবং দ্বিতীয় আয়াতে সময়কাল দেখানো হচ্ছে এক হাজার বছর করে; কিন্তু তৃতীয় আয়াতে সময়কাল দেখানো হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার বছর। তাহলে কোনটি সঠিক? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ১ দিন সমান ১০০০ বছর? নাকি ৫০,০০০ বছর? মূলত, আল্লাহর ১ দিন সমান ১০০০ বছর। এর পক্ষে হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিঃস্ব মুসলিমরা ধনীদের তুলনায় অর্ধেক দিন অর্থাৎ ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে।'[১]

'এখানে অর্ধেক দিন হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একদিনের অর্ধেক সময়। আর এই সময়টা কত? তা হলো ৫০০ বছর। অর্ধেক দিন যদি ৫০০ বছরের সমান হয়, তাহলে পুরো দিন সমান কত বছর হবে? সোজা অঙ্ক। পুরোদিন সমান এক হাজার বছর। অর্থাৎ আল্লাহর একদিন সমান বান্দাদের অর্থাৎ পৃথিবীর ১০০০ বছরের সমান।'

মঈনুল বলল, 'পঞ্চাশ হাজার বছরের সময়টা কোত্থেকে এলো তাহলে?'

'ভালো প্রশ্ন। পঞ্চাশ হাজার বছরের সময়টা তাহলে কীভাবে এলো, তাই না? এই সময়টা আসলে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝের সময় নয়। এই সময়টা মূলত কিয়ামত দিবসের একটা সময়। এই আয়াতে 'পঞ্চাশ হাজার বছর' বলে যে সময়টা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি কিয়ামত দিবস-বিষয়ক। যাকাত প্রদান করে না এমন ব্যক্তির শাস্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তার (যে যাকাত দেয় না) শাস্তি চলতে থাকবে এমন একদিন পর্যন্ত—যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। তারপর তার ভাগ্য নির্ধারিত হবে হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।'[২]

এখান থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত দিন হলো কিয়ামতের দিন এবং উল্লিখিত সময় হলো ৫০,০০০ বছর, যা সূরা মাআরিজে উল্লিখিত আছে। তা ছাড়া, সূরা মুত্তাফফিফীন এর ৬ নম্বর আয়াত, যেখানে বলা হচ্ছে, 'যেদিন সৃষ্টিকুলের মানুষ দাঁড়াবে তাদের রবের সামনে', এটার ব্যাখ্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তা হবে এমন একদিনে, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। তারা তাদের কান পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে।'[৩]

---

১ *জামি তিরমিযী,* হাদীস : ২৩৫৩, ২৩৫৪

২ *সহীহ মুসলিম,* ৯৮৭, *মুসনাদে আহমদ,* ০২ / ৩৮৩

৩ *মুসনাদে আহমদ,* ০২ / ১১২

এখান থেকে দুইটি বিষয় পরিষ্কার।

এক. 'যেদিন সৃষ্টিকুলের মানুষ দাঁড়াবে তাদের রবের সামনে।' সেটি কোন দিন? কিয়ামতের দিন।

দুই. 'তা হবে এমন একদিন, যার পরিমাণ হবে ৫০,০০০ বছর।' সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে, কিয়ামত দিবসের সময়কাল সাধারণ সময়কালের চেয়ে দীর্ঘ। হাদীস এবং কুরআন থেকে এটি স্পষ্ট যে, সূরা মাআরিজে উল্লিখিত সময়কাল পৃথিবী এবং আল্লাহর মধ্যবর্তী সময়কাল নয়; বরং এটি কিয়ামত দিবসের সময়কাল। জেনারেল সেন্স থেকেও যদি আমরা বিচার করি, দুঃখ-কষ্টের সময়গুলো আসলেই কেমন যেন দীর্ঘ মনে হয় আমাদের কাছে। সময়গুলো যেন ফুরোতেই চায় না। কিয়ামত দিবসের চেয়ে ভয়াবহ সময় আর কী হতে পারে? তাই এই সময়কালটা দীর্ঘ হওয়াই কিন্তু স্বাভাবিক।'

সাজিদ এক নিঃশ্বাসে বলে গেল কথাগুলো। এরপর সে থামল। আমাদের গরম-গরম চা-পরোটা চলে এসেছে। চায়ের মধ্যে পরোটা ডুবিয়ে মুখে দিতে দিতে সাজিদ আবারও বলতে শুরু করল, 'এরপর দ্বিতীয় ভাগে আসা যাক। আমরা আয়াতগুলো আবার খেয়াল করি।

সূরা হজের ৪৭ নম্বর আয়াত—

'তারা আপনাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি নিয়ে আসতে বলে (কিন্তু শাস্তি তো আসবে আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে); কেননা, আল্লাহ কক্ষনো তাঁর ওয়াদার খেলাফ করেন না। তোমার প্রতিপালকের একদিন হলো তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।'

সূরা সাজদার ৫ নম্বর আয়াত—

'তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত কার্য পরিচালনা করেন, অতঃপর সকল বিষয়াদি তাঁরই কাছে একদিন উত্থিত হবে, যার পরিমাপ তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছর।'

সূরা মাআরিজের ৪ নম্বর আয়াত—

'ফেরেশতা এবং রূহ (অর্থাৎ জিবরীল) আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।'

প্রথম আয়াত দুটো খেয়াল করো, মঈনুল ভাই। প্রথম আয়াতে একটি স্পেসেফিক কথা আছে। সেটি হলো, 'তোমার প্রতিপালকের একদিন হলো তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।'

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে, 'অতঃপর সকল বিষয়াদি তাঁরই কাছে একদিন উত্থিত হবে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছর।'

দুটি আয়াতেই একটি কমন জিনিস বলে দেওয়া হচ্ছে। সেটি হলো—'তোমার রবের একদিন তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।' কিন্তু তৃতীয় আয়াতে শুধু বলা হচ্ছে, 'ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।'

খেয়াল করো, আগের দুই আয়াতের মতো এই আয়াতে কিন্তু বলা হচ্ছে না যে, 'তোমাদের রবের একদিন তোমাদের গণনা অনুযায়ী এত বছর।' কেন এমনটা বলা হলো না? কারণ, এই হিশাবটা আগের আয়াতগুলোর মতো একই ঘটনার নয়, এ জন্য। আগের আয়াত দুটো ছিল আল্লাহ এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যকার সময়; কিন্তু পরের আয়াতে একটি আলাদা, নির্দিষ্ট দিক ইঙ্গিত করে। সেটি হলো, কিয়ামত দিবস।

সুতরাং আগের দুই আয়াতের এক হাজার বছরের সাথে পরের আয়াতের পঞ্চাশ হাজার বছর গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই। আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ।'

মঈনুল কিছু না বলে চুপ করে আছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সাজিদ বলতে লাগল, 'আরেকটি ব্যাপার খেয়াল করো। প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ যেখানে একহাজার বছরের কথা বলেছেন, সেখানে কিন্তু রূহ বা জিবরাঈল, কারও কথাই উল্লেখ নেই। শুধু মানুষ এবং আল্লাহর মধ্যবর্তী সময়সীমা নিয়ে বলা আছে; কিন্তু তিন নম্বর আয়াতে যেখানে পঞ্চাশ হাজার বছরের কথা এসেছে, সেখানে ফেরেস্তা এবং রূহের কথাও কিন্তু বলা হচ্ছে। আয়াতটির দিকে আরেকবার খেয়াল করো, 'ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন এক দিনে—যার পরিমাণ ৫০,০০০ বছর।'

এখান থেকে কী বোঝা গেল? এখান থেকে এটাই বোঝা গেল যে, দুই জায়গায় বক্তব্যের সাবজেক্ট কিন্তু আলাদা আলাদা। একটি জায়গায় মানুষকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, অন্য জায়গায় ফেরেশতাদের। যেখানে বক্তব্যের সাবজেক্ট-ই আলাদা হয়ে গেছে, সেখানে উল্লিখিত সময়কাল যে একই থাকবে, তা কী করে ধরে নিলে?'

সাজিদের এই কথাটা বুঝতে না পেরে মঈনুল বলল, 'বুঝিনি।'

'ঠিক আছে। আমি একটি উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করছি ব্যাপারটা।' - বলল সাজিদ। 'ধরো, তোমার বাসা থেকে স্কুলের দূরত্ব হলো আধা কিলোমিটার। এই দূরত্বটুকু হেঁটে যেতে তোমার সময় লাগে ১০ মিনিট। এখন তুমি বললে, 'বাসা থেকে স্কুলে যেতে আমার সময় লাগে ১০ মিনিট।'

মঈনুল মাথা নাড়ল।

'আরও ধরো, তোমাদের বাসা থেকে স্কুলে হেঁটে যেতে তোমার ছোটবোনের লাগে ২০ মিনিট। এখন সে যদি বলে, 'বাসা থেকে স্কুলে যেতে আমার সময় লাগে ২০ মিনিট, তাহলে তোমার কথা এবং তোমার বোনের কথার মধ্যে কি কোনো বৈপরীত্য আছে?'

'না', মঈনুল বলল।

'তোমার কথা এবং তোমার বোনের কথার মধ্যে যদি কোনো বৈপরীত্য না থাকে, তাহলে ওপরের আয়াতগুলোতেও কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ, তুমি আর তোমার বোন আলাদা আলাদা সাবজেক্ট। তোমার জন্য যেটা দশ মিনিটের, তোমার বোনের জন্য সেটি ২০ মিনিটের। তোমাদের উভয়ের বক্তব্যে না তুমি ভুল বলেছ, না তোমার বোন ভুল বলেছে। তোমরা দুজনেই দুজনের জায়গা থেকে ঠিক। কোনো বৈপরীত্য নেই এখানে। ঠিক একইভাবে, একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন তাঁর আর বান্দার মধ্যবর্তী সময়ের কথা বলছেন, তখন সে পিরিওড একরকম, আবার তিনি যখন কিয়ামত দিবসের কথা বলছেন, তখন সে পিরিওড অন্যরকম। দুই ক্ষেত্রে দুই রকম টাইম স্কেল হলেই যে সেটি বৈপরীত্য হয়ে যায়, তা কিন্তু নয়। কুরআনকে যারা সঠিকভাবে বুঝতে পারে না তাদের কাছেই কেবল এই আয়াতগুলো অসামঞ্জস্য বলে মনে হবে।'

মঈনুল কিছু না বলে চুপ করে আছে। সাজিদের ওপর এতক্ষণ অভিমান করে থাকলেও এখন আর সেটি নেই। আমার খুব করে মঈনুলকে আরেকবার জিজ্ঞেস করতে মন চাইছে—সে কোন কোন পণ্ডিতের কাছে কুরআন পড়েছে। কিন্তু না; এই মুহূর্তে তাকে আর অপমান করা ঠিক হবে না।

বনু কুরাইজা হত্যাকাণ্ড—ঘটনার পেছনের ঘটনা

শাবিরকে আমি সবসময় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। কারণ, আমাকে দেখলেই সে 'মোল্লা' বলে টিটকারি করে। আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করাটা তার কাছে আনন্দের ব্যাপার। 'তোর ধর্ম এমন-তেমন' বলে বলে আমাকে সে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। আরে বাপু, দু-চার লাইন পড়ে পণ্ডিত হয়েছিস ভালো কথা, প্যান প্যান করে অন্যের মাথা খেতে হবে কেন শুনি?

ইসলামের বিরুদ্ধে রয়েছে তার অসংখ্য অভিযোগ! এত অভিযোগ সম্ভবত মক্কার কুরাইশ নেতাদেরও ছিল না। সেদিন দোয়েল চত্বরে তার সাথে দেখা। দূর থেকে দেখেই আমি পাশ ফিরে গেলাম। বিরক্তিকর লোকগুলো সবসময়ই আমার আশপাশে ঘুরঘুর করতে থাকে। কী জ্বালা! শাবির ঠিক-ই আমাকে চিনে ফেলল। এসেই তার ফোকলা দাঁতগুলো বের করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছিস আরিফ?'

'ভালো।'

আমার উচিত সে কেমন আছে জিজ্ঞেস করা; কিন্তু এই ক্যাটাগরির লোকগুলোর সাথে যত কম কথা বলা যাবে, ততই উত্তম। সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কারও জন্য অপেক্ষা করছিস?'

'না'

'চল চা খাই?'

'না! আমার তাড়া আছে।'

'রোবটের মতো উত্তর দিচ্ছিস কেন?'

মন চাচ্ছে ওর সামনে থেকে দৌড়ে পালাতে। ওর প্রশ্নের এখনো যে আমি রোবোটিক গলায় উত্তর দিচ্ছি সেটিই তো ঢের আশ্চর্যের ব্যাপার! শাবির আমার হাত ধরে বলল, 'চল, চা খাব। কতদিন হয় তোর সাথে চা খাই না।'

চোখেমুখে মহাবিরক্তি নিয়ে আমি তার পাশে পাশে হাঁটতে শুরু করলাম। চেষ্টা করেও তার অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। শাবির বলল, 'তুই আমাকে খুব অপছন্দ করিস, তাই না?'

এই মুহূর্তে যদি তার মুখের ওপরেই বলতে পারতাম 'আমি তোকে এক্কেবারে অপছন্দ করি। তুই আর কোনোদিন আমার সাথে কথা বলবি না', তাহলে বেশ হতো; কিন্তু পৃথিবীতে মন চাইলেই সবকিছু করা বা বলা যায় না। আমিও বলতে পারলাম না। কেবল তার প্রশ্নের প্রতিউত্তরে নকল একটি হাসি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম—আমি তাকে আসলে অপছন্দ করি না।

আলম ভাইয়ের টং দোকানে এসে সামনে পেতে রাখা বেঞ্চিতে সে বসল। আলম ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ফোকলা দাঁতগুলো বের করে বলল, 'মামা, চা দাও দুই কাপ। আমারটায় চিনি কম দিবা, লিকার বেশি।'

রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে বাদাম-বিক্রেতা, চা-বিক্রেতা সবাইকেই ঢাকা শহরের লোকজন 'মামা' বলে ডাকে। কেবল আমিই একটু ভিন্ন। একটু কম বয়স হলে 'ভাইয়া' ডাকি, একটু বেশি বয়স হলে 'আঙ্কেল।' মামা ডাকি না কাউকেই। আলম ভাই আমাকে খুব ভালোভাবেই চেনেন। রোজ সকালে তার দোকান থেকেই চা খাই আমি আর সাজিদ। আলম ভাই আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটি হাসি দিলেন। শাবির ধমকের সুরে আমাকে বলল, 'আরে বস না ব্যাটা।'

আমি বসলাম ওর পাশে। ইয়া লম্বা লম্বা চুল তার। হাতে ব্রেসলেট, গায়ের কয়েক জায়গায় ট্যাটু করা। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সে বলল, 'জানিস, আমার বাবার একটি ব্যাপার না আমার খুব্বি ভালো লাগে। বাপ আমার উঠতে-বসতে ইয়াহিয়া খান আর ভুট্টোকে গালি দেয়। শোবার আগে গালি দেয়, শোয়া থেকে উঠে

গালি দেয়; অবস্থা দেখে মনে হয় এই দুই ইনসানকে গালি না দিলে আমার বাপের পেটের ভাত হজম-ই হয় না।'

মনে মনে বললাম, 'তোর বাপের গল্প শুনতে চেয়েছে কে-রে, নালায়েক!'

সে আবার বলল, 'কেন গালি দেয়, জানিস?'

'না।'

'কারণ, এই দুই লোক বাঙালিদের ওপরে ১৯৭১ সালে গণহত্যা চালিয়েছিল। হত্যা করেছিল হাজার হাজার মানুষ। এই কারণে বাবা এদের দুজনকে একদমই দেখতে পারে না। বলতে পারিস দুজন-ই বাবার চোখের বিষ।'

চুপ করে আছি আমি। সে অনর্গল কথা বলেই যাচ্ছে, 'কিন্তু আমার বাবা আবার খুবই ধার্মিক লোক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ-কালাম পড়ে। তার পিয়ারের পিয়ার নবীর জন্য তার যে কী দরদ! আহা!'

আমি জানতাম শাবির ঘুরে-ফিরে এই টপিকেই চলে আসবে। খাঁজকাটা কুমিরের গল্পের মতো-ই সে সবখানে ধর্মকে টেনে আনে। মহাত্মা গান্ধীর ছাগল চুরি হয়ে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে দিলে তারমধ্যেও সে ধর্মকে টেনে এনে একহাত নেওয়ার চেষ্টা করবেই করবে।

এরই মধ্যে আমার মোবাইলে কয়েকবার রিং হয়ে গেল। সাজিদের ফোন। আমার মোবাইল সাইলেন্ট থাকায় বুঝতে পারিনি। কল ব্যাক করতেই সাজিদ ওপ্রান্ত থেকে জানতে চাইল, 'কই আছিস?'

'আলম ভাইয়ের দোকানে। তোর ক্লাস কি শেষ?'

'হুম।'

'তাহলে চলে আয় এদিকে।'

'আচ্ছা' বলে সাজিদ ফোনটি রাখল।

সাজিদ সম্ভবত কাছাকাছিই ছিল। আসতে বেশিক্ষণ লাগল না ওর। তাকে দেখে আলম ভাই আবারও মিষ্টি একটি হাসি দিলেন। এই লোকের হাসিটি খুবই চমৎকার। পাকা কোনো ফটোগ্রাফারের চোখে পড়লে ফ্রেমবন্দি হয়ে যাবে নিশ্চিত।

সাজিদের জন্যও এককাপ চা অর্ডার করা হলো। সে এসে আমার পাশে বসল। শাবিরকে সে আগে থেকেই চেনে। কবিতা আবৃত্তিশালায় একসাথে ওরা কবিতা আবৃত্তি শিখত। তা ছাড়া, আমি আর শাবির সেইম ডিপার্টমেন্টেই পড়ি। সেই সুবাদে শাবিরকে নিয়ে অনেক গল্প করা হয়ে গেছে সাজিদের সাথে।

পৃথিবীতে মানুষ মানুষের কাছে তার ভালোলাগার মানুষদের গল্প করে। আর আমি গল্প করি আমার অপছন্দের মানুষগুলো নিয়ে। আমার অপছন্দের তালিকায় বাংলাদেশের কয়েকজন সেলিব্রেটি আছেন। আছেন আমাদের ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক আজমত স্যার, বাকি বিল্লাহ স্যারসহ অনেকে। শাবির সেই তালিকার একেবারে প্রথম দিকের একজন।

আমি শাবিরের একটি কথা বুঝতে পারিনি। তার বাবা নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ইয়াহিয়া-ভুট্টোকে গালাগাল দেয় তা বুঝলাম; কিন্তু এর সাথে তার বাবার ধার্মিক, নবী-প্রেমিক হবার কী সম্পর্ক?

খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাবিরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর বাবা ১৯৭১ এর ঘটনার জন্য ইয়াহিয়া-ভুট্টোকে গালাগালি করে, বুঝলাম; কিন্তু এর সাথে তার ধার্মিক বা নবী-প্রেমিক হবার কী হেতু?'

শাবির চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিতে দিতে বলল, 'ইয়াহিয়া-ভুট্টো ঠিক যে-দোষে বাবার গালি খায়, ইসলামের নবীও ঠিক একই দোষে দোষী; কিন্তু বাবা ইয়াহিয়া-ভুট্টোকে রোজ গালি দিলেও, ইসলামের নবীর জন্য তিনি একেবারে দিওয়ানা। আশেকে রাসূল। পিয়ারে রাসূল। একেই বলে অন্ধবিশ্বাস। ধর্মান্ধতা।'

সাজিদ শাবিরের দিকে তাকাল। সে তাকানোয় একধরনের বিস্ময় আছে। কোনো ছেলে তার বাবাকে নিয়ে এভাবে মন্তব্য করতে পারে দেখে সাজিদ হয়তো অবাক-ই হয়েছে। সাজিদ বলল, 'আমি ঠিক বুঝলাম না। তুই কী বোঝাতে চাচ্ছিস? ইয়াহিয়া-ভুট্টো-ইসলামের নবী... সব গুলিয়ে ফেলেছিস মনে হচ্ছে।'

ব্যাপারটি স্পষ্ট করার জন্য নড়েচড়ে বসল শাবির। বলল, 'সাজিদ, তুই তো ১৯৭১ সালের ঘটনা জানিস, তাই না?'

'হুম।'

'ইয়াহিয়া-ভুট্টো বাঙালিদের ওপরে যে-পাশবিকতা চালিয়েছিল, সেটিও নিশ্চয় জানিস?'

'হুম।'

'বাঙালির কি কোনো অপরাধ ছিল এতে?'

'না।'

'ঠিক একইভাবে বনু কুরাইজার ওপরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল তোদের নবী। অথচ বনু কুরাইজা গোষ্ঠীর কোনো অপরাধ ছিল না। অপরাধ কী ছিল জানিস?'

সাজিদ বলল, 'বল শুনি...।'

'বনু কুরাইজা গোষ্ঠীর অপরাধ ছিল মুহাম্মদকে যখন মক্কার কুরাইশরা স্বদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন মদীনার এই বনু কুরাইজাসহ অন্যান্য ইহুদী গোষ্ঠী মুহাম্মাদকে মদীনায় আশ্রয় দিয়েছিল।'

'এরপর?'

'বনু কুরাইজারা মুহাম্মদকে নেতা নির্ধারণ করেছিল।'

'তারপর?'

'বনু কুরাইজারা সংখ্যালঘু ছিল।'

শাবির থামল। চায়ে ফুঁ দিয়ে চুমুক দিল সাজিদ। এরপর বলল, 'আর কিছু?'

'এভাবে নিরপরাধ একটি জাতিকে উচ্ছেদ করা কোনো বিবেকবান লোক সহ্য করতে পারে?'

সাজিদ বলল, 'একদমই না। এটি একেবারে মেনে নেওয়া যায় না।'

হঠাৎ, পেছন থেকে এসে আমার কাঁধে হাত রাখল কেউ একজন। পাশ ঘুরতেই দেখলাম বিমল দা।

বিমল দা হচ্ছে আমাদের ডিবেট ক্লাবের সেক্রেটারি। তিনি খুবই ভালো মানুষ; কিন্তু একটাই দোষ। ধর্মবিরোধী। এজন্য বিমল দাকে আমি কিছুটা অপছন্দ করি। আমি কেন যেন ধর্মবিরোধী লোকগুলোকে একদম সহ্য করতে পারি না। এই যেমন শাবির, আমার ক্লাসমেট। অথচ ওর কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারলেই যেন বাঁচি; কিন্তু সাজিদের ওঠা-বসা, মেলামেশা সব এদের সাথেই। ওর কথা হচ্ছে, জগতের সবার মতামতকে শুনতে হয়, বুঝতে হয়। আমি বাপু এত মতামত শোনার পক্ষে না।

বিমল দা আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল—

'ইচ্ছে করে শালিক হতে নীল আকাশের কোলে
ইচ্ছে করে ধুলোয় লুটাই আমার মায়ের বোলে।
ইচ্ছে করে মেঘের দেশে বৃষ্টি হতে ফের-
যখন তখন হারিয়ে যাবার ইচ্ছে আমার ঢের!'

এটি আমার লেখা কবিতার একটি অংশ। বিমল দার মুখে এটি প্রায়ই শুনি। বিপ্লব দা এবং বিমল দা আমার কবিতার একনিষ্ঠ ভক্ত। কবিতার এই লাইনগুলো আবৃত্তি করে বিমল দা বলল, 'কী ব্যাপার! কবিদের সভা হচ্ছে নাকি এখানে? আমাকে ছাড়া টিএসসিতে কোনো কবিতার আড্ডা হতে দেওয়া চলবে না। এ জন্য আজকে হরতাল!!!'

তার কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আমাদের সাথে সাথে আলম ভাইও হেসে ফেললেন। বিমল দা খুবই মজার লোক। মানুষকে হাসাতে পারার এক অদ্ভুত ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে। শাবির বলল, 'না দাদা, এখানে কবিতার সভা হচ্ছে না, ধর্ম নিয়ে আলাপ হচ্ছে...।'

বিমল দা বলে উঠল, 'ওম শান্তি! ওম শান্তি!!'

বিমল দা এটি টিটকারি করে বলল নাকি মজা করে বলল ঠিক বুঝলাম না। বিমল দা আবার বলল, 'তা ধর্মের কোন অংশটি নিয়ে আলাপ হচ্ছে? রামের লঙ্কা জয়,

নাকি যিশু খ্রিস্টের মরেও বেঁচে যাওয়া? অথবা, মুহাম্মাদের ধর্মযুদ্ধ? কোনটা?'

আমি আর সাজিদ চুপ করে আছি। শাবির বলল, 'দাদা, ইসলামের নবী শান্তি প্রতিষ্ঠার নাম করে যে নিরপরাধ বনু কুরাইজা সম্প্রদায়কে হত্যা করেছিল, এটি নিয়েই বলছি...।'

'ও আচ্ছা। বনু কুরাইজা নিরপরাধ তো ছিলই, তাদের গোত্রের সকল পুরুষকেই হত্যা করেছিলেন দয়ার নবী। শুধু তা-ই না, বনু কুরাইজা সম্প্রদায়কে হত্যা করার আগে দয়ার নবীকে মদীনায় আশ্রয় দেওয়া আরও দুই ইহুদী সম্প্রদায় বনু কায়নুকা এবং বনু নাযীরকেও তিনি মদীনা থেকে বের করে দেন। অথচ, তিনি নাকি স্রষ্টার কাছ থেকে রহমতস্বরূপ এই ধরাধামে অবতরণ করেছেন। What an irony...!

না! আর চুপ করে থাকা যাচ্ছে না। দুজনের টিটকারি আর উপহাসে আমার গা ঘিনঘিন করছে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, সাজিদ আমাকে ইশারা করে চুপ করতে বলল। ইতোমধ্যেই বিমল দা তার হাতে থাকা চায়ের কাপে শেষ চুমুকটুকু দিয়ে সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়া খোলা আকাশে ফুঁ দিয়ে বিলীন করে দিতে দিতে বলল, 'কই, আলাপ কি থেমে গেল নাকি?'

বিমল দার কথা শুনে শাবির সাজিদের দিকে ফিরে বলল, 'সাজিদ, তোর কী মনে হয়, এগুলো মানবতাবিরোধী অপরাধ নয়?'

'অবশ্যই মানবতাবিরোধী অপরাধ', সাজিদের সরল স্বীকারোক্তি।

'এরপরেও কি বলবি তোদের নবী ঠিক কাজ করেছে?'

এবার সাজিদ চুপ করে গেল। বিমল দা বলল, 'He'll be back with his witty logics now, Ha-ha-ha...'

সাজিদ বিমল দার কথায় কর্ণপাত করল বলে মনে হলো না। সে শাবিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শাবির, দেখা যাচ্ছে তুই আমার মতামত শুনতে বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছিস। যদি ধৈর্য ধরে শোনার মতো অবস্থায় থাকিস, তাহলে আমি আমার মতামত তুলে ধরতে পারি।'

বিমল দা সিগারেটে শেষ-টান দিয়ে দূরে ছুড়ে মারল শেষ অংশটুকু। এরপর বিদ্রুপের সুরে বলল, 'শুধু শাবির কেন ব্রো? আমরাও তোমার বক্তব্য শোনার অপেক্ষায় আছি।'

শাবির বলল, 'অবশ্যই, আমরা শুনতে আগ্রহী।'

দুজনের আগ্রহ দেখে সাজিদ বলতে আরম্ভ করল, 'আচ্ছা বিমল দা, খুব সংক্ষেপে কিছু কথা বলব। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে।'

বিমল দা বলল, 'হুম।'

'ধরো, তুমি, আমি, আরিফ আর শাবির, আমরা চারজন মিলে একটি রাষ্ট্র গঠন করলাম।'

'হুম।'

'আরও ধরো, আমরা এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিশেবে তোমাকে নির্বাচিত করলাম। ঠিক আছে?'

বিমল দা মাথা নেড়ে বললেন, 'কিয়া বাত হ্যায়! আমি রাষ্ট্রপতিও হয়ে গেলাম? সে যা-ই হোক, ধরে নিলাম—আমি এখন রাষ্ট্রপতি। তারপর?'

সাজিদ বলল, 'এখন তুমি যেহেতু আমাদের ভূখণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক, তাহলে আমাদের করণীয় কী?'

বিমল দার উত্তর, 'তোদের করণীয় হচ্ছে, তোরা যেহেতু আমাকে নেতা নির্বাচন করেছিস, সেহেতু আমার সিদ্ধান্ত মেনে চলা। আমার তৈরি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা করা এবং তা মেনে চলা।'

'তোমার তৈরি আইন মানে?' সাজিদের প্রশ্ন।

'আমার তৈরি আইন মানে হচ্ছে রাষ্ট্রের তৈরি আইন।'

'ও আচ্ছা, সে আইনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কোনো ধারা থাকবে?' সাজিদের পাল্টা প্রশ্ন।

বিমল দার উত্তর, 'অবশ্যই থাকবে। থাকতে হবে।'

'কীরকম?'

'কেউ যখন যে-রাষ্ট্রে বাস করে সেই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের আইন ও সরকার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

'সেগুলো কেমন হতে পারে?'

বিমল দা ভাবতে লাগল। সাজিদ আবারও বলল, 'বিমল দা, তুমি চাইলে বাংলাদেশ সংবিধানের সাহায্য নিতে পারো।'

সাজিদের কথা শুনে হাসি দিল বিমল দা।। ঝটপট সমাধান পেয়ে হয়তো-বা খুশি হয়েছে। সাথে সাথেই গুগল সার্চ করে বিমল দা বাংলাদেশ সংবিধানের দণ্ডবিধির ধারাগুলো পড়া শুরু করল। দুবার আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে এবার রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিধান খুঁজে পেল। বিমল দা সরাসরি বাংলাদেশ সংবিধানের 'পেনাল কোড-১৮৬০' এর ১২১ ধারা থেকে পড়া শুরু করল : ১২১ ধারায় আছে, 'Whoever wages war against Bangladesh, or attempts to wage such war, or abets the waging of such war, shall be punished with death, or [imprisonment] for life, and shall also be liable to fine'

'অর্থাৎ বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারায় বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কেউ যদি যুদ্ধ পরিচালনা করে অথবা যুদ্ধ পরিচালনার চেষ্টা করে, নতুবা এরকম যুদ্ধ পরিচালনায় যদি অন্যপক্ষকে সাহায্যও করে, তাহলে সে (বা তারা) মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, সাথে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

১২১ ধারার (ক) নম্বর ধারায় আছে, 'Whoever within or without Bangladesh conspires to commit any of the offences punishable by section 121, or to deprive Bangladesh of the sovereignty of her territories or of any part thereof, or conspires to overawe, by means of criminal force or the show of criminal force, the Government, shall be punished with imprisonment for life] or with imprisonment of either description which may extend to ten years, and shall also be liable to fine'

অর্থাৎ 'কেউ বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে ১২১ ধারায় কোনো অপরাধের ষড়যন্ত্র করলে অথবা বাংলাদেশের বা বাংলাদেশের কোনো অংশের সার্বভৌমত্ব খর্ব করার ষড়যন্ত্র করলে অথবা অপরাধমূলক শক্তি প্রয়োগ বা প্রদর্শন করে বৈধ সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করলে তার শাস্তি হবে যাবজ্জীবন বা অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও।'

১২২ নম্বর ধারায় আছে, 'Whoever collects men, arms or ammunition or otherwise prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against Bangladesh, shall be punished with [imprisonment] for life or imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine'.

অর্থাৎ 'কেউ যদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সৈন্য, অস্ত্র, গোলাবারুদ সংগ্রহ করে, তাহলে সে (বা তারা) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।'

বিমল দার পড়া শেষ হলে সাজিদ বলল, 'তাহলে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য যে-শাস্তির কথা উল্লেখ আছে তা এরকম :

এক. কেউ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করলে বা করার চেষ্টা করলে বা (এরকম কাজে লিপ্ত বাইরের) কাউকে সাহায্যও করলে, তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন এবং অর্থদণ্ড।

দুই. বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং এর সরকারকে উচ্ছেদ কিংবা কোনো অংশের স্বাধীনতা খর্ব করার কোনো ষড়যন্ত্র কেউ করলে তার শাস্তি—যাবজ্জীবন বা অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

তিন. কেউ যদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সৈন্য, অস্ত্র, গোলা-বারুদ সংগ্রহ করে, তাহলে সে (বা তারা) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।'

বিমল দা মাথা নাড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ। এরকমই তো লেখা।'

এবার প্রশ্ন করল শাবির। সে বলল, ‘কিন্তু সাজিদ, তুই হঠাৎ এরকম আইন-আদালত নিয়ে বসলি কেন এখানে?’

‘আগে আমার কথা শেষ হোক’ বলে সাজিদ আবার বলতে আরম্ভ করল, ‘আচ্ছা বিমল দা, তুমি এখন আমাদের রাষ্ট্রপতি, ঠিক আছে?’

মাথা নাড়ল বিমল দা।

‘ধরো, যদি আমি এবং আরিফ তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্লট আঁকি? যদি আমরা তোমাকে মান্য করার, তোমার তৈরি সংবিধান মান্য করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েও তোমার বিরুদ্ধে, তোমার আইনের বিরুদ্ধে যাই? যদি তোমার শত্রুদের সাহায্য করি? অস্ত্র দিই? সৈন্য দিই? তাহলে তুমি তোমার সংবিধান-মতে আমাদের কী বিচার করবে?’

বিমল দা কিছুক্ষণ ভাবল। এরপর বলল, ‘হয়তো তোদের দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দেবো, নয়তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড...।’

‘এক্সাক্টলি! তুমি ঠিক এটাই করবে এবং রাষ্ট্রনেতা হিশেবে, সংবিধান-মতে, তোমার ঠিক এটাই করা উচিত।’ সাজিদ বলল। সে আরও বলতে লাগল, ‘এবার একই চিত্রপটে আরেকটি ঘটনায় আসো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তখন মদীনায় ইহুদী সম্প্রদায় ছিল তিনটি। বনু নাযীর, বনু কায়নুকা এবং বনু কুরাইজা। মদীনায় এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার নেতা হলেন এবং মদীনার ইহুদী সম্প্রদায়সহ অন্যান্য সম্প্রদায় নিয়ে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় সংবিধান তৈরি করলেন। সেই সংবিধানের নাম : মদীনা সনদ। এটুকু তো সবাই জানি, তাই না?’

‘হু’, বিমল দার সম্মতি।

‘সেই মদীনা সনদের অনেকগুলো ধারা ছিল। ধারাগুলোতে বলা ছিল : মদীনায় মুসলিম, ইহুদী এবং অন্যান্যরা পরস্পর সহাবস্থান করবে এবং কেউ মদীনা আক্রমণ করলে সবাই একযোগে যুদ্ধ করবে। মদীনার কেউ কখনোই কুরাইশদের সাহায্য-সহযোগিতা করবে না ইত্যাদি।’

‘হু।’

'এখন, সীরাত থেকে আমরা জানতে পারি, মদীনায় ইহুদী গোষ্ঠী বনু নাযীর এবং বনু কায়নুকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে প্লট আঁকে। তাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করে। কুরাইশদের সাথেও গোপনে যোগাযোগ রাখে, যা ছিল স্পষ্ট সনদবিরুদ্ধ। এমতাবস্থায়, এই দুই সম্প্রদায়কে মদীনা থেকে বহিষ্কার করলে কি তা সংবিধানবিরুদ্ধ হবে? আমাদের 'পেনাল কোড- ১৮৬০' অনুসারে এদের কী শাস্তি হওয়া উচিত?'

বিমল দা চুপ করে আছে। সাজিদ কেন এত লম্বা গল্প ফাঁদল এতক্ষণে বুঝলাম। বিমল দা যে বলেছিল, 'দয়ার নবী কেবল বনু কুরাইজা নয়, বনু নাযীর আর বনু কায়নুকা গোত্রও স্বদেশ ছাড়া করেছিল', এর জবাব দেওয়ার জন্যই সে এতদূর কাহিনি সাজিয়েছে।

সাজিদ আবার বলতে লাগল, 'আমাদের পেনাল কোড অনুযায়ী-ই তো এটি স্বতঃসিদ্ধ। তাহলে একজন রাষ্ট্রনায়ক হয়ে, মদীনার সর্বোচ্চ নেতা হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আইনের প্রয়োগ করে, তাতে কেন অসুবিধা হবে বিমল দা?'

কারও মুখে কোনো কথা নেই। বিমল দা একদম চুপসে গেছে। আলম ভাই চায়ের কেতলি চুলোয় তুলে দিচ্ছেন আর মুচকি মুচকি হাসছেন।

একটু থেমে সাজিদ এবার শাবিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এবার তোর পয়েন্টে আসি, শাবির। তুই বলতে চাস যে, বনু কুরাইজা গোত্র নিরপরাধ ছিল, তাই তো?'

'হ্যাঁ', শাবির বলল।

'তোর দাবির পক্ষে প্রমাণ আছে?'

শাবির বলল, *সীরাতে ইবনে ইসহাক*-এ বর্ণনা করা আছে, মুহাম্মদ যখন খন্দকের যুদ্ধের জন্য পরিখা খনন করে ঘরে এসে অস্ত্র ত্যাগ করে গোসলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই জিবরাঈল এসে তাকে কুরাইজা গোত্রের বিরুদ্ধে ফুসলিয়ে দেয়। ব্যস, মুহাম্মদ তার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে তাদের হত্যা করে আসে। অথচ, বনু কুরাইজা ছিল নিরপরাধ। একটি নিরপরাধ গোত্রের সকলকে নির্বিচারে হত্যা করে ফেলা কি অমানবিক নয়?'

সাজিদ একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, *সীরাতে ইবনে ইসহাক*-এর কত পৃষ্ঠায় এটি আছে?'

'৮২ পৃষ্ঠায়', শাবিরের উত্তর।

'তার মানে, তুই *সীরাতে ইবনে ইসহাক*-এর বর্ণনা টেনে প্রমাণ করতে চাইছিস যে, বনু কুরাইজা কোনো অপরাধ করেনি।'

'হ্যাঁ। *সীরাতে ইবনে ইসহাক*-এর এই বর্ণনাতে তাদের অপরাধের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। এটাই প্রমাণ করে বনু কুরাইজা গোষ্ঠী নিরপরাধ ছিল।'

সাজিদ বলল, 'তুই *সীরাতে ইবনে ইসহাক* পুরোপুরি পড়েছিস কখনো?'

এই প্রশ্ন শুনে বিমল দা, শাবির এবং আমি সাজিদের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালাম।

সাজিদ বলল, 'তুই *সীরাতে ইবনে ইসহাক*-এর ৮২ পৃষ্ঠার বর্ণনা টেনে প্রমাণ করতে চাইছিস যে, বনু কুরাইজা নিরপরাধ। অথচ *সীরাতে ইবনে ইসহাক*-এর ৮০ পৃষ্ঠাতেই আছে, 'And news came that the Jewish tribe of Banu Qurayza had broken their treaty with Muhammad'

অর্থাৎ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে খবর দেওয়ার আগেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খবর চলে আসে যে, বনু কুরাইজা গোত্র চুক্তিভঙ্গ করেছে। *সীরাতে ইবনে ইসহাক*-এর এই লাইনগুলো মনে হয় তোর চোখ এড়িয়ে গেছে, তাই না?'

সাজিদের কথা শুনে শাবির চুপ করে আছে। সাজিদ বলে যেতে লাগল, 'বনু কুরাইজা যে অপরাধী ছিল, তার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। *সহীহ বুখারী*-তে ইবনু উমারের বরাতে বলা হয়েছে, 'Bani An-Nadir and Bani Quraiza fought (against the Prophet violating their peace treaty), so the Prophet exiled Bani An-Nadir and allowed Bani Quraiza to remain at their places (in Medina) taking nothing from them till THEY FOUGHT AGAINST THE PROPHET AGAIN'[১]

১ *সহীহ বুখারী*, খণ্ড : ৫; হাদীস : ৩৬২

এখান থেকে স্পষ্ট যে, বনু কুরাইজা চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। সুনানু আবি দাউদে ইবনু উমারের বরাতে বলা হচ্ছে, 'The Jews Al Nadir and Quraizah fought with the Apostle of Allah, so the Apostle of Allah expelled Banu Al Nadir and allowed the Quraizah to stay and favored them. The Quraizah thereafter fought (with the Prophet).'[১]

এখান থেকেও স্পষ্ট যে, বনু কুরাইজা সম্প্রদায় নিরপরাধ ছিল না। তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল। তাহলে, তুই যে বলছিলি—নিরপরাধ বনু কুরাইজা-নিরপরাধ বনু কুরাইজা, এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। তারা নিরপরাধ ছিল না, অপরাধী ছিল। সংবিধান লঙ্ঘন করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো অপরাধ।

তাহলে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে গিয়ে, তাকে উৎখাত করে নিজেদের স্বায়ত্তশাসন চালু করতে বা অন্য কোনো শত্রুপক্ষকে বিজয়ী করতে যখন কেউ রাষ্ট্রদ্রোহ করে, পেনাল কোড- ১৮৬০ অনুযায়ী তার কী শাস্তি হওয়া উচিত?'

আমি বললাম, 'মৃত্যুদণ্ড...।'

'এক্সাক্টলি', সাজিদের জবাব।

এতক্ষণ পরে বিমল দা বলে উঠল, 'তা বুঝলাম; কিন্তু মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন দণ্ড দিলেও তো পারত, তাই না?'

সাজিদ হাসল। তারপরে বলল, 'মজার ব্যাপার হলো কী জানো, হত্যার এই নির্দেশ কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেননি।'

অদ্ভুত কিছু শুনলে মানুষ যেরকম চমকে ওঠে, আমিও সেরকম চমকে উঠলাম অনেকটা। চোখ বড় বড় করে সাজিদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। শাবির বলল, 'মানে কী? হত্যার নির্দেশ নবী মুহাম্মাদ না দিলে তাহলে দিল কে?'

---

১ *সুনানু আবি দাউদ*, ২২৯৯

সাজিদ বলল, 'বনু কুরাইজা সম্প্রদায়কে হত্যার নির্দেশ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেননি। দিয়েছিলেন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। বনু কুরাইজাদের সামনে অপশান রাখা হয়, তারা কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রায় মানবে, নাকি তাদের পূর্বসূরি, যিনি একসময় ইহুদী ছিলেন, সেই সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর রায় মানবে। ইহুদীরা সম্মিলিতভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বাছাই করেছিল এবং সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দেওয়া রায় অনুসারেই কিন্তু তাদের হত্যা করা হয়। তাদের হত্যার রায়টি আলটিমেটলি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে আসেনি।'

শাবির কাচুমাচু করে বলল, 'তবুও, এটি একটি অমানবিক কাজ।'

'কোনটি অমানবিক?' সাজিদের জিজ্ঞাসা।

'এভাবে একসাথে এতগুলো ইহুদী-হত্যার নির্দেশ দেওয়াটা।'

সাজিদ হেসে বলল, 'অমানবিক হবে কেন? এই আইন তো স্বয়ং ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের-ই আইন। তাদের ধর্মগ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে এই আইনের কথা উল্লেখ করা আছে।'

সাজিদের এই কথা শুনে এবার অবাক হলো বিমল দা। বলল, 'বুঝতে পারলাম না ঠিক।'

সাজিদ বলল, 'সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু কুরাইজাদের হত্যার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটি মূলত ইহুদী ধর্মগ্রন্থ *ওল্ড টেস্টামেন্টের* একটি আইন। চুক্তিভঙ্গের অপরাধের জন্য এরকম আইনের শাস্তির কথা *ওল্ড টেস্টামেন্টেই* উল্লেখ করা আছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কীরকম?'

সাজিদের প্রামাণ্য জবাব, '*ওল্ড টেস্টামেন্টের* Deuteronomy অধ্যায়ে আছে : 'Thou shalt smite every male thereof with the edge of the sword : But the women, and the little ones, and the cattle, and all that is in the city, even all the spoil thereof, shalt thou take unto thyself; and thou shalt eat the spoil of thine enemies, which the LORD thy God hath given thee'.[১]

---

১ Deuteronomy : 20-25

এখানে স্পষ্ট করেই বলা আছে, ‘চুক্তিভঙ্গের জন্য প্রত্যেক পুরুষকে হত্যা করো....।’ সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেদিন যেটি করেছিলেন, সেটি বাইবেলেরই আইন। তাহলে, ইহুদীদের আইন তো ইহুদীদের ওপরেই আরোপ করা হয়েছে। এতে তো কারও বিরোধ থাকার কথা না...।’

সবাই চুপ করে আছে। একটু পরে বিমল দা বলল, ‘কিন্তু, বনু কুরাইজার সকল পুরুষ হত্যা করা হলো, ব্যাপারটি কেমন না? একটি গোত্রের সকল পুরুষ তো আর অপরাধ করে না। এমন অনেক পুরুষ কি সেই গোত্রে ছিল না—যারা হয়তো যুদ্ধ করেনি বা যুদ্ধ করার মতো অবস্থায়ও ছিল না? তাহলে তাদেরও কেন হত্যা করা হলো?’

সাজিদ একটু থামল। এরপর বলল, ‘ওইদিন বনু কুরাইজার সকল পুরুষ হত্যা করা হয়নি; বরং সকল যোদ্ধা (যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম) হত্যা করা হয়েছিল। সেদিনকার ঘটনার বর্ণনায় যে-সকল হাদীস পাওয়া যায়, সবগুলোতে ‘রাজুল’ তথা ‘পুরুষ’ শব্দের পরিবর্তে ‘মোকাতেল’ তথা ‘যোদ্ধা’ শব্দ ব্যবহার করা হয়।

সহীহ বুখারী-তে ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর বরাতে বলা হয়েছে, ‘বনু কুরাইজার ঘটনার দিন তাদের কিছু লোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ক্ষমা করে দেন। পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করে।’ সুতরাং, সকল পুরুষ হত্যার যে মিথ্যা বর্ণনা আমরা শুনি, তা এই হাদীস দিয়ে বাতিল করে দেওয়া যায়। কারণ, সেদিন ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের মধ্যে অনেক নারী-পুরুষ থাকাটাই যুক্তিযুক্ত।’

সাজিদ থামল। আলম ভাই তার দিকে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিলে সে ঢকঢক করে পানিটুকু গলাধঃকরণ করল। এরপর আবার বলতে শুরু করল, ‘তাহলে, আমরা দেখলাম যে—

(১) বনু নাযীর এবং কায়নুকা সম্প্রদায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী। তাই তাদের রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা বেআইনি ছিল না; বরং আইনসিদ্ধ ছিল।

(২) বনু কুরাইজা সম্প্রদায় নিরপরাধ ছিল না। তারাও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী ছিল। তাদের অপরাধ প্রথমবার ক্ষমা করা হয়। তথাপি তারা তাদের অপরাধ থেকে সরে না এসে বারবার মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে, তাদের রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় আনা যুক্তিযুক্ত।

(৩) বনু কুরাইজার সকল পুরুষ নয়; বরং সকল যোদ্ধা হত্যা করা হয়েছিল।

(৪) হত্যার রায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন, দিয়েছিলেন ইহুদীদের একসময়কার সমগোত্রীয় নেতা সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

(৫) হত্যার রায় দেওয়া হয়েছিল ইহুদীদের ধর্মীয় বিধানমতেই। সুতরাং, এতে আপত্তি তোলার অবকাশ নেই।

(৬) কুরাইজা গোত্রের সকলকে হত্যা করা হয়নি। যারা ক্ষমা চেয়েছিল, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল।

এই ঘটনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, একটি রাষ্ট্রীয় সংবিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে বনু নাযীর, বনু কায়নুকা এবং বনু কুরাইজার সাথে হওয়া ঘটনাগুলো কোনোভাবেই অমানবিক নয়; বরং আইনসম্মত ছিল। এই আইন প্রয়োগ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরং একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব-ই পালন করেছিলেন।

সাজিদের কথা বলা শেষ হলে আমি শাবিরের মুখের দিকে তাকালাম। বললাম, 'ইশ! এতক্ষণ কী সুন্দর বাঙালি-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গুলিয়ে ফেলা গল্প শুনছিলাম। সাজিদ এসে সেগুলোকে ঠাকুরমার ঝুলি বানিয়ে দিল।'

আমার কথা শুনে আলম ভাই হা-হা-হা করে হেসে উঠল। এই লোকের হাসিটি খুবই চমৎকার। বাঁধাই করে রাখার মতো।

স্যাটানিক ভার্সেস ও শয়তানের ওপরে ঈমান আনার গল্প

রোববার আমাদের কাছে 'আড্ডাবার' বলে খ্যাত। রোববারে আমরা শাহবাগে বসে আড্ডা দিই। আমাদের আড্ডার বিষয়বস্তু থাকে সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন আবিষ্কার ও বিভিন্ন বই নিয়ে।

গত রোববারের আড্ডায় আমাদের সাথে পিকলু দা-ও ছিলেন। পিকলু দা হলেন আমাদের সবার কাছে প্রিয় ও পরিচিত মুখ। ক্যাম্পাসে পিকলু দাকে চেনে না—এমন মানুষ খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। কেনই-বা চিনবে না? যে-লোক জাপান, হংকং এবং কানাডা থেকে চার চারবার ফটোগ্রাফিতে গোল্ড মেডেল পায়, তাকে আবার চিনবে না—এমন কেউ থাকতে পারে নাকি?

আমরা পিকলু দাকে একজন উঁচু মাপের 'ফটোগ্রাফার' হিশেবে জানলেও, সাজিদের কাছে পিকলু দার কদর অন্য জায়গায়। সাজিদ পিকলু দাকে একজন উঁচু মানের বইপড়ুয়া হিশেবে চেনে। সাজিদের ভাষ্যমতে—পুরো পৃথিবী থেকে যদি তন্ন তন্ন করে খুঁজে সেরা দশজন বইপড়ুয়া লোক খুঁজে বের করা হয়, তাহলে পিকলু দার Rank সেখানে সেরা তিনে থাকবে, শিওর...।

পিকলু দার সাথে আমাদের চেয়ে সাজিদের সখ্যই বেশি। এর কারণ, ঢাবিতে ভর্তির পরে পুরো এক বছর সাজিদ আর পিকলু দা হলের একই রুমে ছিল। সাজিদের কাছে শুনেছি, একবার ঘোর বর্ষার সময়, পিকলু দা ঠিক করলেন যে, তিনি বান্দরবান যাবেন। চারদিকে করুণ অবস্থা। পানিতে টইটম্বুর সবকিছু। ভারী বজ্রপাতের সাথে বিরতিহীন

বৃষ্টির ফোয়ারা, এর মধ্যেই পিকলু দা চাচ্ছে ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে পড়তে। সাজিদ খুবই অবাক হলো। বলল, 'এরকম পরিস্থিতিতে কেউ কি বাইরে যায় নাকি?'

পিকলুদা কয়েক সেকেন্ডও সময় না নিয়ে বললেন, 'Without such environment, you can't enjoy adventure, my dear...'

সাজিদ দেখল, সেই যাত্রায় পিকলুদা ব্যাগের মধ্যে ক্যামেরার সাথে শেক্সপিয়ারের *A Mid Summer Night's Dream* এবং রবীন্দ্রনাথের *গোরা* উপন্যাসের বই দুটোও পুরে নিচ্ছে। সাজিদ আবারও অবাক হলো। বলল, 'বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে ভিজবে নাকি বই পড়বে?'

পিকলু দা সেবার কিছু না বলে মুচকি হেসে বেরিয়ে পড়ল। ফিরল ঠিক দশদিন পরে। জ্বরে কাঁপাকাঁপি অবস্থা। অন্য কেউ হলে এই মুহূর্তে বেহাল দশা হয়ে যেত। অথচ, পিকলুদার মুখে অসুখের কোনো চিহ্নই নেই। মনে হচ্ছে মনের মধ্যে রাজ্য জয়ের সুখ বিরাজ করছে।

সাজিদ জিজ্ঞাসা করল, 'কী অবস্থা করে এসেছ নিজের?'

পিকলু দা সাজিদের কথা কানে নিল বলে মনে হলো না। গোল্ডলিফ সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'জানিস তো, অনেকগুলো অসাধারণ ছবি তুলে এনেছি এবার। একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে গিয়েছিলাম। চারপাশে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। মনে হচ্ছিল বাংলাদেশ ক্রস করে কোনো এক পাহাড়ের দেশে ঢুকে পড়েছি।'

পরের দিন ক্যাম্পাসে পিকলু দা আমাদের অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বান্দরবানের দুর্গম এলাকা থেকে তুলে আনা ছবিগুলো দেখাচ্ছিলেন। আমরাও খুব আগ্রহভরে দেখছিলাম ছবিগুলো। আসলেই সব কয়টি ছবিই ছিল দারুণ। আমার সাধ্য থাকলে প্রতিটি ছবির জন্য পিকলু দাকে একটি করে গোল্ড মেডেল দিয়ে দিতাম।

আমরা সবাই ছবি দেখাদেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, সাজিদের সেদিকে মোটেও আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পরে সে পিকলু দার কাছে জানতে চাইল সাথে নিয়ে যাওয়া বইগুলোর ব্যাপারে। পিকলু দা ফিক করে হেসে দিলেন। এরপর, সাতখণ্ড রামায়ণ পাঠের মতো করে তিনি শেক্সপিয়ারের *A Mid*

Summer Night's Dream এবং রবি ঠাকুরের *গোরা* উপন্যাসের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করা শুরু করলেন। আমরাও আগ্রহভরে শুনছিলাম আর আবিষ্কার করছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পিকলু দাকে। যিনি কেবল ছবির মাঝেই ডুব দেন না, বইয়ের মাঝেও অসাধারণভাবে ডুব দিতে পারেন...।

বলছিলাম গত রোববারের আড্ডার কথা। সে আড্ডায় আমাদের সাথে পিকলু দা-ও ছিলেন। ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সোহেল রানা এবং সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সৌরভ ধর। আরও ছিলেন ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের আহমেদ ইমতিয়াজ এবং রসায়নের সুমন্ত বর্মণ দা। সুমন্ত দা খুব ভালো গিটার বাজাতে পারেন। তিনি যখন গিটারে তাল ধরেন, তখন সবাই সমস্বরে মান্না দার সেই বিখ্যাত গানটি গেয়ে ওঠে :

কাকে যেন ভালোবেসে, আঘাত পেয়েছে শেষে, পাগলা গারদে আছে রমা রায়
অমলটা ধুঁকছে দুরন্ত ক্যান্সারে, জীবন করেনি তাকে ক্ষমা হায়
কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই, আজ আর নেই...

আমাদের আড্ডা শুরুর প্রাক্কালে, সৌরভ পিকলু দার কাছে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, তুমি কি সালমান রুশদির *The Satanic Verses* পড়েছ?'

পিকলু দা 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নেড়ে জানালেন, তিনি পড়েছেন। এরপর সৌরভ সাজিদের কাছে জানতে চাইল, সে পড়েছে কি না। সাজিদও 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়ল। পিকলু দা সাজিদের কাছে জানতে চাইল, 'তোর কেমন লাগলরে বইটি?'

সাজিদ বাদাম ছুলে মুখে দিতে দিতে বলল, 'ফিকশনাল বই হিশেবে বলব নাকি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিশেবে বলব?'

পিকলু দা খানিকটা অবাক হলেন বলে মনে হলো। বললেন, 'মানে কী?'

'কিছুই না। ফিকশনাল বই হিশেবে বললে এটি মোটামুটি ভালো; কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে লেখা কোনো বই হিশেবে যদি বিচার করতে বলো তাহলে এটি পাস মার্ক পাবে বলে মনে হয় না।'

পিকলুদা আরও খানিকটা অবাক হলেন। বললেন, 'বইটাতে রুশদি যে ইনফরমেশান ব্যবহার করেছে, সে ব্যাপারে তোর কোনো আপত্তি আছে?'

সাজিদ বলল, 'আলবত আছে।'

'কিন্তু তুই কি জানিস, ওই বইতে রুশদি যে ইনফরমেশান ব্যবহার করেছে তার সবটাই ইসলামিক সোর্স থেকে নেওয়া?' পিকলুদা বললেন।

'হ্যাঁ, জানি।'

'তুই বলতে চাচ্ছিস এসব ইসলামিক সোর্সে ভুল ইনফরমেশান দেওয়া আছে?'

'থাকতেও পারে। দুনিয়ায় কুরআন ছাড়া সকল গ্রন্থ মানুষের লেখা। আর মানুষের লেখায় ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক।' সাজিদের সরল উত্তর।

এবার কথা বলে উঠল ইমতিয়াজ ভাই। তিনি বললেন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও। সালমান রুশদিকে তো চিনি এবং *The Satanic Verses* নামক তার বইটার নামও শুনেছি আমি; কিন্তু যেটি বুঝতে পারছি না সেটি হলো তোমাদের বিতর্কের বিষয়। তোমরা দুজনে *The Satanic Verses* নিয়ে বেশ ঝড়ো আলাপ করছ। মূল কাহিনিটা আসলে কী?'

পিকলুদা সাজিদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুই একটু ব্রিফ করে দে এ ব্যাপারে।'

পিকলু দার কথায় সাজিদ বলতে শুরু করল, 'ইন্ডিয়ান লেখক সালমান রুশদি একটি বই লিখে খুবই বিতর্কিত হয়ে পড়েন। বইটার নাম : *The Satanic Verses*। রুশদি সেই বইতে কিছু ইসলামিক সোর্স থেকে দলিল টেনে ইসলামকে আক্রমণ করে এবং প্রমাণের চেষ্টা করে যে—কুরআন আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হওয়া নয়; বরং শয়তান থেকে প্রাপ্ত কিতাব। রুশদি সোর্স হিশেবে উল্লেখ করে *আত-তাবারী* এবং *ইবনু সাদ*-এর মতো সীরাতগ্রন্থ।'

আত-তাবারী এবং *ইবনু সাদ*-এ একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ঘটনাটি হলো এরকম, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় যখন দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তখন একদিন তিনি কাবা শরীফের প্রাঙ্গণে বসে সদ্য ইসলামে দাখিল হওয়া মুসলিমদের মাঝে বক্তৃতা করছিলেন। সেখানে মক্কার অন্যান্য পৌত্তলিক কুরাইশরাও ছিল।

ঠিক এমন সময়ে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ওহী নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করেন। সেদিন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সূরা নাজম নিয়ে অবতীর্ণ হন। তাবারী এবং ইবনু সাদ বলছেন, সেদিন সূরা নাজমের ১৯ এবং ২০ নম্বর আয়াতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বাড়তি দুটি আয়াত তিলাওয়াত করেন, যা আদতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ওহী হিশেবে নিয়ে আসেননি। এই দুই আয়াত মূলত শয়তান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধোঁকা দিয়ে কুরআনের আয়াতের সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। পরে জিবরাঈল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে সতর্ক করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ওহী ছিল না বলে বাদ দেন।

সূরা নাজমের ১৯ এবং ২০ নম্বর আয়াত হলো মুশরিকদের পূজিত সবচেয়ে বড় তিন দেবী : লাত, উযযা এবং মানাতকে নিয়ে। ওই সূরার ১৯ এবং ২০ নম্বর আয়াত হলো, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্পর্কে?' 'এবং আরেক (দেবী) মানাত সম্পর্কে?'

তাবারী এবং ইবনু সাদ বলছেন, এই দুই আয়াতের পরে আরও দুটি বাড়তি আয়াত ছিল, যা পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল বুঝতে পেরে বাদ দিয়েছিলেন। সেই আয়াত দুটি এরকম—

'These are the high-flying ones, whose intercession is to be hoped for!'

['তারা হলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের ক্ষমতাবান দেবী। তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়...।']

তাহলে, তাবারী এবং ইবনু সাদের বর্ণনামতে, সূরা নাজমের ১৯ এবং ২০ নম্বর আয়াতের সাথে বাদ পড়া আয়াত দুটো জুড়ে দিলে কীরকম শোনায় দেখা যাক—

'তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্পর্কে?'

'এবং আরেক (দেবী) মানাত সম্পর্কে?'

'তারা হলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের (ক্ষমতাবান দেবী)'

'এবং তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়...'

ইবনু সাদ এবং তাবারীর দাবি, পরের দুই আয়াত শুনে মক্কার মুশরিকরা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারা ভাবল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার তাদের দেবীদের প্রশংসা করলেন। তার মানে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেবীদের প্রভু হিশেবে মেনে নিয়েছেন। তাই সেদিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য মুসলিমদের সাথে মক্কার মুশরিকরাও সিজদা করেছিল মক্কা প্রাঙ্গণে।

তাবারী এবং ইবনু সাদের এই রেফারেন্সগুলো পরে ইসলামবিদ্বেষী এবং খ্রিস্টান মিশনারিরা লুফে নেয়। তারা এই ঘটনাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য সূরা ইসরার ৭৩-৭৫ নম্বর আয়াত এবং সূরা হজের ৫২ নম্বর আয়াতকে রেফারেন্স হিশেবে দাখিল করে থাকে।

সাজিদের সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং শেষ হলে ইমতিয়াজ ভাই বললেন, ‘মারাত্মক ব্যাপার তো! রুশদি এই ইনফরমেশানগুলো কোথায় পেয়েছে? আত-তাবারী এবং ইবনু সাদের সীরাতে?’

‘হুম’ বলল সাজিদ।

পিকলু দা বললেন, ‘তো সাজিদ, তোর মতে রুশদি এখানে ভুল ইনফরমেশান দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, এই তো?’

‘হ্যাঁ’ সাজিদের উত্তর।

হাসল পিকলু দা। বলল, ‘আচ্ছা, ধরেই নিলাম যে, সালমান রুশদি ইসলামের কিছুই জানে না বা কিছুই বোঝে না; কিন্তু তুই কি বলতে চাইছিস ইবনু সাদ আর আল তাবারীর বর্ণনাও ভুল?’

সাজিদ হালকা দম নিয়ে বলল, ‘দাদা, আমি আগেও বলেছি, ইবনু সাদ হোক বা আত-তাবারী হোক বা অন্য যে-কেউ, তাদের কাছে তো আর ওহী আসত না। যেহেতু তাদের গ্রন্থগুলো আসমানী কিতাব নয়, তাই সেগুলোর মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি থাকতেই পারে। অস্বাভাবিক কিছু নয়।’

এতক্ষণ পরে সোহেল রানা ভাই মুখ খুললেন। বললেন, ‘আচ্ছা সাজিদ, ধরেই নিলাম তুমি ঠিক বলছ। ইবনু সাদ বা আত-তাবারীর বর্ণনা ভুল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তাদের বর্ণনা ভুল বা তোমার কাছে কেন তাদের বর্ণনাকে ভুল মনে হচ্ছে?’

এবার আমরা সবাই নড়েচড়ে বসলাম। এরই মধ্যে আড্ডায় চলে এসেছে পঙ্কজ দা, ইসলামিক স্ট্যাডিজের ইবরাহিম খলীল এবং ফিন্যান্সের শরীফ ভাই। সোহেল ভাইয়ের সাথে সুর মিলিয়ে সৌরভ বলল, 'Yes, explain, why you think renowned author both At Tabari & Ibn Saad are wrong according to u...'

ইতোমধ্যে আড্ডায় অনেকে এসে জমা হওয়াতে আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। আমরা সবাই অপেক্ষায় আছি সাজিদের উত্তরের জন্য। দেখার অপেক্ষা সাজিদ কীভাবে এই ক্রিটিক্যাল প্রশ্নের উত্তর দেয়। একটু ঝেড়ে কেশে নিয়ে সে বলতে শুরু করল, 'প্রথমে, আমাদের বুঝতে হবে, ইবনু সাদ এবং আত-তাবারীর গ্রন্থে যা আছে, তা মানুষের রচনা। এর মধ্যে যেমন শুদ্ধ জিনিস, শুদ্ধ বর্ণনা আছে, ঠিক তেমনই ভুল জিনিস, ভুল বর্ণনা থাকাটাও স্বাভাবিক। কারণ, ইবনু সাদ বা আত-তাবারী, কেউ-ই রাসূলের যুগের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন না। তারা রাসূলের জীবনী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে যেখানে, যার কাছে যা পেয়েছেন, তা-ই লিপিবদ্ধ করেছেন। ভুল-শুদ্ধ কতটুকু, তা নির্ণয়ের চেয়ে আপাতত সংরক্ষণ করাকেই তারা প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাদের রচনায়ও যে ভুল থাকতে পারে, তা তারা নিজেরাও স্বীকার করে গেছেন। আত-তাবারী তার কিতাবের শুরুতেই বলেছেন, 'Hence, if I mention in this book a report about some men of the past, which the reader of listener finds objectionable or worthy of censure because he can see no aspect of truth nor any factual substance therein, let him know that this is not to be attributed to us but to those who transmitted it to us and we have merely passed this on as it has been passed on to us.'

অর্থাৎ তিনি শুধু তা-ই কিতাবে স্থান দিয়েছেন, যা তার পর্যন্ত পৌঁছেছে। এখন কেউ যদি তার কিতাবে কোনো আপত্তিকর বিষয়াদি খুঁজে পায় যা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে সাংঘর্ষিক এবং অন্যান্য সহীহ সূত্রে তা বাতিলযোগ্য দেখা যায়, তাহলে সে-দায় আত তাবারীর নয়, তিনি যার কাছ থেকে পেয়েছেন, কেবলই তার। তিনি এখানে কেবল একজন 'লিখিয়ে'-এর ভূমিকায়। সুতরাং, আত-তাবারীর বর্ণনা যে ভুল 'হতেও' পারে, তা আত-তাবারীই বলে গেছেন। একই কথা, একই ব্যাপার ইবনু সাদ এর ক্ষেত্রেও।

এতটুকু বলে সাজিদ থামল। পিকলু দা বললেন, 'ভুল হতেও পারে মানে এটি প্রমাণিত হয় না যে, তিনি ভুল। ভুল হতেও পারে এর পরের শর্ত কিন্তু সঠিকও হতে পারে। আমরা তাহলে কোনটি ধরে নেব? তিনি ভুল না শুদ্ধ?'

সাজিদ হাসল। এরপরে বলল, 'দেখা যাক কী হয়...।' এরপর আবার বলতে শুরু করল, 'সকল ইতিহাসবিদদের মতে, সূরা নাজম নাযিল হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পঞ্চম বছরে, রজব মাসে, যে-বছর প্রথম একটি মুসলিম দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের আরও ৮ বছর আগে। এখন সালমান রুশদি এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের দাবি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়তান থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পরে আল্লাহ কুরআনের আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই ব্যাপারে সংশোধন করে দেন। তাদের দাবি হলো, সূরা হজের ৫২ নম্বর আয়াত নাকি সেদিনের ওই ঘটনা, অর্থাৎ স্যাটানিক ভার্সেস ঘটনার দিনের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে—'আমি তোমার পূর্বে যে-সব রাসূল কিংবা নবী পাঠিয়েছি, তাদের কেউ যখনই কোনো আকাঙ্ক্ষা করেছে তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় (প্রতিবন্ধকতা, সন্দেহ-সংশয়) নিক্ষেপ করেছে; কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা মুছে দেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ হিকমতওয়ালা।'

সালমান রুশদি এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের দাবি, এই আয়াত দিয়েই আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নাজমের সাথে মিশিয়ে ফেলা ওই আয়াত দুটো বাতিল করে দেন।

এতটুকু বলার পরে সাজিদ একটু থামল। এরপর আবার বলতে শুরু করল, 'শত্রুপক্ষ এই গল্প খুব চাতুরির সাথে বানিয়েছে বলা যায়; কিন্তু ঘাপলা রেখে গেছে অন্য জায়গায়। সেটি হলো, সূরা নাজম নাযিলের সাথে সূরা হজ নাযিলের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান। সূরা নাজম নাযিল হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির ৫ম বছরে, মক্কায়। সূরাটি মাক্কী সূরার অন্তর্গত। আর সূরা হজ নাযিল হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রায় ১২-১৩ বছর পরে, হিজরতের প্রথম বছরে। সূরাটি মাদানী সূরা।

অর্থাৎ তাদের কথানুযায়ী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল করেন নবুওয়াত প্রাপ্তির ৫ম বছরে, আর সূরা হজ নাযিল হয় নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৩ তম বছরে। দুই সূরার মধ্যে সময় ব্যবধান ৮ বছর।

অর্থাৎ তাদের দাবি অনুযায়ী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল করেছেন আজ, আর আল্লাহ তা সংশোধন করেছেন ৮ বছর পরে...!

সাজিদ জোরে বলতে লাগল, 'আচ্ছা বলুন তো, নেহাত পাগল ছাড়া এই গল্প কোনো মানুষ বিশ্বাস করবে? ভুল করেছে আজ আর তা সংশোধন হলো আরও ৮ বছর পরে। তাদের দাবি মানতে গেলে বলতে হয়, এই আট বছরের মধ্যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নাজমে লাত, উযযা, মানাতের মতো দেবীর প্রশংসা করেছেন আবার একইসাথে কালেমায় বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই।

একদিকে দেবীদের কাছে সাহায্য চাওয়ার বৈধতা, আবার অন্যদিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তাদের বাতিল করে দেওয়া—এতসব কাহিনি করার পরেও কীভাবে তিনি সেখানে 'আল আমীন' হিশেবে থাকতে পারেন? হাউ পসিবল?'

আমরা কেউ-ই কোনো কথা বললাম না। চুপ করে মনোযোগ দিয়ে সাজিদের কথাগুলো শুনে যাচ্ছি। সে আবারও বলতে আরম্ভ করল, 'ঠিক আছে। তর্কের খাতিরে ধরেই নিলাম যে, সূরা হজের সেই সংশোধনী আয়াত আল্লাহ তাআলা আট বছর পরে নয়, ওই রাতেই নাযিল করেছিলেন এবং ওই রাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ভুল শুধরে নিয়েছিলেন। ভুল শোধরানোর পরে ওই রাতেই ঘোষণা করলেন যে—লাত, উযযা, মানাতের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না।'

খেয়াল করুন, তিনি দিনে বলেছেন এরকম :

'তারা হলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের (ক্ষমতাবান দেবী)

'এবং তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়...।'

আবার রাতে নিজের ওই কথাকে পাল্টে নিয়ে বলছেন, 'লাত, উযযা, মানাতরা বাতিল। তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না।'

অবস্থা যদি সত্যিই এরকম হতো, তাহলে মক্কার কাফির, পৌত্তলিকদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি একজন ঠগ, প্রতারক ও বেঈমান বলে গণ্য হবার কথা ছিল না? অথচ, ইতিহাসের কোথাও কি তার বিন্দু-পরিমাণ প্রমাণ পাওয়া যায়? যায় না। যাদের সাথে তিনি মুহূর্তেই এতবড় বেঈমানি করলেন, তাদের কারও কাছেই তিনি 'ঠগ' 'প্রতারক' 'মিথ্যুক' সাব্যস্ত হলেন না। ব্যাপারটি খুব আশ্চর্যের নয় কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান-অপদস্ত করার এতবড় সুযোগটি কীভাবে তার শত্রুপক্ষ মিস করে বসল? তা ছাড়া, ইতিহাস থেকে জানা যায়, মদীনায় হিজরতের আগের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার ঘরে রেখে যান, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গচ্ছিত আমানত যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। ভাবুন তো, যিনি একদিনে দু-রকম কথা বলতে পারেন, তাকে কিন্তু তখনো মক্কার কুরাইশরা বিশ্বাস করছে, ভরসা করে আমানত গচ্ছিত রাখছে। কীভাবে? তিনি যদি সত্যিই এমন কাজ করে থাকেন, এরপরও মক্কার লোকজনের তার ওপরে এত অগাধ বিশ্বাস স্থাপনের কারণ কী ছিল? আদৌ কি সেদিন 'Satanic Verses' জাতীয় কিছু নাযিল হয়েছিল রাসূলের ওপর? উত্তর হলো—না।

সাজিদ ঘামতে শুরু করেছে; কিন্তু সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই। এতজনের সামনে এভাবে সে আগে কোনোদিন কথা বলেনি। এজন্যেই হয়তো একটু অসুবিধে হচ্ছে তার। সে আবার শুরু করল- 'দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, তর্কের খাতিরে যদিও ধরে নিই যে, 'Satanic Verses' সত্য, তাহলে চলুন, সূরা নাজমের আয়াতের সাথে ওই তথাকথিত শয়তানের আয়াতগুলো মিলিয়ে আমরা আরেকবার দেখে নিই :

[১৯] 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্পর্কে?'

[২০] 'এবং আরেক (দেবী) মানাত সম্পর্কে?'

[২১] 'তারা হলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের (ক্ষমতাবান দেবী)

[২২] 'এবং তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়'...

[২৩] 'এগুলো তো কেবল (এই যে লাত, উযযা, মানাত এসব) কতকগুলো নাম, যে নাম তোমরা আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা রেখেছ, এর পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তারা তো শুধু অনুমান আর প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে,

যদিও তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে।'

খেয়াল করুন, ২১ এবং ২২ নম্বর আয়াতের পরে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে কোনোরকম সংশোধনী আসার আগেই ঠিক ২৩ নম্বর আয়াতে এসে বলা হচ্ছে, 'এগুলো (লাত, উযযা, মানাত ইত্যাদি) তো কেবল কতগুলো নামমাত্র, যা তোমরা (মুশরিকরা) এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখেছ। এদের (ক্ষমতার) পক্ষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি।'

বড়ই আশ্চর্যের, তাই না? একটু আগে বলা হলো, তারা হলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের দেবী। তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়।' আবার, তার ঠিক পরেই বলা হচ্ছে, 'এগুলো তো কেবল কিছু নাম মাত্র, যা তোমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত।' What a double stand! এরকম ডিগবাজি দেওয়ার পরেও যারা একত্ববাদে বিশ্বাস রেখে নতুন ইসলামে এসেছে, তারা কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে তৎক্ষণাৎ চলে যেত না?

আর কুরাইশরা এত পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও এটি বুঝতে পারল না যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে মাইন্ড গেইম খেলছে?'

সাজিদ থামল। পঙ্কজ দা জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে, বলা হয় যে, আবিসিনিয়ায় হিজরত করা একটি দল এই ঘটনার কথা শুনে অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মুশরিকদের দেব-দেবীদের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘটনা শুনে ফেরত চলে এলো, তাদের ব্যাপারে কী বলবে?'

সাজিদ বলল, 'হ্যাঁ, তারা ফেরত এসেছিল ঠিকই; কিন্তু তারা ফেরত এসেছে এই ঘটনা শুনে নয়, অন্য ঘটনা শুনে। নবুওয়াতের ৫ম বছরে তৎকালীন আরবের অন্যতম বীর উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হামজা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে, মক্কার পরিস্থিতিকে কিছুটা নিরাপদ ভেবে, তারা ফেরত এসেছিল। তথাকথিত 'Satanic Verses' নাযিলের কথা শুনে নয়। প্রত্যেক সহীহ রেওয়ায়েতেই এটার বর্ণনা পাওয়া যায়।'

আমাদের কারও মুখে কোনো কথা নেই। সাজিদ পিকলু দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পিকলু দা?'

'হু।'

'আচ্ছা, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?'

'না।'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ।'

'বিশ্বাস করো যে, ঈশ্বর বলে কেউ নেই?'

'হুম, বিশ্বাস করি যে—ঈশ্বর বলে আদৌ কেউ নেই।'

'আচ্ছা, তুমি কি বিশ্বাস করো শয়তান বলে কেউ আছে, যাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, বোঝা যায় না?'

'আরে না! আমি অমন ফাও জিনিসে বিশ্বাস-টিশ্বাস করি না।'

'ঠিক বলছ তো?'

'হ্যাঁ।'

এবার সাজিদ হো-হো করে কিছুক্ষণ হাসল। এরপরে বলল, 'তাহলে কী করে তুমি সালমান রুশদির 'Satanic Verses' বিশ্বাস করছ যেখানে তুমি 'শয়তান' বলে কিছুতে বিশ্বাসই করো না? সালমান রুশদীকে বিশ্বাস করতে হলে তোমাকে আগে শয়তানের ওপরে ঈমান আনতে হবে। তারপরেই না 'Satanic Verses' (শয়তানের আয়াত) বিশ্বাস করা যাবে। হা-হা-হা-।'

এতক্ষণের নীরবতা ভেঙে সবাই এবার হাসিতে ফেটে পড়ল। অট্টহাসিতে ভরে উঠল আমাদের আড্ডাস্থল। মাগরিবের আযান হচ্ছে। পিকলু দা, পঙ্কজ দা আর সৌরভ উঠে চলে যাবার পথ ধরল। আমরা মসজিদের পথ ধরলাম।

দূরে পাখিরা আপনালয়ে ফিরে যাচ্ছে। আমি আর সাজিদ পাশাপাশি হাঁটছি। ভাবছি, ইশ! আজকের আড্ডাটি আরেকটু দীর্ঘ হলেও পারত...।

রাসূলের একাধিক বিবাহের নেপথ্যে

আমি আর সাজিদ বিশাল এক দালানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দালানের চারপাশ সুন্দর সব ফুলগাছে ভর্তি। একটি সাদা রঙের ফুলে আমার চোখ পড়ল। লাল রঙের টবে লিকলিকে এক লতা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সেই লিকলিকে লতার গায়ে সেনাপতির মতো শৌর্যবীর্য নিয়ে কিছু সাদা রঙের ফুল যেন তার বাড়ন্ত যৌবনের জানান দিচ্ছে। ফুলগুলোর কাছে গেলাম। এধরণের ফুল আগে কখনোই দেখিনি। অদ্ভুত এক নেশাজাগানিয়া সুবাস ছড়াচ্ছে তারা। সেই মাতাল করা গন্ধে মৌ মৌ করছে বাতাস।

যেই আমি ফুলগুলো ছুঁতে যাব, অমনি বিশালাকার গোঁফওয়ালা এক লোক কোত্থেকে যেন দৌড়ে এসে আমার সামনে হাজির। এই লোকের যে শুধু গোঁফই বিশাল তা নয়, শরীরের তুলনায় তার মাথাটাও বিশাল সাইজের। আস্ত একটা ফুটবলের সমান মাথা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটি আমায় বলল, 'ফুলগাছে হাত দেওয়া নিষেধ, জানেন না?'

তার প্রশ্ন শুনে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেলাম। আশপাশে ভালোভাবে তাকালাম। কোথাও কোনো সাইনবোর্ডে লেখা নেই যে, 'ফুল ছেঁড়া ও ফুলগাছে হাত দেওয়া নিষেধ'। ত্বরিতগতিতে চারদিকে একনজর তাকিয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞামূলক বাণীর সন্ধান না পেয়ে তার দিকে ফিরলাম। দেখলাম লোকটি তখনো আমার দিকে মারমুখী চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটোও স্বাভাবিকের তুলনায় বিশাল দেখাচ্ছে। মানুষ রেগে থাকলে যা হয় আর কি! কিন্তু এই লোক আমার ওপরে এত চটে বসার যথেষ্ট কোনো কারণ আমি খুঁজে পেলাম না। বললাম, 'ফুলগাছে হাত দিলে কী সমস্যা?'

আমার কথা শুনে তার চোখ দুটো যেন আরও বিশাল হয়ে উঠল। নাকটাও ফুলে উঠছে ক্রমশ। বুঝতে পারছি, লোকটি এখনো রাগের সর্বশেষ ধাপে পৌঁছায়নি। ওই ধাপে গেলে তার চেহারার কী-যে অবস্থা হবে, কে জানে। খুব ইচ্ছে করছিল তার রাগের সর্বশেষ পারদ দেখে যাওয়ার। কোনো এক গল্পে পড়েছিলাম, একবার এক ব্যাঙ নিজেকে ফুলাতে ফুলাতে একসময় পটাশ করে ফেটে গিয়েছিল। এই লোকের ক্ষেত্রে সে রকম ঘটার সম্ভাবনা যদিও ক্ষীণ, তবুও তাকে রাগতে দেখে আমি কেমন যেন অদ্ভুত মজা পাচ্ছি। আমার নজর তখন সাদা রঙের ফুলগুলোর চেয়ে লোকটির ওপরেই বেশি। পাশ ফিরে সাজিদকে ডাকতে যাব, ওমা! অমনি দেখি সাজিদ ভ্যানিশ! কোথায় গেল সে?

পরে সাজিদকে আবিষ্কার করলাম অন্য জায়গায়। এই দালানের উত্তর-পূর্ব দিকে একটি কৃত্রিম ঝরনা আছে। বাঁধের মতো করে একটি ছোট্ট পুকুরসদৃশ কুয়া। সেখানে বৈদ্যুতিক সংযোগের মাধ্যমে পানিকে সঞ্চারণ করে ওপর থেকে নিচের দিকে ফেলা হচ্ছে। সেই ঝরনার কাছে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আমি অনেকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে তার কাছে ছুটে এলাম। আমাকে এভাবে স্থান ত্যাগ করতে দেখে লম্বা গোঁফওয়ালা লোকটি নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছে। সে নিশ্চয়ই ভাবছে আমি তার ভয়ে পালিয়ে এসেছি। বিজয়ীর মতো হেসে হেসে, গর্বে ফুলে ওঠা বুক নিয়ে সে নিশ্চয়ই তার জায়গায় চলে গেছে এতক্ষণে। তার চোখ আর নাকের কী অবস্থা, কে জানে! সেগুলো কি এখনো ফুলে-ফেঁপে আছে? নাকি চুপসে গেছে?

সাজিদের কাছে এসে বললাম, 'কীরে! এদিকে চলে এসেছিস যে? তোকে আমি খুঁজছিলাম চারদিকে।'

সে আমার দিকে ফিরে বলল, 'কেন? দারোয়ানের ফোলানো নাক আর বিশালাকার চোখ দেখাতে?'

যা বাবা! এই ব্যাপারটি সাজিদ কীভাবে জানল? সে তো আমার সাথে ছিল না সেখানে। আমি থতমত খেয়ে তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। সে আমার অবাক করা দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে আবার ঝরনার দিকে মুখ ফেরাল। আমি তখনো এক অদ্ভুত বিস্ময় নিয়ে তার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ সে আমাকে বলল, 'আরিফ...?'

'হু।'

'এই ঝরনাটির দিকে তাকিয়ে দেখ!'

'কী দেখব?'

'কৃত্রিমতা দেখবি।'

'লাভ কী?'

'লাভ নেই।'

'তাহলে?'

এবার সাজিদ আমার দিকে ফিরে বলল, 'মানুষ মনে করে কী জানিস? টাকা, বিশাল অট্টালিকা, দামি গাড়ি আর ঐশ্বর্যের মধ্যেই সুখ। এই ঐশ্বর্য আর ধন-সম্পদের পেছনে ছুটতে ছুটতে মানুষ এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, স্রষ্টার অনুপম প্রকৃতিকে কাছ থেকে দেখার, সবুজাভ প্রকৃতির কাছে গিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার ফুরসত তার হয় না; কিন্তু সে জানে, দিনশেষে তার অট্টালিকা, তার বিশালাকার দালান তাকে মনোতৃপ্তি দিতে পারে না। সে এসবের মাঝে বন্দিজীবন পার করে; কিন্তু জীবন তাকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে যে, সে এই শৃঙ্খল থেকে কোনোভাবেই নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। তবুও তার একটু ফুরসত চাই। একটু অবসর। সেই অবসর, মনোরম পরিবেশ স্রষ্টার প্রকৃতি ছাড়া কোথায় পাবে? সে নিজের ইচ্ছেমতো তৈরি করে নেয় ঝরনা, কৃত্রিম হ্রদ ইত্যাদি। দিনশেষে সব আইডিয়া স্রষ্টার কাছ থেকেই ধার করা...।'

আমি মন দিয়ে সাজিদের এক নাগাড়ে বলে যাওয়া কথাগুলো শুনলাম। নিজ থেকে সে কখনোই আমার সাথে এভাবে কথা বলে না। তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর দেয়, ব্যস! কিন্তু আজ তার এমন দার্শনিক কথাবার্তা দেখে আমি আরও একবার অবাক হলাম।

হঠাৎ একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের আগমন। আমার অবাক হবার রেশ কাটতে না কাটতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের মধ্যে সাজিদ কে?'

'আমি' সাজিদ বলল।

'আপনাকে বড়দা যেতে বলেছেন।'

সাজিদের এসব বড়দা, মেঝদা, ছোট দা'দের আমি চিনি না। অবশ্য আমার চেনার কথা-ও না। সে কোন দিন কাকে, কোথায়, কখন যে অ্যাপয়েনমেন্ট দিয়ে রাখে সেটা আমিও বুঝতে পারি না। আজকে এসেছি তার কোনো এক বড়দার বাড়িতে। ইতিপূর্বে এই বিশাল বাড়িতে এসেছি বলেও আমি স্মরণ করতে পারছি না। সাজিদের পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে তার সেই বড়দার ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঘরটি বেশ পরিপাটি করে সাজানো। ঘরের আসবাবপত্র আর দেয়ালে টাঙানো কারুকাজ করা চিত্রকর্ম দেখেই বোঝা যায় লোকটি বেশ শৌখিন। বেতগাছের সোফার ওপর ভদ্রলোক পা লম্বা করে দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন। এক হাতে সিগারেট, অন্য হাতে বই। সিগারেটটি জ্বলে শেষ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে; কিন্তু সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই। তিনি বইপড়ার মধ্যে মগ্ন হয়ে আছেন। সম্ভবত মজার কোনো বই-টই হবে।

সাজিদ গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢোকে। সাজিদের গলার আওয়াজ শুনেই ভদ্রলোক ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালেন। গোলগাল চেহারার এই লোকটি আমাদের দেখেই হাতে থাকা সিগারেট মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে থ্যাঁতলে দিয়ে বললেন, 'সাজিদ, এসো এসো, বসো।' তিনি আমাদের সোফার দিকে ইশারা করে বসতে বললেন। আমি আর সাজিদ বাধ্যছেলের মতো সোজা গিয়ে সোফায় বসলাম। তিনি এবার তার রকিং চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসলেন। ভদ্রলোকের চেহারার সাথে কার চেহারার যেন আমি অদ্ভুতরকম মিল পাচ্ছি। আমি কি এর আগে তাকে দেখেছি কোথাও? অথবা তার মতো কাউকে কি আমি চিনি? ঠিক মনে করতে পারছি না।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'তোমাদের কষ্ট হয়নি তো আসতে?'

সাজিদ মাথা নেড়ে জানাল, 'না, কোনো কষ্ট হয়নি।'

আমাদের আসতে কোনো কষ্ট হয়নি শুনে ভদ্রলোক পা দুখানা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তোমরা একটু বসো। আমি আসছি' বলে তিনি ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। আমি সাজিদকে বললাম, 'হ্যাঁ রে! লোকটার চেহারাটি বেশ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আগে কোথাও দেখেছি?'

সাজিদ চুপ করে রইল।

'খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আগে কোথাও দেখে থাকতে পারি কি?'

'তিনিই হয়তো ভালো বলতে পারবেন', এই বলে সাজিদ সোফার সামনে টি-টেবিলে থাকা বইটি উল্টাতে লাগল। রাশিয়ান লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির লেখা *মা* উপন্যাসটি। কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা বিখ্যাত এই উপন্যাস সাজিদ এর আগেও কয়েকবার পড়েছে। যেহেতু উপন্যাসটি আগেই পড়া আছে, এই মুহূর্তে সেটি উল্টানোর কারণ কী? সাজিদের এমন গা-ছাড়া উত্তর শুনে আমার পিত্তি জ্বলে উঠল। ইচ্ছে করছিল তার পিঠে আস্ত একটি কিল বসিয়ে জবাব দিই; কিন্তু সম্ভব না। ভদ্রলোকের বাড়ি। এখানে বন্ধুত্বের ষোলকলা ফলাতে যাওয়া বিপদ। কোনোরকমে নিজেকে সংবরণ করে বললাম, 'আমি কিন্তু এরকম ঠাট্টা-টাইপ জবাবের আশায় প্রশ্নটি করিনি। তাকে সত্যিই খুব পরিচিত লাগছে। মনে হচ্ছে আগে কোথায় যেন দেখেছি।'

'দেখেও থাকতে পারিস।'

'তাকেই?'

'হয়তো তাকে অথবা তার মতো কাউকে। অসম্ভব তো না।'

বুঝতে পারছি সাজিদ আমার সাথে লুকোচুরি খেলছে। সোজা আঙুলে যেমন ঘি ওঠে না, তেমনই সোজা কথায় ওর পেট থেকে মূল কাহিনি বের হয় না। ওর বাম কান মলে দিয়ে বললাম, 'সোজা কথার সোজা উত্তর দিতে কি তোর খুব কষ্ট হয়?'

সাজিদ 'উহ্!' শব্দ করে বলল, 'ছাড়! ব্যথা লাগছে তো।'

'বল তাহলে এই লোককে কোথায় দেখেছি?'

সাজিদ বুঝতে পারল আমি নাছোড়বান্দা। বলল, 'পৃথিবীতে কাছাকাছি চেহারার মানুষ তো থাকতেই পারে, তাই না? যেমন ধর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অনেকে বলে তার চেহারার সাথে রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম যৌবনের চেহারার মিল আছে। এখন কেউ যদি রামমোহনের যৌবনকালের একটি ছবি এবং সুনীল দার যৌবনকালের ছবি পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বলে—এরা দুজন একই ব্যক্তি, সেটি কি ঠিক? আবার ধর হিটলারের কথা। কথিত আছে হিটলার একটি কারাগারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে দুই হাজার কয়েদিকে হত্যা করেছিল। সেই কয়েদিদের মধ্যে জুলিয়ান নামে একজন কবিও ছিলেন। এর ঠিক দু-বছর পরে কবি জুলিয়ানকে আবার পশ্চিম

জার্মানির রাস্তায় উলঙ্গা অবস্থায় হাওয়া খেয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। সবাই তো খুবই অবাক! অলৌকিক কাহিনি না তো? কিন্তু কবি জুলিয়ান এভাবে উলঙ্গা অবস্থায় ঘুরে বেড়াবে কেন? বোদ্ধা মহল সেই ঘটনার পক্ষেও যুক্তি দাঁড় করিয়ে ফেলল। তারা জানাল, কোনো এক অলৌকিক শক্তিবলে জুলিয়ান সেদিন প্রাণে বেঁচে যান; কিন্তু এমন আকস্মিক ঘটনার প্রভাব তিনি সইতে পারেননি। কথায় আছে, অধিক শোকে পাথর। বেচারা জুলিয়ান হয়তো অধিক শোকে পাথর হবার বদলে পাগল হয়ে যান। এরপর, একদিন জানা গেল এই পাগলটি আসলে জুলিয়ান ছিল না। হুবহু কবি জুলিয়ানের মতো দেখতে ছিল বটে। দেখ, মানুষ কতভাবেই-না বিভ্রান্ত হতে পারে, তাই না?

সাজিদের কথা শুনে আমার মাথায় যেন রক্ত চড়ে বসল। তার কাছে আমি শুনতে চাইলাম চর্যাপদের শ্লোক, সে আমাকে পুরো মহাভারত শুনিয়ে বসে আছে। আমি চোখ রাঙিয়ে বললাম, 'এই! তোর দার্শনিক কথাবার্তা অন্যদের জন্য তুলে রাখ। তোর কাছে এত প্যাঁচাল শুনতে চাইনি। রাজা রামমোহন রায় আর সুনীলের মধ্যকার সাদৃশ্য কীরকম, কিংবা কবি জুলিয়ান-নামার প্রাগৈতিহাসিক বর্ণনা তোর কাছে কি চেয়েছি? যা জানতে চেয়েছি তার উত্তর দে।'

সাজিদ ধপ করে দমে গেল। কথা বলতে শুরু করার পর তাকে যদি কেউ থামিয়ে দেয়, তখন সে তার চেহারা ঠিক বাঙলা পাঁচের মতো বানিয়ে ফেলে। ঝুমবৃষ্টির পর প্রকৃতিতে যেমন একটি থমথমে অবস্থা বিরাজ করে, সাজিদের চেহারার ভাবটাও এই মুহূর্তে সেরকম। আমাদের মাঝে রীতিমতো একটি ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। নীরব ঝগড়া। অবশেষে সে শান্ত গলায় বলল, 'লাস্ট ইয়ারে আমরা বার্সেলোনার যে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম, মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'সেখানে এক লোক আমাদের বিরল প্রজাতির একটি সাদা রঙের গরিলা দেখিয়েছিল না?

'হুম।'

'ওই লোকটার নাম মনে আছে?'

ওই লোকটার নাম মনে করার চেষ্টা করলাম। কী যেন নাম ছিল? ধুর ছাই। মনে আসছে না। বললাম, 'ভুলে গেছি।'

'তার নাম ছিল ড্যানিয়েল।'

'ওহ হ্যাঁ, ড্যানিয়েল; মনে পড়েছে। তো?'

'তো আবার কী?'

'আমি তো তোর কাছে ড্যানিয়েল-সংক্রান্ত লঙ্কাকাহিনি শুনতে চাইনি। তোর সামনে উপবিষ্ট থাকা তোর বড়দার ব্যাপারে জানতে চেয়েছি।' সাজিদ বলল, 'ওহ! ভুলে গিয়েছিলাম। এই সেই ড্যানিয়েল, যার সাথে আমাদের বার্সেলোনার চিড়িয়াখানায় দেখা হয়েছিল। আমাদের ইনিই তো পুরো চিড়িয়াখানা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন।'

আমি যেন তাজ্জব বনে গেলাম। সাদা চামড়ার সেই স্প্যানিশ লোকটি কি জলবৎ তরলং করে বাংলা বলে যাচ্ছে! আমি সাজিদের দিকে ফিরে বললাম, 'দেখ সাজিদ, আজকাল তুই খুব বেশিই মজা করছিস। এরকম একজন নিখাদ বাঙালিকে তুই স্প্যানিশ ড্যানিয়েল বানিয়ে দিয়েছিস? তুই কি মনে করেছিস তোর সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, কথাবার্তা আমি বিনাবাক্যে বিশ্বাস করে নেব? নেভার!'

হঠাৎ আমাদের পেছন থেকে কথা বলে উঠলেন সাজিদের সেই বড়দা। তিনি বললেন, 'এক্সকিউজ মি, আরিফ। মে বি অ্যাই অ্যাম ইন্টারফেয়ারিং ইন ইওর পারসোনাল ডিসকাশন। বাট ইট সীমস লাইক ইউ আর মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ভেরি পোলাইট বয়, সাজিদ। হি ইজ নট লাইয়িং অ্যাট অল। অ্যাই অ্যাম দ্যাট গাই উইথ হুম ইউ গাইস মেট অ্যাট দ্য জু অব বার্সেলোনা। আমার নাম ড্যানিয়েল। আমার জন্ম বাংলাদেশেই। খুলনাতেই আমি বেড়ে উঠেছি। আট বছর বয়সেই আমরা সপরিবারে স্পেন চলে যাই। দীনেশ আচার্য থেকে আমি হয়ে উঠি ড্যানিয়েল।'

আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই লোক কী করে সেই লোক হতে পারে? স্পেনে যখন ছিলাম, এই লোক একটিবারের জন্যও আমাদের সাথে কেন বাংলা বলেননি? আর সাজিদের সাথে এই লোকের বিশেষ সম্পর্কটাই-বা কী? সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি...।

ড্যানিয়েল ওরফে দীনেশ আচার্য নামের লোকটি ট্রেতে করে কফি নিয়ে এসেছেন। চকোলেট রঙের কফির কাপগুলো আমাদের সামনে রেখে তিনি আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। পায়ের ওপর পা তুলে কফির কাপে চুমুক দিয়ে সাজিদের কাছে জানতে চাইলেন, 'তোমার মফিজুর রহমান স্যার কেমন আছেন, বলো তো?'

আরে বাহ! সাজিদ এই লোকটার সাথে মফিজ স্যারের গল্পও করে রেখেছে, অথচ আমি দাবি করে থাকি সাজিদের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের খবর আমার নখদর্পণে। নিজের ওপর নিজেরই খানিকটা রাগ হলো। সাজিদ উত্তরে বলল, 'জি, স্যার ভালো আছেন।'

'আচ্ছা, ভদ্রলোক তোমাকে আইনস্টাইন বলে ডাকেন কেন? আই মিন, ফিজিক্স তো তোমার বিষয় নয়। তোমার বিষয় হচ্ছে বায়োলজি। তিনি যদি তোমাকে কোনো উপনামে ডাকবেনই, তাহলে বায়োলজিতে বিরাট অবদান রেখেছে এরকম কোনো বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নামানুসারে ডাকলেই পারেন। আইনস্টাইন তো বায়োলজির কেউ ছিলেন না।'

সাজিদ বলল, 'ঠাট্টা করে ডাকেন।'

'ও আই সী।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা, ঠাট্টা করে আইনস্টাইন-ই বা ডাকতে হবে কেন?'

সাজিদ একটু নড়েচড়ে বসে হাত থেকে কফির কাপটি রেখে বলল, 'আসলে, আইনস্টাইন এমন একটি ফিগার, যাকে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের বাইরের যে কেউ চেনে। বিজ্ঞানের জগতে আইনস্টাইন যতটা পপুলার, ততটা আর কেউ হতে পারেননি। আপনি যদি টলেমি, কোপার্নিকাসদের নাম সাধারণ মানুষের কাছে বলেন, ওরা বোকা বোকা চোখে আপনার দিকে তাকাবে। সাধারণ মানুষ আইনস্টাইনকে যেভাবে চেনে বা তার নাম তারা যেভাবে শুনেছে, অন্য কারও নাম সেভাবে তারা শোনেনি। যেমন ধরুন, আমাকে যদি বায়োলজি ফিল্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বলতে হয় আমি কিন্তু ডিএনএ-এর আবিষ্কারক স্যার ফ্রান্সিস ক্রিকের কথাই বলব। এখন মফিজুর রহমান স্যার যদি আমাকে ঠাট্টা করে 'মিস্টার আইনস্টাইন' এর বদলে 'মিস্টার ফ্রান্সিস ক্রিক' বলে ডাকেন, সম্ভবত কেউই তার এই ঠাট্টা ধরতে পারবে না। মানুষ ভাববে, আমার নাম বোধকরি সত্যি সত্যিই ফ্রান্সিস ক্রিক; কিন্তু আমাকে যখনই তিনি 'মিস্টার আইনস্টাইন' বলে ডাকেন, তখন কিন্তু সবাই তার উপহাসটি ধরে ফেলে আর মজা পায়। হাসাহাসি করে। এটি হচ্ছে হিউম্যান সাইকোলজি। মানুষ তার পরিচিত

বিষয়াদির বাইরের বিষয় নিয়ে খুব-একটা বুদ্ধি খাটাতে চায় না। এজন্যই বোধহয় মফিজুর রহমান স্যার আমাকে মিস্টার আইনস্টাইন সম্বোধন করেন।'

'গ্রেট! সুন্দর বলেছ সাজিদ। ইউ এক্সপ্লেইনড ইট কোয়াইট ইজিলি।' ড্যানিয়েল নামের ভদ্রলোক হাত চাপড়ে বললেন। মফিজুর রহমান স্যার কেন সাজিদকে 'মিস্টার আইনস্টাইন' নামে ডাকে সেই প্রশ্ন কখনোই আমার মনে আসেনি; কিন্তু সেই প্রশ্নের এত ভালো একটি ব্যাখ্যা থাকতে পারে জানলে আরও আগে সাজিদকে প্রশ্নটি করা যেত; কিন্তু সাজিদ কি ড্যানিয়েল নামের লোকটার কাছে মফিজুর রহমান স্যারের ব্যাপারে ওকালতি করল? যাওয়ার পথে জিজ্ঞেস করতে হবে...।

আমাদের আলোচনার ছেদ ঘটিয়ে ঘরের সামনের দরজার ওখান থেকে একজন বলে উঠলেন, 'গুড মর্নিং গাইস।'

মুহূর্তেই আমাদের দৃষ্টি তার দিকে পড়ল। এই লোককে দেখতে মোটেও ব্রিটিশ বা স্প্যানিশ বলে মনে হয় না। বাংলার হাওয়া-জল আর মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েই যে তার বেড়ে ওঠা, সেটি তার চেহারা আর শারীরিক গঠনই বলে দিচ্ছে। ভদ্রলোক হুড়মুড় করে ভেতরে এসে ড্যানিয়েল সাহেবের পাশের সোফায় গিয়ে বসলেন। সাজিদের বড়দা ওরফে ড্যানিয়েল সাহেব সাজিদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'রমেশ দা, তোমাকে যার কথা বলেছিলাম, এই হলো সে, সাজিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রো বায়োলজির ছাত্র। ভেরি ট্যালেন্টেড বয়।

'আই সী', রমেশ নামের লোকটি সাজিদের দিকে তাকিয়ে হাসোজ্জ্বল মুখে বললেন।

ড্যানিয়েল সাহেব বললেন, 'সাজিদ, আজ যে-কারণে তোমাকে আসতে বলা। এই হচ্ছেন রমেশ আচার্য। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সময়ে ইকোনোমিক্স পড়াতেন। রমেশ দার কাছে তোমার অনেক গল্প করেছি আমি। দাদার কিছু প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলো ইসলাম নিয়ে। একটি ব্যাপার জানিয়ে রাখি, দাদা কিন্তু হিন্দু নন। ধর্ম, ঈশ্বর এবং পরকালে অবিশ্বাসী একজন নিখাদ নাস্তিক। তুমি কি দাদার প্রশ্নগুলো একটু শুনবে?'

সাজিদ মাথা নেড়ে শোনার জন্য সম্মতি জানাল। ইতোমধ্যে রমেশ আচার্যের জন্যও এক কাপ কফি চলে এসেছে। কফির ধোঁয়া-ওড়া কাপে চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, 'আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, সেই সময় ইউনিভার্সিটির হলে থাকতাম। আমার

একজন রুমমেট ছিল, যে ইসলামিক স্ট্যাডিজের ওপরে এম.ফিল করছিল। তার থিসিসের বিষয় ছিল মুহাম্মাদের জীবনী। তার থিসিসটি একবার আমাকে পড়তে দিয়েছিল সে। থিসিসটি পড়তে গিয়ে খেয়াল করলাম যে, মুহাম্মাদ নাকি এগারোটি বিয়ে করেছেন জীবনে। আই রিপিট, এ-গা-রো... আমাকে বলতে পারো, একজন লোকের জীবনে ঠিক এগারোজন স্ত্রীর দরকার পড়বে কেন?'

বুঝতে পারলাম পুরোনো কাসুন্দি। সচরাচর নাস্তিকরা যে-সব প্রশ্ন পকেটে নিয়ে ঘোরে আর-কি! আরে বাবা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগারোটি বিয়ে করবেন, না পঁচিশটি করবেন, তা দিয়ে তোমাদের কী? এ-জাতীয় প্রশ্ন শুনলেই আমার পিত্তি জ্বলে ওঠে। নাস্তিক হয়েছ ভালো কথা, তাই বলে কারও ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাতে যাওয়া লাগবে কেন? যত্ত সব!

সাজিদ এরকম প্রশ্নগুলো শোনার পরে এখনো কীভাবে স্বাভাবিক রয়েছে আল্লাহ মালুম। আমার তো রাগে গা গিজগিজ করছে। হাত থেকে ম্যাক্সিম গোর্কির *মা* উপন্যাসটি রেখে সাজিদ বলল, 'আমি কি আপনাকে 'রমেশ দা' বলে ডাকতে পারি?'

'অবশ্যই পারো', সামনে উপবিষ্ট লোকটি বলল।

'আচ্ছা রমেশ দা, আপনি কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী কখনো পড়েছেন?'

'তা পড়িনি অবশ্য। তবে নানাজনের কাছ থেকে কিছু কিছু ব্যাপারে শুনেছি।'

লোকটার কথা শুনে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। বলে ফেললাম, 'আপনি যখন তার কোনো জীবনীই পড়েননি, তাহলে প্রশ্নের ঝুলি নিয়ে ঘুরছেন কীভাবে? কোনো কিছু নিয়ে প্রশ্ন করতে হলে আগে সে সম্পর্কে পড়াশোনা করতে হয়। এই কমন-সেন্সটুকুও কি আপনাদের নেই?'

আমার জোরালো ও ঝাঁঝালো বক্তব্য শুনে দীনেশ আচার্য এবং রমেশ আচার্য, দুই আচার্য মিলে আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল। বুঝতে পেরেছি, আমার গলার স্বর একটু বেশিই উঁচু করে ফেলেছি। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সাজিদ বলল, 'ফাইন! প্রশ্ন করার জন্যে যে, আগে সে ব্যাপারে ব্যাপক পড়াশোনা থাকতে হবে, ব্যাপারটি এমন নয়। এটি একটি ভুল ধারণা। প্রশ্ন যে-কারও থাকতে পারে। একটি

ছোট শিশু যখন আকাশের চাঁদ দেখে প্রশ্ন করে, তখন তার অবশ্যই জানা লাগে না যে, চাঁদ হলো একটি উপগ্রহ। এটি পৃথিবী থেকে এত কিলোমিটার দূরে। এটার ভূপৃষ্ঠ অমুক-তমুক পদার্থ দিয়ে গঠিত। প্রশ্ন করার জন্যে তার সে ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন নেই। যদি থাকত, তাহলে সে-বিষয়ে তার মনে প্রশ্ন জাগত না।'

সাজিদের গোছালো বক্তব্য শুনে আমি চুপসে গেলাম। আপাতবিরোধী মনে হলেও তার কথায় যুক্তি আছে। সে আবার বলতে শুরু করল, 'তাহলে রমেশ দা, আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো জীবনীই পড়েননি?'

'না।'

'কোনো সমস্যা নেই। আপনার প্রশ্নটি হচ্ছে, কেন তিনি এগারোটি বিয়ে করেছিলেন, রাইট? একজন মানুষের জীবনে এতগুলো স্ত্রীর দরকার পড়বে কেন, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'ভেরি গুড। আচ্ছা, আপনি কি জানেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক কত বছর বয়সে প্রথম বিয়ে করেছিলেন এবং কাকে বিয়ে করেছিলেন?'

'নামটি এক্সাক্টলি মনে পড়ছে না। তবে কোনো ব্যবসায়ী নারীকে বিয়ে করেছিলেন এ্যাজ ফার এ্যাজ আই ক্যান রিমেম্বার।'

'একদম ঠিক। তিনি বিয়ে করেছিলেন একজন ব্যবসায়ী নারীকে। তার নাম ছিল খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ। মানে, খুওয়াইলিদ নামের এক ব্যক্তির কন্যা, যার নাম ছিল খাদিজা। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে বিয়ে করেন, তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল পঁচিশ বছর। আর খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের বয়স কত ছিল জানেন?'

রমেশ আচার্য জানতে চাইল, 'কত?'

'চল্লিশ বছর।'

'ও, আই সী', বলল রমেশ আচার্য নামের ভদ্রলোক।

'কিন্তু আপনি কি আমাকে বলতে পারেন, একজন সুদর্শন পুরুষ, যখন তার টগবগে তারুণ্য, ভরা যৌবনকাল, তখন ঠিক কীসের জন্যে তিনি চল্লিশ বছরের একজন নারীকে বিয়ে করলেন যখন তার যৌবনকাল অস্তমিত প্রায়? শুধু কি তা-ই? এই চল্লিশোর্ধ্ব নারী ছিলেন একজন বিধবাও। আমাকে বলুন তো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো একজন তরুণ, যার কি না তখন যৌবনের উচ্ছলতায় মেতে ওঠা কোনো সুদর্শনা তরুণীকেই বিয়ে করাটাই ছিল যুক্তিসংগত, তিনি কেন স্ত্রী হিশেবে বেছে নিলেন একজন বিধবা, চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের নারীকে?'

'মে আই ইন্টারফেয়ার হিয়ার?' বললেন দীনেশ আচার্য ওরফে মি. ড্যানিয়েল।

'শিওর', সাজিদ বলল।

'আমার মনে হয় কি সাজিদ, খাদিজা নামের যে ব্যবসায়ী নারীর কথা তুমি বললে, তার অঢেল সম্পত্তি, ব্যবসায় ইত্যাদির মালিকানা হস্তগত করার জন্যেই মুহাম্মাদ আসলে তাকে বিয়ে করেছে। আই ডোন্ট নো হোয়্যাট দ্য একচুয়াল ম্যাটার ইজ, বাট এটি একটি পয়েন্ট হতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে।'

মধ্যবয়স্ক এক চাচা গোছের মানুষ আমাদের জন্যে আবার কফি নিয়ে এসেছেন। কফির কাপগুলো টেবিলে রাখামাত্রই তিনি সুড়সুড় করে হেঁটে ভেতরে চলে গেলেন। মি. ড্যানিয়েল সাহেব আমাদের সকলকে আবারও কফি পরিবেশন করলেন। ধোঁয়া-ওড়া কফির কাপে চুমুক দিয়ে সাজিদ বলতে শুরু করল, 'হ্যাঁ, এটি একটি চমৎকার পয়েন্ট বটে; কিন্তু আপনি যদি ইতিহাসের পাতা উল্টান, এমনকি যদি আপনি ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি, ওরিয়েন্টালিস্টদের লেখা বইপত্রও ঘাঁটেন, তাহলে কোথাও আপনি এর পক্ষে বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাবেন না।'

'কীসের পক্ষে?' রমেশ দার প্রশ্ন।

'এই যে, বড়দা যেটি বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকি ব্যবসায়-সম্পত্তির লোভেই খাদিজার মতো বয়স্ক ও বিধবা নারীকে বিয়ে করেছেন।'

'তাহলে এর পেছনের রহস্য কী?'

'কোনো রহস্য-টহস্য নেই আসলে। তৎকালে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্বাসযোগ্যতা, সত্যবাদিতা, কর্মনিষ্ঠা ও সুন্দর আচরণের কথা মক্কার সর্বত্র

ছড়িয়ে পড়ে। এই সংবাদ মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের কানেও চলে যায়। অনেকদিন থেকে তিনি তার ব্যবসায় পরিচালনার জন্যে এরকম একজন সৎ, বিচক্ষণ, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও কর্মনিষ্ঠ লোক খুঁজছিলেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে এরকম প্রশংসা শুনে তিনি তাকে একটু যাচাই করে নিতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাকে কিছু কাজ দিয়ে বণিকদের সাথে সিরিয়ায় পাঠালেন। সাথে বিশেষ এক সহচর নিযুক্ত করলেন, যাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরো সফরে খুব কাছ থেকে ভালোভাবে, অবজার্ভ করা যায়। তার ব্যাপারে লোকমুখে যে সুনাম, যে প্রশংসা চাউর হয়ে আছে, তা আদৌ সত্য কি না, সেটি যাতে হাতেনাতে প্রমাণিত হয়। যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরিয়া-সফর থেকে ফিরলেন, সে-বার ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা হয় এবং তিনি তার হিশাবপত্রেও ছিলেন একেবারেই নির্ভুল, স্বচ্ছ এবং সৎ। খাদিজার নিযুক্ত করা সহচরও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে খুব ইতিবাচক ফলাফল প্রদান করলেন। সব দেখেশুনে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মনে হলো যে, এই তরুণকে চাইলেই বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া যায় এবং তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ব্যাপারে অভিভাবক হিশেবে তার চাচা আবু তালিবকে সাব্যস্ত করেন। পরবর্তীতে আবু তালিবের সম্মতিতে খাদিজার সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে সম্পন্ন হয়। এটাই হচ্ছে পুরো এবং প্রকৃত ঘটনা। এবার বলুন তো, এই ঘটনার কোথাও কি সম্পত্তির প্রতি লোভ আছে? অর্থের প্রতি লোভ আছে? নাকি ব্যবসায়ে মালিকানা হস্তগত করার কোনো পূর্বপরিকল্পনা বা দুরভিসন্ধি আছে?'

রমেশ আচার্য নামের লোকটি পায়ের ওপর পা তুলে বলল, 'ইফ দ্যা কেইস ইজ দিস, দ্যান ইটস ওকে।'

সাজিদ বলতে লাগল, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহুবিবাহের প্রসঙ্গ টেনে মূলত নাস্তিকরা যা বোঝাতে চায় তা হলো, তিনি নাকি নারীলোভী ছিলেন। অথচ আপনি যদি ইতিহাসের পাতা খুলে দেখেন, তাহলে দেখবেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যৌবন, পড়ন্ত যৌবন এবং বার্ধক্যেরও কিছুটা সময় পার করেছেন তার প্রথম স্ত্রী খাদিজার সাথেই। প্রথম স্ত্রী যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কাউকে বিয়ে করেননি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন পঞ্চাশ বছর, যখন তার যৌবন শেষ হয়ে শরীরে বার্ধক্য নেমে আসে তখন তার প্রিয় সহধর্মিনী খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যু হয়।

নাস্তিকরা যাকে নারীলোভী আখ্যায়িত করতে চায়, সে-ই তিনিই নাকি ভরা যৌবনের সবটুকু সময় অর্থাৎ—পঁচিশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছেন একজন স্ত্রীর সাথেই। নাস্তিকদের দাবি যদি সত্যি হতো, তাহলে এই পঁচিশ বছরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তত পাঁচ-পাঁচটি স্ত্রী থাকা উচিত ছিল; কিন্তু ইতিহাসে এরকম কোনো প্রমাণ নেই। এ থেকে কী প্রমাণিত হয়? এ থেকে প্রমাণিত হয় যে নাস্তিকদের যুক্তিটি অত্যন্ত দুর্বল এবং অযৌক্তিক।'

'তাহলে বাদবাকি বিয়েগুলো? সেগুলোর ব্যাপারে কী বলবে তুমি?' বলে উঠলেন মি. ড্যানিয়েল।

'বলছি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন, তখন তিনি মক্কায় আস্তে আস্তে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। যখন তার দাওয়াত ধীরে ধীরে বিশাল আকার ধারণ করতে লাগল, যখন চারদিক থেকে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত মানুষেরা তার কাফেলায় এসে শামিল হতে লাগল, ব্যাপারটি তখন আরবের গোত্রপ্রধানদের নজরে এলো। তারা ভাবল, 'না, এই লোককে তো দমন করতে হবে।' তারা ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে আসা মানুষগুলোর ওপরে চালাতে লাগল অমানুষিক অত্যাচার, নির্যাতন। নির্যাতনের সেই মাত্রা এতটাই ভয়াবহ এবং পৈশাচিক ছিল; যা বর্ণনাতীত। বুকের ওপর পাথর তুলে দেওয়া, তপ্ত মরুভূমিতে বেঁধে রাখাসহ নানাবিধ অত্যাচার। তবুও দমে যাননি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সঙ্গীরা। এরকম অমানুষিক নির্যাতনের মুখেও মানুষ দলে দলে ইসলামধর্মে যোগ দিতে শুরু করল। কুরাইশদের পরিকল্পনা কোনো কাজে আসলো না। তারা ভাবল, 'না, এভাবে তো এদের দমানো যাবে না। তাহলে কী করা যায়?'

এবার নতুন প্রস্তাব পাস হলো। কুরাইশ গোত্রপ্রধান, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, 'মুহাম্মাদ, তুমি কী চাও বলো? তুমি যদি চাও তাহলে তোমাকে আমরা আমাদের রাজা বানিয়ে নেব। আরব মুল্লুকের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারীদের এনে তোমার পায়ের কাছে রেখে যাব। তবুও তুমি নতুন যে-ধর্মের কথা মানুষকে বলে বেড়াচ্ছ, সেটি বন্ধ করে দাও।'

চিন্তা করুন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কীসের লোভ দেখানো হলো? রাজা হওয়ার এবং আরবকুলের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারীদের ভোগ করতে পারার লোভ; কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছিলেন সেদিন, জানেন?'

'কী?'

'তিনি তাদের প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার একহাতে যদি সূর্য আর অন্য হাতে চাঁদও এনে দাও, তবুও আমি এই সত্যপ্রচার থেকে একটুও পিছপা হবো না।' কী আশ্চর্য! যে-লোককে আজ নাস্তিকরা নারীলোভী বলতে চাচ্ছে, সেই লোকের সামনে যখন আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারীদের হস্তগত করার সুযোগ এলো, তিনি সেই প্রস্তাব হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বলুন তো বড়দা, এরকম নারীলোভী আপনি কখনো দেখেছেন জীবনে?'

খেয়াল করলাম, দীনেশ আচার্য নামের লোকটি ঢোক গিলল দু-বার। টেবিলে থাকা জগ থেকে পানি ঢেলে নিয়ে ঢকঢক করে পান করে সাজিদ আবার বলতে শুরু করল— 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে যে-কয়টি বিবাহ করেছেন তাদের সবাই ছিলেন বয়স্কা এবং বিধবা; কেবল আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত। অথচ একটি হাদীসে পাওয়া যায়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জাবির ইবনু আব্দিল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কুমারী কোনো নারীকে বিয়ে করেছেন কি না। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন বললেন, তিনি একজন বিধবাকেই বিয়ে করেছেন, তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তোমরা দুজনে মিলে আনন্দ করতে পারতে।'

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, কুমারী নারী বিয়ে করলে শারীরিক তৃপ্তি বেশি পাওয়া যায়। তাই তিনি জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুমারী কেন বিয়ে করল না সে-ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। অথচ তিনি নিজে যাদের বিয়ে করেছেন তাদের সবাই ছিলেন বয়স্কা এবং বিধবা। যদি তিনি নারীলোভীই হতেন, তাহলে তো তিনি বেছে বেছে কুমারী মেয়েদেরই বিয়ে করতেন, তাই না?'

'এক্সাক্টলি', আমি বললাম।

সাজিদ বলতে লাগল, 'এই আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই নারীলোভী ছিলেন না। এটি স্রেফ তার নামে অপবাদ।'

রমেশ আচার্য বলে উঠলেন, 'মাই ডিয়ার সাজিদ, আমি এখনো এই বিষয়টাই বুঝতে পারলাম না, কেন তার এতগুলো স্ত্রীর দরকার ছিল?'

লোকটার কথা শুনে আমার মাথা তৃতীয় বারের মতো গরম হয়ে গেল। সাজিদ কিছু বলার আগে আমি বলে উঠলাম, 'মি. আচার্য, আমি কিছু বলতে চাই।' লোকটি আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'শিওর।'

'আপনি কি নিজেকে একজন নাস্তিক দাবি করেন?'

'অবশ্যই করি।'

'আপনি কি ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী?'

'অবশ্যই।'

'আপনি যখন ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, তাহলে আরেকজন লোক কেন এতগুলো বিয়ে করল সেটি তো আপনার মাথাব্যথার কারণ হতে পারে না, তাই না? কে কতগুলো বিয়ে করল সে ব্যাপারে তো আপনার নাক গলানোর কিছু নেই।'

'তুমি খুব বেশিই রেগে যাচ্ছ মাই ডিয়ার', লোকটি বললেন।

সাজিদ আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় আমাকে ধৈর্য ধরতে এবং চুপ করতে বলল। লোকটিকে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু সাজিদের অনুরোধে নিজের ক্ষোভ নিজের ভেতরেই চাপা দিলাম।

সাজিদ বলতে লাগল, 'আচ্ছা, আমার একটি প্রশ্ন আছে। বহুবিবাহ ব্যাপারটি যদি কোনো সমাজে পারমিটেড কিছু হয়, তাহলে সেটি অনুসরণ করতে কোনো অসুবিধে আছে কি?'

'না', বললেন সাজিদের বড়দা ওরফে দীনেশ আচার্য।

'ঠিক আছে। আমরা যদি তৎকালীন আরবের দিকে তাকাই, আমরা দেখতে পাব, জাহিলিয়্যাতের ওই সময়টায় নারীদের না ছিল কোনো মর্যাদা, না ছিল কোনো অধিকার। সে-সময়ে জীবন্ত কন্যাশিশুদের কবরস্থ করা হতো। পুরুষকুল নারীদের রক্ষিতা হিশেবে ব্যবহার করত। ঠিক এমনই একটি সময়ে এসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের মর্যাদা সমুন্নত করে দিলেন। তিনি নিজে নারীদের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—নারীরা রক্ষিতা হবার জিনিস নয়।'

রমেশ আচার্য বলে উঠলেন, 'বাট, চৌদ্দশো বছর আগে আরবের কালচারে কী ছিল আর কী হতো তা দিয়ে তো তুমি মুহাম্মাদের বহুবিবাহকে জাস্টিফাই করতে পারো না সাজিদ।'

'কোনটি চৌদ্দশো বছর আগের কালচার?', সাজিদ জানতে চায়।

'এই যে, আরবে তখন নারীদের রক্ষিতা হিশেবে রাখার ব্যাপারটি।'

'এটি তো শুধু আরবের কালচার ছিল না, এটি পুরো বিশ্বেরই একটি চিত্র। শুধু কি চৌদ্দশো বছর আগের ঘটনা এসব? এগুলো তো আমাদের সমাজে সেদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।'

'বুঝলাম না কথাটা।' নড়েচড়ে বসলেন দীনেশ আচার্য।

সাজিদ বলতে লাগল, 'বুঝিয়ে বলছি। ১৯৩৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া আমেরিকান লেখিকা Pearl S. Buck এর নাম শুনেছেন?'

রমেশ আচার্য বললেন, 'হ্যাঁ। শুনেছি।'

'তার অধিকাংশ উপন্যাস চীনের সামাজিক পটভূমির ওপরেই রচিত। তিনি তার বিখ্যাত উপন্যাস *A House Divided, East Wind : West Wind, The Good Earth* ইত্যাদিতে ১৯০০ সালের দিকে চীনের সামাজিক প্রেক্ষাপটের ব্যাপারে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসসমূহে তিনি দেখিয়েছেন ওই সময়গুলোতে চীনের পুরুষেরা স্ত্রীর পাশাপাশি কীভাবে একাধিক রক্ষিতা রাখত। ওই রক্ষিতাদের গর্ভে চীনের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদদের জন্ম হয়, যারা কোনোদিন পিতার পরিচয় পাননি। শুধু তা-ই নয়, আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের নিকট-অতীতের ইতিহাসের দিকে তাকালেও আপনি একই রকম চিত্র দেখতে পাবেন।'

'তাই নাকি?' জানতে চাইল রমেশ আচার্য।

'জি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম শুনেছেন? পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যিক?'

'হ্যাঁ।'

'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত একটি উপন্যাসের নাম হচ্ছে *প্রথম আলো*। ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক রথী-মহারথী ব্যক্তিত্বের জীবনী তিনি সেখানে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। ব্রিটিশ ভারতের সময়কালে, অর্থাৎ ১৯০০ সালের দিকে ত্রিপুরার মহারাজ চন্দ্র মাণিক্যের যে অনেকগুলো রক্ষিতা ছিল, সেই কাহিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খুব সুন্দরভাবেই তুলে ধরেছেন উপন্যাসটিতে। চন্দ্র মাণিক্যের ওই রক্ষিতাদের গর্ভে তার অনেক সন্তান জন্মলাভ করে, যাদের চন্দ্র মাণিক্যের পৌরুষের প্রতীক বলা হতো।

'আই সী', অবাক হলেন দীনেশ আচার্য।

'এই হচ্ছে আমাদের সমাজের খুব নিকট-অতীতের কথা। আর, রমেশ দা বলছেন আমি কেন চৌদ্দশো বছর আগের কালচার টেনে একাধিক বিয়েকে জাস্টিফাই করছি।'

রমেশ আচার্য কাচুমাচু মুখ নিয়ে বললেন, 'সরি টু সে সাজিদ। এসব আসলে আমার জানা ছিল না।'

'ফাইন। আমি আপনাকে বিব্রত করার জন্যে এসব ইতিহাস টেনে আনিনি। আমি শুধু এটি দেখাতে চেয়েছিলাম যে, এই কালচারটি কত আগেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংস্কার করে গিয়েছেন। নারীদের তিনি দিয়ে গেছেন তাদের প্রাপ্য মর্যাদা। পরিপূর্ণ অধিকার...।'

দীনেশ আচার্য বললেন, 'আমার মনে হয় কী জানো? মুহাম্মাদের এগারোটি বিয়ের পেছনে কোনো যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে। তোমার কী মনে হয় সাজিদ?'

'অবশ্যই', সাজিদ বলল। 'আপনি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সব ঘটনা পরম্পরায় সাজান, আপনি অবাক বিস্ময়ে খেয়াল করবেন যে, সেগুলোর পেছনে যৌক্তিক কোনো-না-কোনো কারণ অবশ্যই রয়েছে। আর বিয়ে হলো একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলাতেও সেটি প্রযোজ্য। এরকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর পেছনে কোনো লজিক থাকবে না, তা কীভাবে হয়?'

'কী সেই কারণগুলো?', জানতে চাইল রমেশ আচার্য।

সাজিদ বলতে লাগল, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়ে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তখন তিনি হয়ে উঠলেন মুসলমানদের একচ্ছত্র নেতা, একচ্ছত্র সেনাপতি। তার কিছু বিয়ে ছিল সন্তানদের দেখভালের দায়িত্ব অর্পণের জন্য। যেমন সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা মারা যাওয়ার পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চার কন্যাসন্তানকে দেখভালের তাগিদেই তিনি তাকে বিয়ে করেন। তার কিছু বিয়ে ছিল অন্য গোত্রের সাথে জোরদার সম্পর্ক তৈরির খাতিরে। যেমন বনু মুসতালিক গোত্রের নেতা হারেসার কন্যা জুরাইরিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার কথাই ধরুন। পিতা হারেসার সাথে বন্দি হয়ে আসার পরে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মুক্তি চাইলে তিনি তাকে মুক্তি দেন এবং বিবাহেরও প্রস্তাব দেন। এতে তিনি রাজি হন এবং তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের পরে হারেসা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্বশুর হয়ে গেলেন। এদিকটি বিবেচনা করে সাহাবীরা বনু মুসতালিক গোত্রের সবাইকে মুক্ত করে দেয়। এতে বনু মুসতালিক গোত্রের সকলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সঙ্গীদের আচার, আচরণ ও মহত্ত্ব দেখে ইসলাম গ্রহণ করে। ঠিক একই রকম ব্যাপার সাফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার বেলাতেও। এভাবে ইসলামের চরম শত্রু গোত্রগুলো পরিণত হলো ইসলামের পরম মিত্র গোত্রে। বলুন তো বড়দা, একজন পলিটিশিয়ান হিশেবে, একজন রাষ্ট্রনায়ক হিশেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কৌশলকে আপনি কীভাবে দেখবেন?'

'ইট ওয়াজ ডেফিনেটলি অ্যা গুড ডিসিশান।' বড়দা বললেন।

'এরপর নিজের খুব কাছের সাহাবীদের সাথে সম্পর্ক আরও মজবুত, আরও শক্তিশালী করার জন্যে তিনি তাদের সাথেও সম্পর্ক পেতেছেন। তিনি বিয়ে করেছেন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে। শুধু তা-ই নয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কন্যা ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এবং কুলসুম আর রুকাইয়াহকে বিয়ে দিয়েছেন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে। আপনি ইসলামের ইতিহাস দেখুন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর কিন্তু এই চারজনই ধারাবাহিকভাবে খলীফা তথা মুসলমানদের আমীর নির্বাচিত হয়। এবার বুঝতে পেরেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কৌশলটি কত বিস্তৃত ছিল?'

বড়দা এবং রমেশ আচার্য, দুজনেই চুপ করে আছে। সাজিদ বলতে লাগল, 'যাইনাব বিনতে জাহাশ, যিনি ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাত বোন, তার সাথেও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। কেন জানেন?'

রমেশ আচার্য জানতে চাইল, 'কেন?'

'কারণ, আরবের প্রচলিত নিয়ম ছিল, পালকপুত্র হলো নিজের পুত্রের মতো। তাই পালকপুত্রের স্ত্রীকে পরে কেউ বিয়ে করতে পারত না, নিষিদ্ধ ছিল। ইসলাম এসে এই সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে। রাসূল তার পালকপুত্র যায়েদের কাছ থেকে তালাক পাওয়া যাইনাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করে আরবদের জৈবনিক প্রমাণ দিয়ে দেখালেন যে, পালকপুত্র কখনোই নিজের পুত্র হতে পারে না। তাদের তালাক দেওয়া, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়া নারীদেরও বিয়ে করা যায়। এটাই হলো যাইনাব বিনতে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার পেছনে অন্যতম মাহাত্ম্য।

বড়দা বললেন, 'বুঝতে পারলাম।'

'এগুলো হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু বিবাহের কিছু কারণ। এসব ছাড়া আরও কারণ আছে। যেমন—পুরুষদের জন্য যে-সব মাসআলা-মাসায়েল, সেগুলো তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি জেনে নিতেন বা শুনে নিতে পারতেন; কিন্তু নারীদের ব্যাপারে সে সুযোগ ছিল না। কারণ, পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে তিনি নারীদের সামনে গিয়ে মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলাপ করতে পারেন না। তাহলে নারীরা কীভাবে রাসূলের কাছ থেকে শিখবে? জ্ঞানার্জন করবে? তাদের জন্য এই কাজটি সহজ হয়ে যায় উম্মুল মুমিনীন তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মাধ্যমে। তিনি স্ত্রীদের সাথে যে-সব মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলাপ করতেন, তার স্ত্রীগণ সেগুলো অন্য নারীদের জানিয়ে দিতেন। এভাবেই দ্বীনের জ্ঞান নারীদের মধ্যেও সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু একজন স্ত্রীর পক্ষে একা কখনোই এই দায়িত্ব পালন করা সহজ ছিল না। এ ছাড়াও, বহু স্ত্রীর মধ্যে কীভাবে সমতা রক্ষা করতে হবে এই শিক্ষা উম্মাহকে দিয়ে যাওয়াও অন্যতম একটি কারণ।'

সাজিদ কথা বলা থামিয়ে আরেক গ্লাস পানি পান করল। রমেশ আচার্য নামের লোকটি কিছুই বলছে না। বড়দা ওরফে দীনেশ আচার্য বললেন, 'রমেশ দা কিছু বলবে?'

তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, 'না।'

আমাদের হাতের সময় ফুরিয়েছে। চলে আসার জন্য আমরা উঠে দাঁড়ালাম। দুই আচার্যের সাথে হ্যান্ডশেক করে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। বড়দা আমাদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বাইরে আসামাত্র সাজিদ বলল, 'তুই যে-সাদা ফুলগুলোর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলি, সেই ফুলগুলোর নাম জানিস?'

সাজিদের কথা শুনে আমি হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার অবাক হবার কারণ হলো, আমি যখন ফুলগুলো দেখছিলাম তখন সে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে ছিল। সে কীভাবে বুঝল যে আমি তখন সাদা রঙের ফুলগুলো দেখছিলাম?

আমি যে-বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছি সেদিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সে বলল, 'ওই ফুলগুলোর নাম হলো মধুমঞ্জরি। ইংরেজরা ওই ফুলগুলোকে ডাকে 'রেংগুনকিপার' নামে। আর আসার সময় প্রকাণ্ড সাইজের মাথাওয়ালা যে-লোকটির সাথে ঝগড়া করেছিস, সে ওগুলোকে 'উইকেটকিপার' নামে ডাকে। বড়দা তাকে কত করে শেখায় এই ফুলগুলোর নাম 'রেংগুনকিপার', বেচারা তবুও ভুল করে ডাকে 'উইকেটকিপার' বলে। হা হা হা...।'

সাজিদের হাসি দেখে আমারও হাসি পায়। ফুলের নাম উইকেটকিপার! দারুণ তো!...

জান্নাতেও মদ?

সকালবেলার ক্যাম্পাস অন্যরকম সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। দোয়েল চত্বরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া ফুলগাছটির মগডাল দেখলে প্রথমেই আগুনের গোলা ভেবে যে-কেউ ভুল করতে পারে। মন্টু দার দোকানের পেছনে এঁকেবেঁকে উঠে যাওয়া অর্কিডের গাছ আর রাস্তার দু-পাশে সেনাপতির মতো দাঁড়িয়ে থাকা বকুল, সবমিলিয়ে ক্যাম্পাসটি যেন পৃথিবীর বুকেই এক টুকরো স্বর্গ।

সকালে বুক ভরে মুক্ত বাতাস গ্রহণের তাগিদে এই তল্লাটে অনেকের আগমন ঘটে থাকে। পিজি হাসপাতালের রোগী থেকে শুরু করে বিজি বিজনেসম্যান, পড়ুয়া ছাত্র থেকে শুরু করে পড়ানো শিক্ষক—সকালবেলা সবাই খুব ফুরফুরে মন নিয়ে এদিকটায় হেঁটে যায়।

আজ রবিবার। আমার আর সাজিদ, দুজনের একজনেরও ক্লাস নেই। এদিনটায় আমরা সাধারণত আড্ডা দিয়ে থাকি। খুব ভোরবেলায় সাজিদ রুম থেকে বের হয়েছে। এখনো ফেরার নামগন্ধ নেই। চোখ কচলাতে কচলাতে গতরাতে করা অ্যাসাইনমেন্টের ওপরে ফাইনাল রিভিশন দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের পাশের যে রুমে পার্থরা থাকে, সেখান থেকে জোর ভলিউমে রবীন্দ্রনাথের গান ভেসে আসছে।

খেয়াল করলাম বাইরে থেকে গানের আওয়াজ ছাড়াও কিছু কর্কশ চিৎকার আর আওয়াজের শব্দ ভেসে আসছে। কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকেই যে এই শব্দ আসছে সেটি নিশ্চিত। অ্যাসাইনমেন্ট পেপার ভাঁজ করে টেবিলে রেখে গায়ে শাল

জড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ফাগুনের এ সময়টায় ভোরবেলা মৃদুমন্দ শীত পড়ে। এই শীতে গায়ে শাল জড়ানোর দরকার পড়ে না অবশ্য; কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে লুকোনো জ্বর আর সর্দিতে কাহিল হয়ে ওঠা শরীর এই শীতকেও প্রচণ্ড রকম ভয় পাচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে গায়ে শাল তোলা। যাই হোক, রুম থেকে বেরিয়ে দূর থেকে আসা চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ লক্ষ্য করে এগোতে থাকলাম। দেখতে পেলাম, পূর্বপাশে অবস্থিত থার্ড বিল্ডিংটার নিচে ছোটখাটো একটি জটলা হয়ে গেছে। ওই বিল্ডিংয়ের সবাইকেই চিনি না আমি। কোনো একটি ব্যাপার নিয়ে তারা বেশ তর্কাতর্কি আর হট্টগোল শুরু করেছে বুঝতে পারছি।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম জটলাটার দিকে। খুব কাছে না গিয়ে নিরাপদ দূরত্বে এসে দাঁড়ালাম। কোনো একটি জায়গায় যখন সব মানুষ একসাথে কথা বলে, তখন সম্ভবত কেউই কারও কথা শুনতে পায় না। শুনতে না পেলেও মানুষগুলো অনর্গল কথা বলেই যায়। বলে আনন্দ পায়। তারা ভাবে, তাদের কথা অন্যরা খুব আগ্রহভরে শুনছে। এরকম দূরত্বে থেকে আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না আসলে ঘটনা কী।

মধ্যবয়স্ক গোছের একজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখে আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আঙ্কেল, একটু কথা বলা যাবে?'

ভদ্রলোক বেশ বিরক্ত হলেন বলে মনে হলো। বিরক্তি কোনোরকমে চেপে রেখে বললেন, 'কী কথা?'

'এখানে কী নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে?'

'গিয়া দেখলেই তো পারেন। আমারে জিগান ক্যা?'

লোকটার ত্বরিত উত্তর শুনে আমার মনের ভেতরে মিটিমিটি করে জ্বলতে থাকা সব আশার প্রদীপ যেন ধপ করেই নিভে গেল। আমার ওপরে অকারণ চটে বসার কোনো যৌক্তিক কারণ আমি খুঁজে পেলাম না। আমি বেশ ফ্যাকাশে মুখ করে বললাম, 'ধন্যবাদ।'

আমার ধন্যবাদ পেয়েও তার চেহারার মধ্যে খুব বেশি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। সম্ভবত তিনি ধরে নিয়েছেন, এই 'ধন্যবাদ' দিয়ে আমি তাকে কোনোভাবে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছি। আমার পাতা ফাঁদে পা দেবেন না এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি যে-গতিতে হেঁটে এসেছিলেন, ঠিক সেই গতিতে হেঁটে চলে গেলেন।

কিন্তু আমিও কোনোভাবেই দমে যাওয়ার পাত্র নই। এই রহস্যের সমাধান না করে তো থামছি না। ধীরে ধীরে জটলার দিকে এগিয়ে গেলাম। কাছে এসে দেখতে পেলাম এখানে এলাহি কাণ্ড! লোকজনের কথাবার্তা শুনে যা বোঝা গেল তা হলো, এই বিল্ডিংয়ের কেউ কেউ রোজ রাতে মদ খেয়ে মাতলামি শুরু করে। মাতলামির পর্যায় এমন মাত্রায় গিয়ে পৌঁছায় যে, বিল্ডিংয়ের অন্যান্য লোকজন এই ব্যাপারটি নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ। তারা নাকি দফায় দফায় ওয়ার্নিং দিয়েও এই মাতালদের দমাতে পারেননি। আজ সকালবেলাতেও নাকি এই মাতালের দলের চিৎকার-চেঁচামেচির জন্যে ফজরের সালাত পড়তে অসুবিধা হচ্ছিল কারও কারও। ধার্মিকশ্রেণির লোকেরা এই মাতালদের একটি বিহিত করার জন্যেই এখানে একত্র হয়েছে। ওদিকে মাতাল না হয়েও মাতালদের দলে যোগ দিয়েছে আরও কিছু লোক। তাদের দাবি হচ্ছে, কে মদ খাবে আর কে খাবে না এটি ব্যক্তির একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। মদ খেলে মাতলামি করবে, এটাই স্বাভাবিক। এ নিয়ে ধার্মিক লোকগুলোর এত জ্বালাপোড়া হবে কেন?

এরকম কথা বলা লোকগুলো বোধ করি নাস্তিক হয়ে থাকতে পারে। তারা ডিফেন্ড করছে মাতালগুলোকে। ধার্মিক আস্তিকগুলো এত যুক্তি-তর্ক শুনতে নারাজ। তারা চায়, হয় এরা মদখাওয়া ছাড়বে, না-হয় বিল্ডিং ছাড়বে।

এই তর্ক এরকম স্রেফ সাধারণ তর্কে স্থির থাকলে একটি কথা ছিল; কিন্তু এটি আর কোনো সাধারণ তর্কে থেমে নেই। এই তর্ক রীতিমতো 'থিওলোজিক্যাল ডিবেট' তথা ধর্মকেন্দ্রিক তর্কাতর্কিতে রূপ নিয়েছে।

নাস্তিককুলের দাবি হলো, কুরআনে নাকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাতে পুরস্কার হিশেবে মদ খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে মদখাওয়া ব্যাপারটাকে খারাপভাবে দেখা হবে কেন—এটাই এক নাস্তিকের প্রশ্ন।

এক আস্তিক বেশ জোরালো গলায় বলল, 'কখনোই নয়। কুরআনে এরকম কোনো কথা থাকতেই পারে না।'

আস্তিকটার কথা শুনে হা-হা-হা করে খেঁকিয়ে হেসে উঠল এক নাস্তিক। বলল, 'বোকা ধার্মিক। কুরআনে কী আছে সেটাও ভালোমতো জানে না। যাও, আগে নিজের ধর্মগ্রন্থ পড়ো গিয়ে।'

এভাবেই পাল্টা তর্কবিতর্ক চলছে। এরকম সিচুয়েশানগুলোতে সাজিদ থাকলে আমার বেশ মজা লাগে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কীভাবে দাবার ঘুঁটি উল্টে দিতে হয় সেটি সাজিদ খুব ভালো করেই জানে। এরকম অবস্থায় সে প্রথমে একবার গলা খাঁকারি দেবে। সামনে যদি কোনো পানির গ্লাস থাকে, সে ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি পেটে ভরে বলবে, 'শুনি তো আপনাদের প্রশ্ন।'

হঠাৎ আমার কাঁধে কারও হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি আমার পেছনে সাজিদ দাঁড়িয়ে আছে। লেব্বাবাহ! তার কথা ভাবতে-না-ভাবতেই হাজির! এত দ্রুত আলাদিনের জাদুর চেরাগে থাকা জিনটাও হাজির হতে পারে কি না সন্দেহ আছে। সাজিদ কিছু বলার আগেই প্রশ্ন করলাম, 'তুই এখানে?'

'রুমেই ফিরছিলাম। হট্টগোলের শব্দ শুনে এদিকটায় এসে দেখি তুই দাঁড়িয়ে আছিস। কী সমস্যা হয়েছে এখানে?'

মনে মনে আমি যে তাকেই খুঁজছিলাম সেটি আর খোলাসা করিনি। হট্টগোলের ব্যাপারটি পুরোটাই খুলে বললাম। সবটুকু শুনে সে বলল, 'ও আচ্ছা।' তার 'ও আচ্ছা' বলার ধরন দেখে মনে হলো যেন সে এরকম ঘটনা চারপাশে অহরহ দেখছে। এরকম ঘটনা দেখতে দেখতেই যেন সে ঘুম থেকে জাগছে আবার ঘুমিয়ে পড়ছে। তার এরকম গা-ছাড়া ভাব দেখলে রীতিমতো আমার পিত্তি জ্বলে যায়।

ধীর পায়ে হেঁটে সাজিদ জটলার মধ্যে মিশে গেল। তাকে অনুসরণ করে আমিও এগিয়ে গেলাম। এখনো বিতর্ক শেষ হয়নি। আস্তিক লোকটিকে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখা গেল। সাজিদ তার কাছে গিয়ে বলল, 'ভাই, একটু থামুন। এভাবে উত্তেজিত হলে তো চলবে না। সমস্যার সমাধান করতে হলে সবার আগে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।'

আমি তো মনে মনে 'ইয়া নাফসি' জপ শুরু করেছি। না জানি সাজিদের দার্শনিকসুলভ আলাপ শুনে লোকটি সাজিদকে আবার নাস্তিক ভাবা শুরু করে।

কিন্তু না। সে-রকম হয়নি। সাজিদের কথা শুনে আস্তিক লোকটার গলার আওয়াজ ছোট হয়ে এলো। সাজিদ আরেকবার পুরো ঘটনাটি শুনে নিল বিতর্ককারীদের কাছ থেকে। প্রথম দিকে ঝগড়ার টপিক ছিল মদ পান করে এই বিল্ডিংয়ে হট্টগোল করা যাবে কি যাবে না; কিন্তু এখন ঝগড়ার মূল টপিক এসে দাঁড়িয়েছে জান্নাতে পুরস্কার

হিশেবে কুরআন মদের কথা বলছে কি না...।

সাজিদ নাস্তিক লোকটার দিকে ফিরল। এত ঝগড়ার মধ্যেও টাকওয়ালা লোকটিকে এখনো বেশ সতেজ এবং স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। সম্ভবত আস্তিক লোকটিকে রাগিয়ে দিতে পেরে এই লোক বেশ মজা পেয়েছে।

সাজিদ বলল, 'আপনার বক্তব্য কী?'

লোকটি চোখ ঘুরিয়ে সাজিদের দিকে তাকাল। তার চাহনিতে একধরনের তাচ্ছিল্যের ভাব স্পষ্ট। ভাবখানা এমন যেন সাজিদও কোনো মাথাগরম টাইপ আস্তিক—যার ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই। বেশ গা-ছাড়া ভাব নিয়ে লোকটি বলল, 'আমাকে বলছেন?'

'জি', সাজিদ বলল।

'বলুন।'

'আপনি সম্ভবত কোনো একটি টপিক নিয়ে কথা উঠিয়েছেন, যার ফলে এখানে একটি ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছে। আমি সেই টপিকটি শুনতে চাইছি।'

মুহূর্তের মধ্যে লোকটির ভদ্র চেহারা পাল্টে তাতে বেশ রুক্ষতা এসে ভর করল। লোকটি কপাল কুঁচকে বলল, 'আপনি শোনার কে?'

সাজিদ কিছুই বলল না। লোকটি আবার বলল, 'কোত্থেকে যে এসব গণ্ডমূর্খ আস্তিকগুলো আসে রে বাবা!'

লোকটার এরকম কথা শুনে আমার মাথায় রক্ত চড়ে বসল। ইচ্ছে করছিল একটি লাঠি দিয়ে লোকটার মাথায় জোরে একটি আঘাত করি। হাতের কাছে সে রকম কিছু না পেয়ে দাঁতে দাঁত কচলে রাগ গিলে ফেললাম।

সাজিদ বলল, 'এক্সকিউজ মি। আমি আসলে বেশ কৌতূহল থেকেই আপনার কাছে জানতে চেয়েছি ব্যাপারটি। এই টপিকটি নিয়ে আমার নিজেরও বেশ আগ্রহ আছে। আমি ধর্মতত্ত্বের একজন ছাত্র।'

সাজিদের কথা শুনে লোকটার কপাল কুঁচকানোর মাত্রা আরও বেড়ে গেল। বলল, ‘আপনি ধর্মতত্ত্বের ছাত্র হলেই কি কুরআনের কথা পাল্টে যাবে?’

‘তা অবশ্য যাবে না। তবে ভুল ব্যাখ্যা পাল্টে যেতে পারে।’

‘হোয়্যাট ডু ইউ মিন বাই ভুল ব্যাখ্যা?’, লোকটি তেড়ে আসার ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

‘এই যে, আপনি বলছেন কুরআন নাকি জান্নাতে পুরস্কার হিশেবে মদ খাওয়ানোর কথা বলছে।’

লোকটি উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইল, ‘কুরআনে কি এই কথা নেই?’

‘হ্যাঁ আছে।’

‘হা-হা-হা। তাহলে? আমি ভুল কিছু কী বললাম?’

সাজিদ বলল, ‘কথা সত্য তবে মতলব খারাপ।’

সাজিদের এই কথা সম্ভবত তার গায়ে অপমানের মতো লাগল। বলল, ‘মতলব খারাপ মানে?’

সাজিদ মুচকি হাসি দিয়ে বলল, ‘এই তো, আলোচনায় চলে এসেছেন। আপনার মতলব কীভাবে খারাপ সেটি জানার জন্যই তো আলাপ দরকার। এতক্ষণ তো আপনি আলাপেই আসতে চাচ্ছিলেন না।’

লোকটার চোখের পলক পড়ছে না। তার সব দৃষ্টিশক্তি সাজিদের দিকে এসে নিবন্ধ হয়ে আছে। মানুষ ভালোবেসে অপলক নয়নে তাকায় বলে জানতাম। রেগে থাকলেও কি মানুষ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে?

সাজিদ এতক্ষণে গলা খাঁকারি দিল। বলল, ‘আচ্ছা, আলোচনায় আসি। আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন যে, কুরআনের ঠিক কোন আয়াতে জান্নাতের পুরস্কার হিশেবে মদের কথা বলা আছে?’

লোকটি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উত্তর দিল, ‘আমি তো সেটি মুখস্থ করে বসে নেই, তাই না?’

'তা অবশ্য ঠিক। কোনো সমস্যা নেই। আমি কি বলব কোন আয়াতে এই ব্যাপারে বলা আছে?'

লোকটি কিছুই বলল না। নীরবতাকে সম্মতির লক্ষণ হিশেবে ধরে নিয়ে সাজিদ আবার বলতে শুরু করল, 'কুরআনের সূরা মুহাম্মাদের পনেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাতে পুরস্কার হিশেবে বান্দাদের মদ খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

সাজিদের কথা শুনে এতক্ষণ চুপ মেরে থাকা আস্তিক লোকটি বলে উঠল, 'অ্যাঁ! আপনার কি ভাই মাথা খারাপ নাকি? আপনিও কি এই ব্যাটার দলের?'

সাজিদ সেদিকে কর্ণপাত করল না। কোনো একটি জবাবের আশায় সে নাস্তিকটার দিকে তাকিয়ে আছে। নাস্তিকটি বলল, 'তো? আমি তো এতক্ষণ সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম। মাথামোটা আস্তিকগুলো তো আমার কথা বিশ্বাসই করতে চাইছিল না। হা-হা-হা।'

'কিন্তু...।'

'কিন্তু আবার কী?', জানতে চাইল নাস্তিকটা।

'এখানে একটি ব্যাপার আপনাকে বুঝতে হবে। এই দুনিয়া হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, আর জান্নাত-জাহান্নাম, আখিরাত এগুলো হচ্ছে ইমম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের বিষয়। দুনিয়ার কোনো বিষয়ের সাথে আখিরাতের কোনো বিষয়ের তুলনা চলে না। যেমন : দুনিয়ার গাছ দেখতে যে-রকম, আখিরাতের গাছও যে দেখতে ঠিক সে-রকম হবে, এমনটি নয়। আবার দুনিয়ার দুধের রং সাদা। জান্নাতের দুধের রংও সাদা হবে, এমনটি নাও হতে পারে। দুনিয়ার নদীর সাথে আখিরাতের নদীর, দুনিয়ার সাগরের সাথে আখিরাতের সাগরের, দুনিয়ার পাহাড়ের সাথে আখিরাতের পাহাড়ের কোনো তুলনাই হতে পারে না। আমরা আসলে জানি না সেগুলো কেমন হবে, কীরকম হবে...।'

নাস্তিকটি খলখল করে হেসে উঠল। এতক্ষণে খেয়াল করলাম হাসলে এই লোকটার সব ক'টি দাঁত দেখা যায়। বলল, 'দুনিয়ার জিনিসের সাথে আখিরাতের জিনিসের তুলনা না হলে কুরআনে গাছ, লতা-পাতা, নদী-সাগর-পাহাড় এগুলোর উদাহরণ টানা হলো কেন?'

সাজিদ মুচকি হেসে বলল, 'সুন্দর প্রশ্ন। আখিরাতের কোনো জিনিসের সাথে দুনিয়ার জিনিসের তুলনা না হলে কুরআন কেন এই জিনিসগুলোর উদাহরণ টেনেছে, তাই না?'

'হুম।'

'আপনাকে এবার একটি গল্প শোনাই। গল্পটি হচ্ছে তিন অন্ধের হাতি দর্শনের গল্প। একবার তিন অন্ধ মিলে একটি হাতি দেখতে আসলো। যেহেতু তারা চোখে দেখে না, তাই স্পর্শ করেই তাদের অনুমান করতে হবে হাতি আসলে কীরকম। প্রথম অন্ধ হাতির গায়ে হাত বুলিয়ে অন্যদের বলতে লাগল, 'শোনো, হাতি হচ্ছে গাছের মোটা গুঁড়ির মতো।' দ্বিতীয় অন্ধ হাতির পা স্পর্শ করে বলল, 'না না। হাতি হচ্ছে খাম্বার মতো।' তৃতীয় অন্ধ হাতির কান স্পর্শ করে বলল, 'ধুর বোকা, তোমরা দুজনেই ভুল। আসলে হাতি হচ্ছে কুলার মতো।' দেখুন, হাতি দেখতে-না গাছের গুঁড়ির মতো, না দালানের খাম্বা কিংবা কুলার মতো। হাতি এসবের কিছুর মতোই নয়। হাতি আসলে হাতির মতো; কিন্তু প্রথম অন্ধের গাছের গুঁড়ি সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে বলেই সে হাতির গায়ে হাত বুলিয়ে তৎক্ষণাৎ বলতে পেরেছে হাতি হলো গাছের গুঁড়ির মতো। দ্বিতীয় অন্ধের দালানের খাম্বা সম্পর্কে ধারণা আছে বলেই সে হাতির পা ধরে বলতে পেরেছে হাতি হলো খাম্বার মতো। তৃতীয় অন্ধের কুলা সম্পর্কে ধারণা আছে বলেই সে হাতির কান স্পর্শ করে বলতে পেরেছে হাতি হলো কুলার মতো। তাদের ধারণা অনুযায়ীই তারা কল্পনা করে নিয়েছে হাতি আসলে কেমন। এখন কুরআন জান্নাত-জাহান্নামের উপমা দেওয়ার সময় এমন-সব উপমা, উদাহরণ আর শব্দচয়ন করেছে, যার সাথে মানুষ পরিচিত। যাতে করে মানুষ সহজভাবে বুঝে নিতে পারে—আসলে ব্যাপারটি কেমন বা কীরকম হতে পারে। যদি এমন-সব উপমা বা উদাহরণ কুরআন ব্যবহার করত, যা মানুষ কোনোদিন দেখেনি, শোনেনি, তাহলে মানুষ সহজেই উপদেশ গ্রহণ করতে পারত না। এ জন্যেই কুরআন গাছ, নদী, সাগর, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি জিনিসের উপমা দিলেও এই ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হবে যে, এগুলো দুনিয়ায় থাকা গাছ, নদী, সাগর, পাহাড়-পর্বতের মতো নয়। একইভাবে, কুরআন যখন জান্নাতে মদের কথা বলে তখন আমাদের বুঝতে হবে যে—এই মদ দুনিয়ার মদের মতো নয়।'

সাজিদ থামল। লোকটি বলল, 'কিন্তু মদ তো মদই, তাই না?'

সাজিদ বলল, 'না, সবসময় তা নয়।'

লোকটি কপাল কুঁচকে বলল, 'মানে কী?'

'আগে আপনি বলুন মদ কীরকম?'

পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে সাজিদের আলাপ শুনছিল মাতালদের একজন। অবশ্য তার মাতলামির ভাবটি এখন কমে এসেছে। সে বলে উঠল, 'মদ হচ্ছে খুবই দুর্গন্ধময়।'

'আর কিছু?', সাজিদ জানতে চাইল।

মাতাল লোকটি চুপ মেরে গেল। সম্ভবত মদ সম্পর্কে সে এরচেয়ে বেশি আর কিছু জানে না। সাজিদ বলতে লাগল, 'আমি বলছি। এটি বিজ্ঞানসম্মত যে, মদ শরীরের জন্য ক্ষতিকর। অ্যালকোহলিক এই জিনিসটি মানুষের সেন্স পাল্টে দেয়। মদপানকারীরা মুহূর্তের মধ্যে মাতাল হয়ে পড়ে। আশপাশের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা এমন-সব কাণ্ড ঘটিয়ে বসে, যা সাধারণ অবস্থায় তারা কল্পনাও করতে পারে না। অতিরিক্ত মদপানকারীর মৃত্যুও ঘটতে পারে।'

'হুম। সেটি তো বুঝলাম', বলল নাস্তিক লোকটা। 'এতে কি প্রমাণ হয় সব মদ, মদ না?'

'হয়।'

'কীভাবে?'

'কুরআনে উল্লেখিত মদ আর আপনার দুনিয়ার মদ কিন্তু একই ব্যাপার নয়। আপনার দুনিয়ার মদপানে মানুষের সেন্স, বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। শরীরের ক্ষতি করে। মোটাদাগে, এটার ক্ষতির দিক এত বেশিই যে, সেগুলো বর্ণানাতীত; কিন্তু অপরদিকে কুরআনে যে-মদের কথা বলা হয়েছে তা নির্মল, বিশুদ্ধ, সুগন্ধময়। তাতে কোনো অ্যালকোহল নেই। ক্ষতিকর কোনো উপাদান নেই, যা পানকারীর বিবেক-বুদ্ধির লোপ পাইয়ে দেবে। তা বিস্বাদ নয়, সুস্বাদু।'

সাজিদের কথা শুনে মাতাল লোকটি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এরকম অদ্ভুত মদের কথা শুনে সে মনে হয় আকাশ থেকে পড়ল। নাস্তিক লোকটি কিছু একটা বলতে গিয়েও ঢোক গিলে নিল। তাকে উদ্দেশ্য করে সাজিদ

আবার বলে উঠল, 'আপনি সম্ভবত বলতে চাচ্ছিলেন—আমার এই কথার পক্ষে যুক্তি কী, তাই না? ফাইন। আমার কথার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর কথাই। আল্লাহ নিজেই কুরআনে বলেছেন, জান্নাতে যে-মদ তথা পানীয় পরিবেশন করা হবে তা হবে কোমল, সুপেয়, সুগন্ধী। দুনিয়ার মদের মতো তা কোনো পানকারীর বিবেক লোপ করবে না।'

আমি জানতে চাইলাম, 'কুরআনে এ ব্যাপারে ক্লিয়ার-কাট কথা আছে?'

সাজিদ বলল, 'হ্যাঁ।'

'কোন সূরায়?'

সাজিদ তখন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সম্ভবত সূরা ওয়াকিয়ার মধ্যে আছে।'

'কী বলা আছে?'

'জান্নাতে যে-পানীয় পরিবেশন করা হবে তা কীরকম হবে সে-ব্যাপারে খুব পরিষ্কার ব্যাখ্যা।'

সাথে সাথে আমি স্মার্টফোন বের করে আল কুরআন অ্যাপস থেকে সূরা ওয়াকিয়া বের করলাম। সাজিদ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি অ্যাপসের সার্চবারে 'পানীয়' লিখে সার্চ দিতেই চলে এলো একটি আয়াত। কুরআন জান্নাতীদের জীবন কেমন হবে সে-সম্পর্কে বলছে এভাবে, 'সেখানে তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চির কিশোরেরা। তাদের (কিশোরদের) হাতে থাকবে পানির পাত্র, কেটলি আর ঝরনা থেকে প্রবাহিত স্বচ্ছ পানীয়। এগুলো পান করলে মাথা ঘোরাবে না, জ্ঞানও লোপ পাবে না।'[১]

আমি থামতেই সাজিদ বলে উঠল, 'বেশ স্পষ্ট। কুরআন বিভিন্ন জায়গায় জান্নাতীদের পোশাক, খাবার, পানীয় ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেছে। যেমন, সূরা মুহাম্মাদে আছে একধরনের মদ, দুধ আর ঝরনার পানির কথা। আবার সূরা ওয়াকিয়ার মধ্যেও আছে বিভিন্ন পানীয়ের কথা। সূরা ওয়াকিয়াতে খুব স্পষ্টভাবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, জান্নাতের পানীয় কেমন হবে। খেলেই মাথা ঘুরাবে? সেন্স হারাতে হবে? বিবেক-বুদ্ধি

---

১ সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ১৭-১৯

লোপ পাবে? মাতলামি শুরু হবে? না। কুরআন বলছে, 'এগুলো পান করলে মাথা ঘুরাবে না, জ্ঞানও লোপ পাবে না।' দুনিয়ার দুধ খেলে কি কারও মাথা ঘুরায়? জ্ঞান লোপ পায়? পায় না। তাহলে দুনিয়ার যে-পানীয় খেলে মাথা ঘুরায়, জ্ঞান লোপ পায় সেটি হলো মদ; কিন্তু জান্নাতের মদ যে এরকম নয়, ভিন্ন কিছু, সেটি একদম পরিষ্কার করেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এগুলো পান করলে মাথা ঘুরাবে না, জ্ঞান লোপ পাবে না। এরচেয়ে ক্লিয়ার কথা আর কী হতে পারে?'

নাস্তিক লোকটি কিছুই বলল না। সাজিদ বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই এখন বুঝে গেছেন যে, জান্নাতে পরিবেশিত মদ বলতে আসলে কীরকম মদ বলা হয়েছে।'

এতক্ষণ চুপ মেরে থাকা আস্তিক লোকটি এবার কথা বলে উঠল। বলল, 'ঠিক কইছিলেন ভাইজান। এদের আসলে মতলব খারাপ।'

জটলাটায় শুরুতে যে-রকম চিৎকার-চ্যাঁচামেচি ছিল, এখন তা আর নেই। সবাই এতক্ষণ সাজিদের কথা শুনছিল মনোযোগ দিয়ে। সাজিদ চলে আসার জন্যে পা বাড়াতেই নাস্তিক লোকটি বলে উঠল, 'সব বুঝলাম; কিন্তু তাই বলে পানীয়ের কথা বোঝাতে মদের উপমা কেন দিতে হবে, হুম?'

সাজিদ ঘাড় ফিরে তাকাল। নাস্তিক লোকটি তার দিকে আগের মতোই অপলক তাকিয়ে আছে। অপলক তাকিয়ে থাকা লোকটার সম্ভবত মুদ্রাদোষ। সাজিদ বলল, 'একজন বিখ্যাত কবি তার কবিতায় লিখেছেন, 'তোমার মাতাল করা চোখের দিকে তাকিয়ে আমি পার করে দিতে পারি মহাকালের পথ।' আচ্ছা, 'মাতাল করা চোখ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?'

লোকটি বলল, 'অসম্ভব সুন্দর চোখ।'

'মাতাল' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে জানেন? 'মদ' থেকে। মদ থেকে আরও অনেক শব্দ এসেছে। যেমন, 'মাদকতাময়।' কবিতায়, সাহিত্যে এসব অহরহ ব্যবহার করা হয়। মাতাল করা চোখ মানে অসম্ভব সুন্দর চোখ। মাদকতাময় সুবাস মানে হলো পাগল করে দেওয়া গন্ধ। যা নাকে লাগলেই নেশা ধরে যায়। এসব শব্দ এসেছে 'মদ' শব্দ থেকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোনো বস্তুর নাম হিশেবে, গুণ হিশেবে 'মদ' 'মাতাল' কিংবা 'মাদকতাময়' শব্দগুলো কোনো খারাপ শব্দ না। অ্যালকোহলিক কোনো পানীয়কে যখন 'মদ' বলা হবে তখন সেটি নেগেটিভ

সেন্সে ঠিক আছে; কিন্তু কেউ যখন পজিটিভ সেন্সে বলবে, 'এই ফুলের সুবাসে এক অদ্ভুত মাদকতা আছে', তখন কিন্তু এটি বোঝায় না যে, ওই ফুলের গন্ধে মদের গন্ধ বা মদের উপাদান আছে। আপনাকে বুঝতে হবে কুরআন 'মদ' হিশেবে কীরকম পানীয়ের কথা বলেছে। কুরআন বলছে, '(সেগুলো হবে) নির্মল পানীয়। সুপেয় এবং সুস্বাদু।'

সাজিদ হাঁটা শুরু করেছে। সে খুব ধীরপায়ে হাঁটে। তাকে বললাম, 'ব্যাটাকে বেশ ভালো জব্দ করেছিস।'

সাজিদ আমার দিকে উদাস নয়নে তাকাল। আমার এই কমপ্লিমেন্ট সে গায়ে মাখল না। অবশ্য সে প্রশংসার কোনো কিছুই গায়ে মাখে না।

গল্পে জল্পে ডারউইনিজম

সৌরভ। সোহরাওয়ার্দী হলে নতুন উঠেছে। সারা দিন আমার পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাকে। তার একটি ব্যাপার আমার খুব চোখে পড়ে। সে যখন আমাকে 'ভাইয়া' বলে ডাকে, তখন তার দুই গালে খুব সুন্দর টোল পড়ে। তার গালে টোল-পড়া দেখে আমার হুমায়ুন আজাদের বিখ্যাত কবিতার দুটো লাইন মনে পড়ে যায়। কবি লিখেছিলেন—

আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে মারা যাব
শিশুর গালের একটি টোলের জন্যে

সৌরভ অবশ্য শিশু নয়, সদ্য যৌবনে পা দেওয়া তাগড়া যুবক। তবুও তার গালে টোল পড়া দেখে তাকে শিশুদের মতোই দেখায়।

তিন দিন ধরে সে আমার কাছে বায়না ধরেছে। তার খুব ইচ্ছা সে সাজিদকে দেখবে। আমার কাছে সাজিদের এত এত গল্প শুনে সে নাকি সাজিদের বিশাল বড় ফ্যান হয়ে গেছে। সেদিন ভোরবেলায় দেখি আমার রুমের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। বলা-কওয়া ছাড়া তার এমন আগমনে বিস্মিত হয়ে বললাম, 'এত সকাল সকাল আমার কাছে?'

সে বলল, 'তোমার কাছে আসিনি তো। সাজিদ ভাইয়ার কাছে এসেছি।'

আমি বেশ অবাক হওয়ার মতো করে বললাম, 'সাজিদের কাছে যে এসেছিস, সাজিদ জানে?'

সে মুখ কালো করে বলল, 'তা কী করে জানবে? সাজিদ ভাইয়াকে তো আমি চিনি না। ভাইয়াও আমাকে চেনে না।'

আমি কঠিন চেহারায় বললাম, 'তাহলে বললি যে, সাজিদের কাছে এসেছিস?'

সে বলল, 'ওমা! তুমিই তো বলেছিলে তোমরা একই রুমে থাকো। ভাবলাম হঠাৎ করেই চলে আসি। তোমাকে আর সাজিদ ভাইয়াকে, দুজনকেই চমকে দিই।'

সৌরভের চমকে দেওয়ার কথা শুনে আমার নিজেরই চমকে যাওয়া উচিত। সাজিদকে ভালো করে চিনলে সে সাজিদকে চমকে দেওয়ার কথা মুখেই আনত না। যে-ছেলের পাশে বোমা ফাটলেও টনক নড়ে না, সৌরভকে দেখে সে যে চমকে যাবে, এই দৃশ্য ভাবতেই আমার হেসে কুটিকুটি হতে মন চাচ্ছে।

সৌরভকে বললাম, 'তোর টাইমিংটা ভুল ছিল রে। এক সপ্তাহ হলো সাজিদ নেই। বাড়িতে গেছে।'

সৌরভ হতাশ কণ্ঠে বলল, 'ওহ।'

'সমস্যা নেই। আমি তো আছি। বল তোর কী কী জানা লাগবে? সাজিদের চেয়ে আমি ভালো উত্তর দিয়ে থাকি আজকাল।'

সৌরভ হেসে উঠে বলল, 'ফাজলামো কোরো না তো। সাজিদ ভাইয়াকে সেই কবে থেকেই দেখতে চাচ্ছি।'

'আচ্ছা, ফাজলামো বাদ। ভেতরে এসে বস। একটি সারপ্রাইজ আছে তোর জন্যে।'

সারপ্রাইজের কথা শুনে সৌরভের চোখমুখ ঝলমল করে উঠল। সে বলল, 'সাজিদ ভাইয়া ভেতরেই আছে, তাই না?'

'না তো।'

তার চেহারার ঝলমলে ভাবটি মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল। বলল, 'তাহলে সারপ্রাইজটি কী?'

উঠতি ছেলেপিলেদের এই এক সমস্যা। ধৈর্য থাকে না মোটেও। খানিকটা কর্কশ গলায় বললাম, ‘তোকে যখন বলেছি সারপ্রাইজ আছে, তখন তো কিছু একটি আছেই, তাই না? এত প্রশ্ন করিস কেন?’

সৌরভ বেশ লজ্জিত চেহারায় বলল, ‘সরি ভাইয়া।’

‘ভাইয়া’ বলতে গিয়ে বেচারার গালে টোল-পড়া দেখে আমি হেসে দিলাম। বললাম, ‘হয়েছে। এবার ভেতরে আয়।’

সৌরভ ভেতরে এসে বসল। ছেলেটি বেশ ভদ্র। কম কথা বলে। কিছু বললে মনোযোগ দিয়ে শোনে। দ্বিমতের জায়গাগুলো খুব ধীরে-সুস্থে তুলে ধরে।

আমি তাকে বললাম, ‘চা খাবি, সৌরভ?’

সে মাথা নেড়ে বলল খাবে না। নিজের জন্যে এক কাপ চা করে নিয়ে আমি চেয়ারে এসে বসলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে, সাজিদের বুক শেলফটি দেখিয়ে বললাম, ‘এটি হচ্ছে আমাদের বিখ্যাত মি. আইনস্টাইনের বুক শেলফ।’

সৌরভ আমার দিকে বেশ অদ্ভুতভাবে তাকাল। বলল, ‘আইনস্টাইনের বুক শেলফ মানে?’

কোনা-চোখে সৌরভের দিকে তাকালাম। তার চোখেমুখে বিস্ময়ের রেশ ফুটে উঠেছে। বুঝতে পারলাম সাজিদের আইনস্টাইন হয়ে ওঠার গল্পটি তার কাছে করা হয়নি। এ জন্যেই বেচারা চমকে গেছে। বললাম, ‘সে এক লঙ্কা-কাহিনি। অন্যদিন করা যাবে।’

হালকা নীরবতার পরে সৌরভ বলল, ‘কী সারপ্রাইজ সেটি তো বললে না?’

আরে তাই তো! ওকে তো একটি সারপ্রাইজ দেব বলেছিলাম; কিন্তু কী যে দিই! এদিক-সেদিক তাকাতেই আমার চোখ গিয়ে আটকালো সাজিদের ড্রয়ারের দিকে। ইউরেকা! এই ড্রয়ারেই তো তার বিখ্যাত ডায়েরিটি থাকে। মান্ধাতা আমলের সেই ডায়েরি...।

উঠে গিয়ে তার ড্রয়ার খুলে ডায়েরিটি বের করলাম। সৌরভের হাতে দিয়ে বললাম, ‘এইটাই হলো সারপ্রাইজ!’

সে চোখ বড় বড় করে ডায়েরিটির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এটি তো একটি ডায়েরি মনে হচ্ছে।’

'হ্যাঁ। ডায়েরিই তো।'

'এটি দিয়ে আমি কী করব?'

'পড়বি।'

'তোমার ডায়েরি পড়ে আমি কী করব?'

'ধুর! এটি আমার ডায়েরি না। এটি সাজিদের ডায়েরি। খুব বিখ্যাত ডায়েরি আমার মতে।'

ডায়েরিটি সাজিদের এই কথা শুনে ওর মুখ ঝলমল করে উঠল। পরক্ষণেই বলল, 'কিন্তু সাজিদ ভাইয়ার ডায়েরি এভাবে পড়া কি ঠিক? তিনি যদি কিছু মনে করেন?'

সৌরভের ব্যবহারের মতো তার কমন-সেন্সটাও ভারি চমৎকার। অন্যের সামান্য ডায়েরি পড়ার ব্যাপারেও সে কতকিছু চিন্তা করে। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এরকম কমন-সেন্সের বড়ই অভাব। আমি বললাম, 'শোন, এই ডায়েরিটি তার বিভিন্ন ভাবনা, ভ্রমণ-কাহিনি, অভিজ্ঞতার লেখাজোখাতে ঠাসা। সাজিদের এই ডায়েরি পড়ার অনুমতি আমার আছে। আমি তোকে অনুমতি দিলাম। তুই নিশ্চিন্তে পড়তে পারিস। মন চাইলে পড়। আমি হালকা পড়াশোনা করে নিই।'

সৌরভ ডায়েরির পাতা উল্টে পড়তে লাগল। খেয়াল করলাম, সে ডায়েরির একেবারে শেষদিক থেকে শুরু করেছে। ডায়েরির পাতায় বড় বড় করে একটি শিরোনাম লেখা, 'গল্পে জল্পে ডারউইনিজম।' সৌরভ খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করল...

'ডারউইন হলেন বিবর্তনবাদের জনক। পৃথিবীতে সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণী এসেছে একটি এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে, এই তত্ত্বকে জনপ্রিয় করার নেপথ্যনায়ক হলেন এই ডারউইন। তার ব্যাপারে বিভিন্ন মহল থেকে নানান রকম গল্প, ঘটনা জানা যায়; কিন্তু আজকে আমি ডারউইন তথা তার তত্ত্বের যে-দিকটি লিখতে যাচ্ছি, সেটি একটি বিধ্বংসী দিক। এই দিকটার কথা খুব কম বিবর্তনবাদী জানে অথবা জানলেও স্বীকার করে না।

প্রকৃতিতে প্রাণীদের টিকে থাকার ব্যাপারে যে-তত্ত্ব ডারউইন প্রস্তাব করেছিল, সেটি ছিল 'ন্যাচারাল সিলেকশান।' অর্থাৎ প্রকৃতিই বেছে নেবে দিনশেষে প্রকৃতিতে কে টিকবে আর কে বিলুপ্ত হবে। ডারউইন তার বিখ্যাত বই, যেটিকে বিবর্তনবাদের

'বাইবেল' বলা হয়, সেটির নামও রাখেন এটিকে মূল বিষয় ধরে। বইটির নাম Origin of species : By means of natural selection. বইটির নাম থেকেই বইটির বিষয়বস্তু সহজে অনুমেয়। কীভাবে প্রকৃতির বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাণীর উদ্ভব হয়। বলা বাহুল্য, এই 'ন্যাচারাল সিলেকশান'-কে অনেকে 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট' হিশেবেও উল্লেখ করে থাকে। সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট মানে হলো 'যোগ্যতমের টিকে থাকার লড়াই।' সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্টের মূল কথা হলো, 'প্রকৃতিতে একটি অবিরাম সংগ্রাম চলছে। এই সংগ্রাম হলো টিকে থাকার সংগ্রাম। দিনশেষে প্রকৃতিতে তারাই টিকে থাকবে, যারা যোগ্য। অযোগ্য এবং দুর্বলেরা বিলুপ্ত হবে।'

আপাতদৃষ্টিতে এই কথাগুলোকে 'বৈজ্ঞানিক' কথাবার্তা মনে হলেও এই কথাগুলো দ্বারা উৎসাহিত হয়ে মানব-ইতিহাসে ঘটে গেছে এমন কিছু ঘটনা, যার দায় ডারউইনিজম কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।

সৌরভ খুব অবাক হলো। বায়োলজির একজন ছাত্র হিশেবে তাকে ডারউইনিজম পড়তে হয়। পড়তে হয় ন্যাচারাল সিলেকশানের কথা, এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের আবির্ভাবের ব্যাপারেও তাকে পড়াশোনা করতে হয়। সে জানে এই থিওরিটি বিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত একটি থিওরি। এই থিওরির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীমহল থেকে নানান ধরনের ক্রিটিসিজম আসলেও সে সম্পর্কে খুব-একটা কনসার্ন নন অ্যাকাডেমিক সাইন্সের হর্তাকর্তারা। কোনো এক অদৃশ্য কারণে তারা মাইকেল বেহে, মাইকেল ডেন্টন, জোনাথন ওয়েলস, ডগলাস এক্স, স্টিফেন মায়ারসহ আরও অনেক বিজ্ঞানীর বিবর্তনের বিরুদ্ধে অ্যাকাডেমিক কাজকে পাত্তা দেন না। সৌরভ কারও কারও কাছে শুনেছে, পশ্চিমা বস্তুবাদী মহল নাকি পুরোটাই টিকে আছে এই বিবর্তনবাদের ওপর ভর করে। বিবর্তনবাদ ভেঙে পড়লে তাদের সব পরিকল্পনা মুহূর্তেই ভেস্তে যাবে আর পৃথিবী ধর্মহীন করার যে-চক্রান্ত, সেটি নস্যাৎ হয়ে পড়বে। এ জন্যেই বর্তমান বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়া বস্তুবাদীরা বিজ্ঞানের অন্দরমহলে কখনোই স্রষ্টাকে ঢুকতে দেবে না। ধর্মহীন পৃথিবী গড়তে একমাত্র বিবর্তনবাদই হলো তাদের তুরুপের তাস; কিন্তু এই ডায়েরিতে এমন কী লেখা আছে, যা সম্পর্কে সৌরভ জানে না? বেড়ে গেল তার কৌতূহলের মাত্রা। সে পরের পৃষ্ঠা উল্টাল। আবারও গভীর মনোযোগের সাথে পড়তে লাগল সে।

'হিটলারের ঘটনা আমরা সকলেই জানি। প্রায় ষাট লক্ষ ইহুদী খুন করার মাধ্যমে সে পৃথিবী থেকে ইহুদী-জাতিকে বিলুপ্ত করে দিতে চেয়েছিল। নিঃসন্দেহে, এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বোরোচিত ঘটনাগুলোর অন্যতম। ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও হিটলার হয়ে ওঠে একজন বিধ্বংসী নাস্তিক। তার দৃষ্টিতে ইহুদীরা ছিল নিচু জাত, ম্লেচ্ছ। যারা ম্লেচ্ছ, তাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার থাকতে পারে না—এটাই ছিল হিটলারের চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারার বীজ কোথায় প্রোথিত আমরা কি তা জানি? এই চিন্তাধারার বীজ প্রোথিত ছিল ডারউইনের সেই 'Natural Selection' থিওরিতে। হিটলার তার Mein Kampf তথা My Struggle নামের আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'If nature doesn't wish that weaker individuals should mate with the stronger, she wishes even less that a superior race should intermingle with an inferior one; because in such cases all her efforts, throughout hundreds of thousands of years, to establish an evolutionary higher stage of being, may thus be rendered futile.

But, such a preservation goes hand-in-hand with the inexorable law that it is the strongest and the best who must triumph and that they have right to endure. he who would live, must fight. he who doesn't wish to fight in this world, where permanent struggle is the law of life, hasn't the right to exist.'[১]

হিটলারের আত্মজীবনীর এই কথাগুলো খুব মনোযোগের সাথে যদি আমরা খেয়াল করি, তাহলে দেখব যে—এখানে ঠিক সেই কথাগুলোই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যা আমাদের চার্লস ডারউইনের 'ন্যাচারাল সিলেকশান' শেখায়। হিটলার বলেছে 'If nature doesn't wish'. এখানে 'Nature' বলতে হিটলার কী বুঝিয়েছে? চার্লস ডারউইনের সেই ন্যাচারাল সিলেকশান নয়তো? হিটলার খুব স্পষ্ট করেই দুটি ধারার কথা বলেছেন। একটি হলো Superior race, অন্যটি হলো Inferior race. অর্থাৎ সবল আর দুর্বলের মধ্যে একটি সংঘাত, একটি লড়াই যে প্রকৃতিতে বলবৎ, সেটি হিটলার খুব স্পষ্ট করেই লিখেছেন। ঠিক একই কথাগুলো আমরা 'ন্যাচারাল সিলেকশান' তথা প্রকৃতির বাছাইকরণ পদ্ধতির মধ্যেও দেখতে পাই।

---

১ *Mein Kamp*, Hitler, Page : 239-240

হিটলার আরও লিখেছেন, 'It is the strongest and the best who must triumph and that they have right to endure.' হিটলার বলতে চেয়েছেন সবলরাই প্রকৃতিতে টিকে থাকবে এবং এটাই হওয়া উচিত। অন্যদিকে, দুর্বলদের ক্ষেত্রে কী হবে সে ব্যাপারে বলতে গিয়ে হিটলার লিখেছেন 'He who doesn't wish to fight in this world, where permanent struggle is the law of life, hasn't the right to exist'.

খুবই স্পষ্ট কথা। হিটলার বলেছে, 'সংগ্রামই যেখানে law of life, সেখানে যারা এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে না, তাদের প্রকৃতিতে টিকে থাকার কোনো অধিকার নেই।'

হিটলারের উদ্ধৃত কথাগুলো ডারউইনের 'ন্যাচারাল সিলেকশানের' সাথে খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমনকি, হিটলার 'Evolutionary higher stage' এর কথাও উল্লেখ করেছেন।

হিটলার ভাবত ইহুদীরা যেহেতু ম্লেচ্ছ এবং প্রকৃতিতে সংগ্রাম করে টিকে থাকার যোগ্য নয়, তাই সে প্রায় ষাট লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করে বসে।

সৌরভ খুব অবাক হলো। সে এতদিন ভাবত হিটলার একজন গোঁড়া খ্রিষ্টান হয়ে পড়েছিল, যার কারণে সে ইহুদীদের প্রতি চরম বিদ্বেষী হয়ে ওঠে; কিন্তু ঘটনার পরম্পরা যে এত গভীরে সে আসলে কখনো ভাবতেও পারেনি। সৌরভ ভাবল, 'আচ্ছা, হিটলার কি সত্যিই ডারউইনিয়ান এভুলুশান পড়েই এতদূর এগিয়েছে?'

সে ডায়েরিটার পরের পৃষ্ঠা উল্টাল। পরের পাতাগুলোও বেশ ভর্তি। সে খুব মনোযোগ দিয়ে আবার পড়া শুরু করে দেয় :

'এখানে কেবল হিটলারের ঘটনা দিয়ে ইতি টেনে দিলে ব্যাপারটির প্রতি অন্যায় করা হবে। শুধু হিটলারকেই নয়, ডারউইন প্রভাব ফেলেছিলেন আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির ওপরেও। এই তালিকায় আছে কার্ল মার্ক্স, লেলিন এবং স্ট্যালিন।

কার্ল মার্ক্সকে সমাজতন্ত্রের জনক হিশেবে গণ্য করা হয়। সমাজতন্ত্র হিশেবে আমাদের যা বলা হয় বা যা শেখানো হয় তা হলো, সমাজতন্ত্র সমাজের শ্রেণি-বৈষম্য নিয়ে কাজ করে। আদতে, এখানেও একটি শুভঙ্করের ফাঁকি রয়েছে। সমাজতন্ত্রের আগাগোড়াজুড়ে রয়েছে ডারউইনিজম। আর ডারউইনিজম সম্পর্কিত নাস্তিকতার সাথে। সুতরাং,

সমাজতন্ত্রকে বলতে গেলে নাস্তিকতার প্রতিরূপ হিশেবে কল্পনা করা যায়।

যাই হোক, কার্ল মার্ক্সের সাথে ডারউইনিজমের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় আসা যাক। মূলত, কমিউনিজম তথা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হলেন দুজন। কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। কমিউনিজমের ওপরে কার্ল মার্ক্সের লিখিত বিখ্যাত একটি বই আছে। এটিকে সমাজতন্ত্রের 'বাইবেল' বলা যেতে পারে। বইটির নাম Das Capital. খুবই মজার ব্যাপার হচ্ছে, কার্ল মার্ক্স নিজে এই বইটি উৎসর্গ করেছিলেন বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইনকে। ডারউইনকে দুজনে এত বেশিই পরিমাণে পছন্দ করতেন যে, ডারউইনের প্রথম বই 'Origin of species' বের হলে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এক চিঠিতে কার্ল মার্ক্সকে লেখেন, 'Darwin, whom I am just now reading, is splendid'.[১]

এঙ্গেলসের চিঠির প্রত্যুত্তরে মার্ক্স লিখেছেন, 'This is the book which contains the basis of natural history of our view.'[২]

মার্ক্স বলেছেন যে, তারা ন্যাচারাল হিস্ট্রি সম্পর্কে যে-ধারণা পোষণ করে থাকে, সেটার পূর্ণ প্রতিফলন আছে ডারউইনের বইতে। সুতরাং, ডারউইনিজম আর মার্ক্সিজম তথা সমাজতন্ত্র যে—মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কাহিনির এখানেই অবশ্য শেষ নয়। লেসাবেল নামের এক বন্ধুকে কার্ল মার্ক্স চিঠিতে লিখেছেন, 'Darwin's book is very important and serves me as a basis in natural science for the class strugle in history.'[৩]

শ্রেণি-সংগ্রামের যে-ভিত্তি এবং প্রকৃতির সবখানে যে সেটি বলবৎ, ডারউইনের রচনাবলি পড়ার পরে সেটি কার্ল মার্ক্স আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করেন। এই কথার সত্যতা পাওয়া যায় কার্ল মার্ক্সের বন্ধু এঙ্গেলস লিখিত একটি বইয়ে। এঙ্গেলস ডারউইন এবং কার্ল মার্ক্সকে একই সমান্তরালে এনে লেখেন, 'Just as Darwin discovered the law of Evolution in organic nature, so

---

১ Evolution, Marxian Biology & the social scene, Page : 85-87

২ Evolution, Marxian Biology & the social scene, Page : 85-87

৩ Evolution, Marxian Biology & the social scene, Page : 85-87

Marx discovered the law of nature in human history.'[১]

অর্থাৎ ডারউইন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর অর্গানিক ফিল্ডের যে 'ল' আবিষ্কার করেছেন, মার্ক্স সে রকম 'ল' আবিষ্কার করেছেন মানবজাতির ইতিহাসের। আরও সহজভাবে, ডারউইন যে-শ্রেণি-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে উদ্ভিদ এবং প্রাণিজগতের আবির্ভাবের কথা বলেছেন, ঠিক সেই একই শ্রেণি-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে মানবজাতির ইতিহাসের বিবর্তনের কথা বলেছেন মার্ক্স।

ডারউইনিজম এবং কমিউনিজমের মধ্যকার সুগভীর সম্পর্ক বোঝাতে কার্ল মার্ক্সের একটি জীবনীতে লেখা হয়েছে, 'Darwinism presented a whole string of truth supporting Marxism and proving and developing the truth of it. The spread of Darwinist evolutionary ideas created a fertile ground for Marxist ideas as a whole to be taken on board by the working class... Marx, Engels, and Lenin attached great value to the ideas of Darwin and pointed to their scientific importance and in this way the spread of these ideas was accelerated.'[২]

অর্থাৎ মার্ক্সিজম তথা কমিউনিজম যে একটি অন্যটির পরিপূরক, সে-কথা এই বক্তব্যগুলোতে একদম সুস্পষ্ট। আরও বলা হয়েছে, ডারউইনের আইডিয়া থেকে মার্ক্স, এঙ্গেলস এবং লেনিনরা উপকৃত হয়েছে এবং সেগুলো কাজেও লাগিয়েছে।

সৌরভ যেন খুব চিন্তায় পড়ে গেল। এই তো কয়েকদিন আগে সৌরভদের ডিপার্টমেন্টের এক বড়ভাই তার কাছে কমিউনিজমের দাওয়াত নিয়ে এসেছিল। রক্ষণশীল ধর্মীয় পরিবার থেকে উঠে আসা ধার্মিক যুবক সৌরভ তখন মাত্র ক্যাম্পাসে পা দিয়েছে। তার কাছে বিভাস মণ্ডল নামের একজন কমিউনিস্ট ছাত্র আন্দোলনের নেতা কমিউনিজমের ব্যাপারে একথা-সেকথা বলতে এলে সৌরভ প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা, কমিউনিজম কি নাস্তিকতা-ঘেঁষা কোনো কিছু?'

---

১ Evolution, Marxian Biology & the social scene, Page : 85-87

২ *The Biography Of Karl Marx*, Oncu Yayinevi, Page : 368

সেদিন বিভাস মণ্ডল বেশ সুন্দরভাবেই সৌরভের এই প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়েছিল। আজ সৌরভ বুঝতে পারছে আসলে কমিউনিজম আর এথেইজম তথা ডারউইনিজমের মধ্যে কী সম্পর্ক। সে আবার পড়া শুরু করে দেয় সাজিদের ডায়েরি :

'কার্ল মার্ক্সের ফিলোসফিকে যে-ব্যক্তি বাস্তব রূপ দান করে, তার নাম লেনিন। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই নামটির সাথে পরিচিত। Communist Bolsheviks Movement নামের একটি ইতিহাস বিখ্যাত আন্দোলনের মাধ্যমে লেনিন রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে। বলাই বাহুল্য, এই আন্দোলন রাশিয়ার ইতিহাসে অন্যতম একটি রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ছিল। এই আন্দোলনে মারা গিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ এবং বাস্তুহারা হয়েছিল অনেক মানুষ। মার্ক্সের অন্যতম শিষ্য, কমিউনিজমের ঝাণ্ডাবাহী এই লেনিনও ছিল ডারউইনের গুণমুগ্ধ ভক্ত। ডারউইন সম্পর্কে সে লিখেছে, 'Darwin put an end to the belief that the animal and vegetable species bear no relation to one another, except by chance, and that they were created by God, and hence immutable.'[১]

মানে, ধর্মবাদী ধার্মিকরা উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ব্যাপারে যে প্রথাগত বিশ্বাস রাখে, সেই বিশ্বাসের ইতি ঘটিয়েছেন ডারউইন। লেনিনের পরে রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে আরেক নাস্তিক, বস্তুবাদী কমিউনিস্ট স্ট্যালিন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, স্ট্যালিন হত্যা করেছিল প্রায় এক মিলিয়ন মানুষকে এবং ঘরবাড়ি ছাড়া করেছিল বিশ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে। এই স্টালিনও ছিল ডারউইনের একজন তুখোড় ভক্ত। ডারউইন সম্পর্কে স্ট্যালিন লিখেছে, 'There are three things that we do to disabuse the minds of our seminary students. We had to teach them the age of the earth, the geologic origin, and Darwin's teachings.'

ছোটবেলা থেকেই স্ট্যালিন ডারউইনের ফ্যান হয়ে পড়ে। স্ট্যালিনের এক বাল্যবন্ধু স্ট্যালিনের জীবনী লিখেছিল। সেখানে তিনি জানিয়েছেন যে, স্ট্যালিন মূলত ডারউইনের বইপত্র পড়েই নাস্তিক হয়ে পড়ে এবং তার সেই বন্ধুকে ডারউইনের বইপত্র পড়ার জন্যে চাপ প্রয়োগ করত। তিনি লেখেন, 'At a very early age, while still a pupil in the ecclesiastical school, Comrade Stalin developed a critical mind and revolutionary sentiments. He began

১ *Landmarks in the life of Stalin*, E. Yaroslavsky, Page : 08

to read Darwin and became an atheist'.[১]

হিটলার, মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেলিন এবং স্ট্যালিন। পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ ঘটিয়েছে হত্যাকাণ্ড, কেউ বপন করেছে নাস্তিকতার বীজ। এদের সবার মূল গিয়ে পৌঁছেছে একটি জায়গায়—ডারউইন এবং ডারউইনিজম; কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে আমাদের ইতিহাস কিংবা বিজ্ঞানের কোনো পাঠ্যতালিকায় আমরা এই ইতিহাসগুলো খুঁজে পাই না। সবখানে একটা আবছা অন্ধকার!

সাজিদের ডায়েরিতে এই পর্যন্তই লেখা। সৌরভ ডায়েরিটি বন্ধ করল। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি না বলেছিলে সাজিদ ভাইয়ার কোনো এক স্যার তাকে কী একটি নামে ডাকে?'

আমি বললাম, 'হু। মফিজুর রহমান স্যার। সাজিদকে মি. আইন্সটাইন বলে ডাকে, ব্যঙ্গ করে।'

'তিনি কিন্তু খুব একটা খারাপ বলেন না।'

সৌরভের কথা শুনে আমার চোখ কপালে উঠে গেল। বললাম, 'মানে?'

সৌরভ মুচকি হেসে বলল, 'সাজিদ ভাইয়া হলো আমাদের আইনস্টাইন। হা-হা-হা-হা...।'

আমি সৌরভের চেহারার দিকে তাকালাম ভালো করে। ছেলেটি তখনো হাসছে। তার গালে সুন্দর একটি টোল পড়েছে। ভারি সুন্দর!

---

১ *Landmarks in the life of Stalin*, E. Yaroslavsky, Page : 08

কুরআন কেন আরবী ভাষায়

শরতের রাতের আকাশ। তারায় তারায় ভরে উঠেছে আকাশের বুক। চাঁদ ঝুলন্ত একটি আলোকপিণ্ডের মতো দেখাচ্ছে। আলোর গহ্বর বললেও খুব-একটা ভুল হবে না। ঠিকরে পড়ছে জোছনা। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য শরতের এরকম কোনো এক রাতের দৃশ্য দেখেই সম্ভবত লিখেছিলেন তার বিখ্যাত কবিতার দুটো লাইন—

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

উঠোনজুড়ে জোছনা নেমেছে। শিমুলের গা বেয়ে লকলকিয়ে উঠে যাওয়া সন্ধ্যামালতির চারা, গোয়ালঘরটার কোণে বুড়োর মতো ঝিমুতে থাকা ডালিম ফলের গাছ আর পুব দিকে বুক ফুলিয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকা অশ্বত্থের চেহারা এই আলো-আঁধারীতেও বেশ বোঝা যাচ্ছে। আমরা আবার এসেছি সাজিদদের গ্রামে। বরিশাল জেলার রসুলপুর গ্রাম। গত বছরও ঠিক এই সময়টায় আমরা রসুলপুরে এসেছিলাম।

উঠোনে বিছানো মাদুরে গোল হয়ে বসে আছি। রাহাত, জোবায়ের, সঞ্জু, সাজিদ আর আমি। এরা মূলত সাজিদের বন্ধু। আমার সাথে গতবারই প্রথম পরিচয়। রাহাত শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে। জোবায়ের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়ো-কেমিস্ট্রিতে পড়ত; কিন্তু উদ্যোক্তা হবার ঝোঁক ওঠায় পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এখন গরুর খামার নিয়ে ব্যস্ত। সঞ্জু আবার এতদূর আগাতে পারেনি। উচ্চ মাধ্যমিকের পরে টাকা-পয়সার অভাবে পড়াশোনার ইতি টেনে দিয়েছে। সাজিদ এসেছে শুনে

বেচারা চৌদ্দ মাইলের রাস্তা সাইকেলে পাড়ি দিয়ে চলে এসেছে। আমাদের মাঝখানে আছে সরিষার তেল দিয়ে মাখানো মুড়ি। খাঁটি সরিষার তেলের গন্ধে আমার নাকে ইতোমধ্যেই জ্বালাপোড়া শুরু হয়েছে। ঢাকার দূষিত আবহাওয়া আর ভেজাল খাদ্যদ্রব্য খেতে খেতে খাঁটি জিনিসে রি-অ্যাকশান দেখা দিচ্ছে কি না কে জানে!

মুড়ি চিবোতে চিবোতে রাহাত আমায় বলল, 'তুমি মশাই ভালোই ম্যাজিক পারো।'

বললাম, 'মানে!'

'মানে হলো, সাজিদের মতো গোঁড়া নাস্তিক আমি আমার জীবনে একটিও দেখিনি। তাকে কত রকমে বুঝাতাম সৃষ্টিকর্তা, ইসলাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে। কোনো কিছুতেই কাজ হয়নি। সে জেদ ধরে পাল্টা প্রশ্ন করত। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করতাম অবশ্য; কিন্তু সে গোঁ ধরে থাকত। তখন এত বিরক্ত লাগত যে, একটি সময় ওকে বোঝানোই ছেড়ে দিই। এরকম অসাধ্য তুমি ভাই সাধন করে ফেলেছ। রিয়েলি, ইউ ডিড অ্যা গ্রেট জব।'

রাহাতের কথাগুলোতে বেশ বাড়াবাড়ি আছে। আমি আসলে সাজিদকে আস্তিক হবার মতো আহামরি কিছু বোঝাইনি কখনো। তবে একটি ব্যাপার ঠিক, সাজিদ কোনো কিছু জানতে চাইলে তখন সে খুব বেশি প্রশ্ন করে। প্রশ্ন করা অবশ্য খারাপ কিছু নয়। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সজল স্যার প্রায়ই বলেন, 'যে-ছাত্র প্রশ্ন করে না, ধরে নিতে হবে পড়াশোনায় সে বেশি ফাঁকিবাজ।' এই মুহূর্তে আমার জায়গায় সাজিদ হলে রাহাতের এই বক্তব্যের বিপরীতে কুরআনের আয়াত টেনে বলত, হেদায়াত জিনিসটি কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হাতে। কেউ ইচ্ছে করলেই কাউকে হেদায়েত দিতে পারে না। মানুষ কেবল চেষ্টা করতে পারে।'

আমাদের কথার মাঝখানে জোবায়ের বলে উঠল, 'তো, আজকে আমরা কোন বিষয়ে গল্প করব?'

রাহাত বলল, 'ভ্রমণ কাহিনি বিষয়ক গল্প হতে পারে। সাজিদ তো দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে বেড়ায়। ওর কাছে কাশ্মীর, নেপালের পোখারা ভ্রমণের কাহিনি শুনতে পারি আমরা।'

সাজিদের সব ভ্রমণের কাহিনিই আমার আদ্যোপান্ত শোনা আছে। তাই আমি মতামত দিলাম সাহিত্যালাপের পক্ষে। সঞ্জু কোনো মতামত দেয়নি। যেন শুনে যাওয়াতেই তার আনন্দ। জোবায়ের বলল, 'আচ্ছা, ইলুমিনাতি নিয়ে আলাপ করলে কেমন হয় রে? ড্যান ব্রাউনের থ্রিলার পড়ার পর থেকে আমি তো ইলুমিনাতি নিয়ে খুবই আগ্রহী হয়ে পড়েছি। সারাক্ষণ রহস্য নিয়ে ভাবতে মন চায়।'

সাজিদ বলল, 'তো, নিজেকে তুই কি রবার্ট ল্যাংডন ভাবতে শুরু করেছিস নাকি?'

সাজিদের কথা শুনে আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। হাসল জোবায়েরও। ইলুমিনাতি নিয়ে আমারও বেশ আগ্রহ আছে অনেক আগ থেকেই। এই সিক্রেট সোসাইটির ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত শুনতে শুনতে আগ্রহের পারদ উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠেছে বলা যায়। আমি প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা সাজিদ, ইলুমিনাতি বলতে সত্যিই কি কিছু আছে পৃথিবীতে?'

সাজিদ উত্তর দেওয়ার আগে জোবায়ের বলে উঠল, 'থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। তবে থাকার সম্ভাবনাই বেশি...।'

'কীভাবে?', আমি জানতে চাইলাম।

'থাকার সম্ভাবনা বেশি এ কারণেই, কারণ, 'গডলেস' একটি পৃথিবী নির্মাণের চিন্তা অনেক পুরোনো। সেই চিন্তার বাস্তবতা এখন আমরা সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। আজকের উন্নত বিশ্ব থেকে বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিয়া, সবখানেই বস্তুবাদের রাজত্ব।'

আমি বললাম, 'তুমি কি বস্তুবাদকেই ইলুমিনাতি বলতে চাচ্ছ?'

'ঠিক তা নয়। তবে বস্তুবাদের ধ্যান-ধারণার সাথে ইলুমিনাতির চিন্তাভাবনার মধ্যে ব্যাপক মিল পাওয়া যায়।'

এবার মুখ খুলল সঞ্জু। বলল, 'দাঁড়া। ইলুমিনাতি জিনিসটাই-বা কী সেটাই তো বুঝলাম না। এরকম নাম তো কখনো শুনিনি আমি।'

জোবায়ের বলল, 'ইলুমিনাতি হলো একটি গোপন ভ্রাতৃসংঘের নাম। ইলুমিনাতি শব্দটির অর্থ এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকায়ন। এই গোপন সংঘে তারাই যোগ দিত, যারা হাইলি কোয়ালিফাইড; যেমন-বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি।'

সঞ্জু বলল, 'তা বুঝলাম। তবে এটিকে গোপন ভ্রাতৃসংঘ বলছিস কেন?'

'এটি গোপন এ জন্যেই; কারণ, এটি তৈরিই হয়েছিল তৎকালীন খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে।'

'কারণ কী?'

'কারণ, খ্রিষ্টধর্মের অনেক নিয়মকানুন তখনকার অনেকে মেনে নিতে পারেনি। খ্রিষ্টানদের কবল থেকে মুক্তি পেতে সমাজের সবচেয়ে জ্ঞানী লোকদের সমন্বয়ে এই ইলুমিনাতি গড়ে ওঠে বলে ধারণা করা হয়। তবে, ক্রিশ্চিয়ানিটির ব্যাপক প্রভাব এবং শক্তিমত্তার কারণে তারা কখনোই সামনে আসতে পারেনি।'

'ও আচ্ছা', সঞ্জু বলল।

'ক্রিশ্চিয়ানিটির বিরুদ্ধে তৈরি হলেও এই ইলুমিনাতি একপর্যায়ে এমন-সব মানুষের হাতে গিয়ে পড়ে, যারা আগাগোড়া নাস্তিক। তারা চায় পৃথিবীতে একটি 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' কায়েম করতে। তাদের মুঠোয় থাকবে পৃথিবী। এই লক্ষ্যে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদদের দলে ভেড়ায় এবং অনেকের মতে বর্তমান বিশ্ব পরিচালনা করে এই ইলুমিনাতিরাই।'

সঞ্জুর মাথা যেন গুলিয়ে গেল। সে বলল, 'কী সব ছাইপাঁশ বলছিস। একবার বলছিস তারা গোপনে আছে। আবার বলছিস তারা পৃথিবী পরিচালনা করছে। আগামাথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আমি হো হো করে আরেকবার হেসে উঠলাম। জোবায়ের বলল, 'ইলুমিনাতির একটি নীতি হচ্ছে তারা নিজেদের কখনোই প্রকাশ করবে না। অর্থাৎ তারা কখনোই প্রকাশ্যে প্রচার করবে না যে—তারা ইলুমিনাতি। এই নিয়ম ইলুমিনাতির ভেতরে খুব কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। ইলুমিনাতির কোনো সদস্যই কখনো মুখ ফুটে বলবে না, সে ইলুমিনাতির সদস্য। মরে গেলেও না।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার', বলল সঞ্জু। 'তাহলে তাদের অস্তিত্ব বোঝা যাবে কীভাবে?'

'তাদের নির্দিষ্ট কিছু সাইন আছে।'

'কী সেগুলো?', সঞ্জুর উৎসুক প্রশ্ন।

আমাদের ইলুমিনাতি সম্পর্কিত আলাপে বাগড়া দিল এতক্ষণ ধরে চুপ করে থাকা রাহাত। বলল, 'কী সব ফালতু ব্যাপারে আলাপ করছিস বল তো। এসব ইলুমিনাতি টিলুমিনাতি বলতে কিচ্ছু নেই। ষড়যন্ত্রতত্ত্ব আমার একদম ভালো লাগে না শুনতে। বাদ দে।'

রাহাতের আপত্তির মুখে এতক্ষণ ধরে অনর্গল বলতে থাকা আমাদের ইলুমিনাতি বিশেষজ্ঞ রবার্ট ল্যাংডন ওরফে জোবায়ের মুহূর্তেই হাওয়া ছেড়ে দেওয়া ফানুসের মতো টুস করে চুপসে গেল। তার চুপসে যাওয়ার নীরবতা ভেঙে সাজিদ বলল, 'আমরা তাহলে অন্য কিছু নিয়ে আলাপ করতে পারি।'

'আবারও কি ষড়যন্ত্রতত্ত্ব?'

'না', বলল সাজিদ।

'তাহলে?', রাহাতের প্রশ্ন।

'সূরা ফাতিহার ব্যাপারে।'

সূরা ফাতিহার ব্যাপারে সাজিদ কী আলোচনা করবে সেটাই ভেবে পেল না জোবায়ের। সাত আয়াতের এই সূরা সকলে মুখস্থ বলতে পারে। অর্থও মোটামুটি সবাই জানে। এরপরও এখানে আলোচনার কী থাকতে পারে?

আমি নীরবতা পালন করছি। সাজিদ যখন সেধে কোনো কিছু নিয়ে আলাপ করতে চায়, তার মানে সেখানে নিশ্চয়ই ভিন্নরকম কিছু আছে। গত দু-বছরে তার সাথে ওঠা-বসা করতে করতে এই আত্মবিশ্বাস আমার ভালোভাবেই জন্মেছে।

রাহাত বলল, 'এরকম আলোচনায় আমার আপত্তি নেই। শুরু করে দে।'

সঞ্জু এবারও চুপ। সে সম্ভবত সবকিছুতেই আগ্রহী থাকে। এবার সাজিদ হালকা নড়েচড়ে বসল। কথা বলার আগে তার এরকম হাবভাব আমার কাছে পরিচিত। একটু পরেই গলা খাঁকারি দিয়ে বক্তৃতা শুরু করবে। এখানে কফির বন্দোবস্ত করা গেলে তার জন্যে আরও সুবিধে হতো; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রসুলপুরের এই গ্রামে কফির কোনো ব্যবস্থা নেই।

আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে সাজিদ কোনো প্রকার গলা খাঁকারি দেওয়া ছাড়াই বলা শুরু করল, 'কয়েকদিন আগে আমি সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করছিলাম।

সচরাচর যে-রকম করি, সে রকম। সেদিন হঠাৎ করে আমার মনে হলো, আমি মনে হয় সূরা ফাতিহার বিশেষ একটি দিক ধরতে পেরেছি।'

'কীরকম?', জোবায়ের জানতে চাইল।

সাজিদ বলল, 'সূরা ফাতিহায় রয়েছে সাতটি আয়াত, তাই না?'

'হু', বলল রাহাত।

'এই সাতটি আয়াতকে দুই ভাগে ভাগ কর; কিন্তু মাঝের আয়াতকে কোনো ভাগেই ফেলিস না। অর্থাৎ একদম মাঝের আয়াতটিকে আলাদা রেখে দুই ভাগ করলে কীরকম দাঁড়ায় হিশেব কর।'

রাহাত বলল, 'তাহলে সাত আয়াতের মধ্যে মাঝের আয়াত হলো আয়াত নম্বর চার। চার নম্বর আয়াতকে আলাদা রেখে দুই ভাগ করলে এক, দুই এবং তিন নম্বর আয়াত পড়ে এক ভাগে, এরপর পাঁচ, ছয় এবং সাত নম্বর আয়াত পড়ে অন্য ভাগে।'

সাজিদ বলল, 'গুড।'

সঞ্জু বলে উঠল, 'আমি বুঝি নাই রে দোস্ত। আরেকটু সহজ করে বল।'

'আচ্ছা, সহজ করেই বলছি', বলল সাজিদ। 'ধর, তোকে বললাম ১ থেকে ৭ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো দুই ভাগ করতে হবে, তবে মাঝের সংখ্যাটিকে কোনো ভাগে না ফেলে আলাদা রাখতে হবে। তুই কীরকম ভাগ করবি?' সঞ্জু মাথা চুলকাতে লাগল। কথা বলে উঠল রাহাত। বলল, 'সঞ্জু, ১,২,৩,৪,৫,৬ এবং ৭ এর মধ্যে মাঝের সংখ্যা কোনটি হবে বল।'

সঞ্জু এবারও বিভ্রান্ত। সাজিদ বলল, 'আমি আরও সহজ করি। ১-৭ এর মধ্যে ১,২,৩ এক ভাগে আর ৫,৬,৭ অন্য ভাগে। বাদ পড়ল কোন সংখ্যাটা?'

'চার', বলল সঞ্জু।

'রাইট। এই চার সংখ্যাটাই মাঝের সংখ্যা এখানে। দেখ, চার সংখ্যাটার আগেও তিনটি সংখ্যা ১,২,৩ এবং চার সংখ্যাটার পরেও তিনটি সংখ্যা ৫, ৬ এবং ৭। এবার বুঝতে পেরেছিস?'

সঞ্জু মাথা নেড়ে বলল, 'ফকফকা পরিষ্কার।'

সঞ্জুর কথা শুনে আমরা সকলে হেসে উঠলাম। সাজিদ আবার বলতে লাগল, 'তাহলে সূরা ফাতিহাকেও যদি আমরা এরকম দুই ভাগ করি, তাহলে সূরাটার প্রথম তিন আয়াত চলে যাবে এক ভাগে, আর শেষের তিন আয়াত চলে যাবে অন্য ভাগে। মাঝে থাকবে আয়াত নম্বর চার। রাইট?'

'হুম।'

'এখানেই আসল রহস্যটা', বলল সাজিদ। 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মাঝের আয়াতে এমন কিছু বলেছেন, যেটি সূরা ফাতিহার প্রথম অংশ এবং পরের অংশ, দুই অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করে।'

'ইন্টারেস্টিং', বলল জোবায়ের।

সাজিদ বলল, 'আয়াতের অর্থগুলোর দিকে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবি। প্রথম তিনটি আয়াতে কী বলা হচ্ছে দেখে নিই। প্রথম আয়াতে বলা হচ্ছে,

'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি জগৎসমূহের অধিপতি।'

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে, 'যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।'

তৃতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে, 'যিনি বিচারদিনের মালিক।'

এই তিন আয়াত প্রথম ভাগে। চতুর্থ আয়াতে বলা হচ্ছে, 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।' এটি কিন্তু মাঝের আয়াত। এটি কোনো ভাগেই পড়বে না। এটিকে কেন্দ্রবিন্দু বলা যেতে পারে। এই আয়াত দিয়েই আমরা প্রথম ভাগ আর পরের ভাগকে যাচাই করব।'

আমাদের মাঝে পিনপতন নীরবতা। সেই নীরবতা ভেঙে সাজিদ আবার বলতে লাগল, 'পরের ভাগের আয়াতগুলোতে কী বলা হচ্ছে দেখ।'

পঞ্চম আয়াতে বলা হচ্ছে, 'আমাদের সরলপথে পরিচালিত করুন।'

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হচ্ছে, 'ওই সব লোকদের পথে, যাদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন।'

সপ্তম আয়াতে বলা হচ্ছে, 'তাদের পথ নয়, যাদের ওপর আপনার অভিশাপ নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।'

এবার আমরা সিকোয়েন্সটি মিলাতে পারি। প্রথম ভাগের আয়াতগুলো এক জায়গায় নিয়ে আসা যাক। প্রথম অংশের আয়াতগুলো হলো—

'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি জগৎসমূহের অধিপতি।'

'যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।'

'যিনি বিচারদিনের মালিক।'

মাঝখানে আছে 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।' আর, পরের অংশে আছে :

'আমাদের সরলপথে পরিচালিত করুন।'

'ওই সব লোকদের পথে, যাদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন।'

'তাদের পথ নয়, যাদের ওপর আপনার অভিশাপ নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।'

আমরা সকলে গভীর মনোযোগের সাথে সাজিদের কথাগুলো শুনছি। সে বলতে লাগল, 'মাঝখানের, অর্থাৎ চার নম্বর আয়াতে দুটো অংশ আছে। 'আমরা তোমারই ইবাদত করি' এতটুকু একটি অংশ, এবং 'তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি' এতটুকু একটি অংশ। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এই আয়াতের প্রথম অংশ সূরার প্রথম তিন আয়াতের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং পরের অংশ প্রতিনিধিত্ব করছে সূরার পরের তিন আয়াতের। এই আয়াতের প্রথম অংশ দিয়ে ওপরের তিন আয়াতকে যাচাই করা যাক :

'আমরা তোমারই ইবাদত করি।'

আমরা কার ইবাদত করি?

'সকল প্রশংসা যার এবং যিনিই সৃষ্টিজগতের অধিপতি।' [সূরা ফাতিহার ১ম আয়াত]

আমরা কার ইবাদত করি?

'যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু' [সূরা ফাতিহার ২য় আয়াত]

আমরা কার ইবাদত করি?

'যিনি বিচারদিনের মালিক।' [সূরা ফাতিহার ৩য় আয়াত]

'দারুণ তো!', বলে উঠল জোবায়ের।

এবার আসা যাক ওই আয়াতের পরের অংশে। যেখানে বলা হচ্ছে—

'তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

আমরা কীসের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করি?

'যাতে আমরা সরল পথে চলতে পারি।' [সূরা ফাতিহার ৫ম আয়াত]

আমরা কীসের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করি?

'যাতে আমরা নিয়ামতপ্রাপ্তদের দলে ভিড়তে পারি।' [সূরা ফাতিহার ৬ষ্ঠ আয়াত]

আমরা কীসের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করি?

'যাতে আমরা অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্টদের দলের অন্তর্ভুক্ত না হই।' [সূরা ফাতিহার ৭ম আয়াত]

চিন্তা কর, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ছোট্ট সূরাটার মধ্যেও কীরকম ভাষার মান, সাহিত্য মান দিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে কিছু কথা, মাঝখানে একটি বাক্য, শেষে আরও কিছু কথা; কিন্তু মাঝখানের সেই বাক্যটিকে এমনভাবে সাজিয়েছেন এবং এমনভাবে বলেছেন, যেটি প্রথম এবং শেষ—দুটো অংশের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যারা বলে কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানিয়ে লিখেছেন, তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এতটা সূক্ষ্মভাবে, এতটা সাহিত্যমান দিয়ে কোনোকিছু লেখা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আরও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, এই আয়াতগুলো একই সাথে নাযিল হওয়া। একটির পর একটি, বিরতিহীন। পৃথিবীর কোনো মানুষ যদি ইনস্ট্যান্ট কিছু রচনা করে, তার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় যে, কুরআনের মতো এরকম সিস্টেম্যাটিক পদ্ধতিতে কোনো কিছু লিখবে।'

'ওয়াও! দ্যাটস অ্যামেইজিং!', চিৎকার করে বলে উঠল রাহাত। সহজে কোনো কিছু বুঝতে না পারা সঞ্জুও এবার ব্যাপারটি বুঝে গেছে। সেও বলে উঠল, 'সত্যিই দারুণ! এরকমভাবে কখনো ভেবে দেখিনি।' জোবায়ের বলল, 'সিম্পলি গ্রেট! এটি নিশ্চিত মিরাকল।'

আমি একটি ব্যাপার ভাবতে লাগলাম। সূরা ফাতিহা এর-আগে অনেকবার আমি পড়েছি; কিন্তু এত সহজ অথচ আশ্চর্যজনক এই ব্যাপারটি কখনো আমার মাথায় আসেনি কেন!

আমাদের ভাবনায় ছেদ ঘটিয়ে রাহাত বলল, 'এটি কেবল আরবী ভাষাতেই সম্ভব। এ জন্যেই বোধকরি কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, তাই নারে সাজিদ?'

সাজিদ বলল, 'কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ার এটি একটি কারণ। তবে এর পেছনে আরও অনেক কারণ আছে।'

যেমন?', প্রশ্ন করল রাহাত।

এবার সামান্য গলা খাঁকারি দিল সাজিদ। এরপর যখনই সে তার পরবর্তী লেকচার শুরু করতে যাবে, অমনি আমি হাত তুলে বললাম, 'আমার একটি কোয়েশ্চান আছে।'

এতক্ষণ ধরে সাজিদের দিকে চেয়ে থাকা বড় বড় চোখগুলো এবার সম্মিলিতভাবে আমার ওপরে এসে পড়ল। আমি কী প্রশ্ন করব সেটি শোনার জন্যে সবাই যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

আমি বললাম, 'সাজিদ, তোর ব্যাপারে আমার কমন একটি অবজার্ভেশন হলো এই, তুই যখনই কোনো লম্বা বক্তৃতা শুরু করতে যাস, তখনই একবার গলা খাঁকারি দিয়ে এরপর শুরু করিস; কিন্তু আজকে আলাপের শুরুর দিকে তুই এরকম করিসনি। কেন করিসনি?'

আমার প্রশ্ন শুনে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে জোবায়ের। সে মুখ হা করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কমবোঝা লোক সঞ্জু সম্ভবত খুব মজা পেয়ে গেল। সে হো হো করে হেসে উঠল। হাসার সময় তার ফোকলা দাঁতগুলো দেখলে তাকে চকলেটে আসক্ত বাচ্চার মতো দেখায়। সাজিদ কিছু একটি বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে রাহাত বলল, 'দাঁড়া দাঁড়া। এটি তো ডাক্তারি

ইস্যু। আমাকে কথা বলতে দে।'

এরপর রাহাত আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আরিফ ভাই, সাজিদ কি এরকম সবসময়ই করে, নাকি শুধু কথা বলার সময়ই এমনটি করে?'

'সবসময় করে না। কথা বলার সময়েও করে না। তখনই করে, যখন ও বড় কোনো বক্তব্য দিতে যায়।'

রাহাত বলল, 'হুম। বুঝতে পেরেছি। ও যদি এই জিনিসটি নিয়মিত করত তাহলে ধরে নেওয়া যেত—তার শুচিবায়ু রোগ আছে। যেহেতু নিয়মিত করে না, তাই এটি কোনো রোগ নয়; বরং এটি অভ্যাসের রোগ।'

'অভ্যাসের রোগ?', আমি প্রশ্ন করলাম।

'সেটি আবার কীরকম?', প্রশ্ন সঞ্জুর।

রাহাত বলল, 'ব্যাপারটি সাইকোলজির। বিশেষ বিশেষ সময়ে কোনো কিছু করতে করতে একটি সময় জিনিসটি ওই ব্যক্তির সাইকোলজিতে এমনভাবে সেট হয়ে যায় যে, সে পরবর্তী সময়ে মনের অজান্তেই ওই জিনিস করে চলে। যেমন ধরা যাক, দাঁত দিয়ে হাতের নখ কাটা। এই ব্যাপারটি বেশির ভাগ লোকই মনের অজান্তেই করে। কারণ, কোনোকিছু নিয়ে গভীর চিন্তার সময়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে একটি সময়ে গিয়ে ব্যাপারটি তার অনিয়ন্ত্রিত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'বাহ রাহাত ভাই। তোমার কাছ থেকে তো দারুণ দারুণ সব টার্মিনোলোজি শিখলাম। অভ্যাসের রোগ, অনিয়ন্ত্রিত অভ্যাস...হা...হা...হা...।'

এবার মুখে ভেংচি কেটে জোবায়ের বলল, 'ফালতু কথাবার্তা। হাতুড়ি ডাক্তার হলে যা হয় আরকি।'

জোবায়েরের কথা শুনে এবার আমি, সাজিদ আর সঞ্জু তিনজনই হেসে উঠলাম। বেচারা ইলুমিনাতির গল্প চালিয়ে যেতে না পারার শোধ কী সুন্দরভাবেই না তুলে নিল।

রাহাত ওর দিকে খটমটে চেহারায় তাকিয়ে আছে। সাজিদ বলল, 'বেশ ঝগড়া হয়েছে। এবার থামা যাক।'

সাজিদের কথা শুনে সবাই আবার নড়েচড়ে বসল। রাহাত বলল, 'তো বল, কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ার পেছনে আর কী কী কারণ থাকতে পারে?'

সাজিদ আবারও বলতে শুরু করল, 'ব্যাপারটি সহজে বোঝার জন্য আমাদের প্রথম যা বুঝতে হবে তা হলো, আরবী ভাষার অনন্যতা। যে-ভাষায় সৃষ্টিকর্তার বাণী প্রেরিত হবে, সেই ভাষা যদি যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা না-হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে সেই ভাষার বিলুপ্তির সাথে সাথে সৃষ্টিকর্তার বাণীও বিলুপ্ত হয়ে যাবে অথবা বিকৃত হয়ে যাবে।'

'ভাষা বিলুপ্ত বা বিকৃত হতে পারে?', প্রশ্ন করল জোবায়ের।

'অবশ্যই। হিব্রু ভাষার কথাই ধর। তাওরাতের মতো বিখ্যাত আসমানী কিতাব এই ভাষাতেই নাযিল হয়েছিল। অথচ কালের বিবর্তনে আজ হিব্রু ভাষা মৃত। মুসা আলাইহিস সালামের ওপরে তাওরাত নাযিল হয়েছিল আজ থেকে আরও তিন হাজার বছর আগে। অথচ ইতিহাস থেকে জানা যায়, হিব্রু ভাষার প্রথম শব্দকোষ তথা ডিকশনারিই লিখিত হয় মাত্র সেদিন। দশম শতাব্দীতে। চিন্তা করে দেখ, আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে নাযিল হওয়া একটি কিতাবের ভাষা বোঝার ডিকশনারিই তৈরি হয়েছে মাত্র সেদিন। তাহলে মাঝখানের লম্বা টাইম-গ্যাপে যে-শব্দগুলো হারিয়ে গেছে, যে-শব্দগুলো কালের বিবর্তনে অর্থ বদলে ফেলেছে, সেগুলোর প্রকৃত অর্থ বের করার উপায় কী?'

আমরা সবাই চুপ করে আছি। রাহাত বলল, 'শব্দ অর্থ বদলাতে পারে?'

'অবশ্যই পারে। যেমন ধর ইংরেজি ভাষার কথা। ইংরেজিতে 'Nice' মানে কী বল।'

জোবায়ের বলল, 'সুন্দর।'

সাজিদ বলল, 'কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে এই 'Nice' শব্দ দিয়ে কী অর্থ করা হতো জানিস?'

'কী?', সঞ্জু জানতে চাইল।

'এই 'Nice' শব্দটি লাতিন 'Nescius' শব্দ থেকে এসেছে। চতুর্দশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে এই 'Nice' শব্দের অর্থ করা হতো 'Ignorant' বা মূর্খ বোঝাতে।

কালক্রমে Shyness, Resreve অর্থেও ব্যবহার করা হয় এই 'Nice' শব্দটি।'

সঞ্জু অবাক হয়ে বলল, 'বলিস কী!'

'হুম। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে এসেই এই 'Nice' শব্দ আজকের 'সুন্দর' 'সুশ্রী' অর্থ লাভ করে। চিন্তা করে দেখ, ভাষা কীভাবে পাল্টে যেতে পারে। কুরআন যদি হিব্রু ভাষাতে নাযিল হতো, তাহলে কী অবস্থা হতো আর যদি ইংরেজিতে হতো তাহলে কী হতো ভেবে দেখ।'

রাহাত বলল, 'সত্যিই!'

'কিন্তু আরবী ভাষার ক্ষেত্রে কি এরকমটি হয়েছে সাজিদ?', জানতে চাইল জোবায়ের।

'না। আরবী ভাষার ক্ষেত্রে এরকমটি হয়নি মোটেও। বলা চলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন একটি জাতির কাছে এবং এমন একটি ভাষায় কুরআন দেওয়া হয়েছে, যারা তৎকালীন সময়ে সাহিত্যে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল। সে সময়ে পৃথিবীতে সাহিত্যের জীবন্ত ভাষাই ছিল আরবী। আরবরা কবিতা, সাহিত্যে এত বেশিই দক্ষ আর মুন্সিয়ানার অধিকারী ছিল যে, সমসাময়িক কোনো জাতিই সাহিত্যে এতটি অগ্রগতি লাভ করেনি। কুরআনকে সর্বোচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যমান দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরে একটি মিরাকল হিশেবে পাঠিয়েছিলেন। এর প্রমাণ আমরা কুরআন থেকেই পাই।'

'যেমন?', প্রশ্ন করল রাহাত।

'যেমন, মূসা আলাইহিস সালামের সময়ে জাদুবিদ্যা ছিল পৃথিবীব্যাপী বিখ্যাত ব্যাপার। চারদিকে তখন জাদুকরদের জয়জয়কার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে সমসাময়িক বিষয় জাদুবিদ্যার মতোই মোজেযার জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এটাই ছিল মূসা আলাইহিস সালামের জন্যে মিরাকল। ফেরাউনের সামনে তিনি যখন হাত থেকে লাঠি রাখলেন, তখন সেটি সাপ হয়ে গেল। তার সময়কার বাঘা বাঘা জাদুকরেরা এটি দেখে তো অবাক হয়ে গেল। বলে উঠল, 'এত এত জাদু দেখলাম, জাদু শিখলাম; কিন্তু এরকম জাদু তো কখনো দেখলাম না। ব্যস, তারা মূসা আলাইহিস সালামের রবের ওপরে ঈমান নিয়ে এলো। আবার ঈসা আলাইহিস সালামের সময়ে চিকিৎসাবিদ্যার ছিল জগৎজোড়া খ্যাতি। তাই আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামকে এমন বিদ্যা দিয়ে পাঠালেন, যা দেখে তখনকার ডাউস ডাউস চিকিৎসকরা অবাক হয়ে গেল। কী ছিল সেই বিদ্যা? সেটি হলো তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারতেন। এটি দেখে তো সবার চক্ষু ছানাবড়া। এটি কীভাবে সম্ভব? যে-যুগে যে-জিনিসের কদর সবচেয়ে বেশি, প্রচলন সবচেয়ে বেশি সেই যুগের রাসূলদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঠিক সেই জিনিসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা সেই জিনিস দিয়েই পাঠাতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ ছিল সাহিত্যের যুগ। তখন সাহিত্যকে ধর্মের মতো পূজা করা হতো। চারদিকে যখন আরবী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের জয়জয়কার, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন সাহিত্যমান-সমৃদ্ধ কুরআন দিয়ে পাঠালেন, যা এ যাবৎকালের সব সাহিত্যকর্মকে ছাপিয়ে একেবারে শীর্ষে আরোহণ করে বসল। সাহিত্যের জন্যে বিখ্যাত আরবরাই অবাক হতে বাধ্য হলো। কুরআনের শব্দচয়ন, সুর ও তাল-লহরি এতই চমৎকার যে, রাতের অন্ধকারে কাফিররা লুকিয়ে কুরআন শুনতে আসত।'

সাজিদের কথা শুনে সঞ্জু সুবহানাল্লাহ বলে চিৎকার করে উঠল। বলল, 'সত্যিই চমৎকার!'

সাজিদ বলতে লাগল, 'কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ার পেছনে আরেকটি অন্যতম কারণ হলো আরবী ভাষার সহজবোধ্যতা। আরবী ভাষার চমৎকারিত্ব, শব্দ এবং বাক্যগঠনই এমন যে, এই ভাষাটি সহজেই বোঝা যায়, মুখস্থ করে ফেলা যায়। সহজ ও সুন্দর আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যুগের পর যুগ ধরে এই কুরআনকে যেকোনো প্রকার বিকৃতি ও বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছেন।'

'কীভাবে সেটি?', সঞ্জু আবার জানতে চাইল।

'এই যে, পৃথিবীজুড়ে যে-লক্ষ-লক্ষ কুরআনের হাফেজ, এদের মাধ্যমে। এরা কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া মুখস্থ করে রাখে। যদি কোনো দুর্যোগে কুরআনসহ পৃথিবীর সকল বই নষ্ট হয়ে যায় বা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তবুও কুরআনকে হুবহু, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড লিখে ফেলা সম্ভব। কারণ, পৃথিবীজুড়ে লক্ষ লক্ষ কুরআনের হাফেজ রয়েছে।'

সঞ্জু আরেকবার 'সুবহানাল্লাহ বলে উঠল।'

সাজিদ এবার থামল কিছুক্ষণ। রাত আরও গভীর হয়ে উঠেছে। সাদা মেঘের ছুটোছুটি বেড়ে গেছে আকাশে। দূর থেকে কিছু শিয়ালের আওয়াজ ভেসে আসছে কানে। হালকা শীত লাগছে গায়ে। দ্বিতীয়বারের মতো গলা খাঁকারি দিল সাজিদ। গলা খাঁকারি দিয়ে সে এবার আমার দিকে তাকাল। ভাবল আমি হয়তো এবারও অবজেকশান জানাব। আমাকে চুপচাপ দেখে সে আবার বলতে শুরু করল, 'আরবী ভাষার আরও অনেক চমৎকারিত্ব আছে, যা অন্য ভাষায় নেই।'

'যেমন?', জানতে চাইল রাহাত।

'যেমন ধরা যাক, বাংলায় যদি আমরা বলি 'তারা যাচ্ছে', অথবা 'They are going', তখন আমরা বুঝতে পারি না যে—এই 'তারা' বা 'They' বলতে আসলে নারীকে বোঝানো হচ্ছে না পুরুষকে। কারণ, বাংলা বা ইংরেজিতে এই সর্বনামের জন্য কোনো আলাদা শব্দ নেই, যা দিয়ে এক শব্দেই বোঝানো যাবে যে, 'তারা' বলতে আসলে নারীদের বোঝানো হচ্ছে না পুরুষকে; কিন্তু আরবীতে এই সমস্যা নেই। যেমন আরবীতে 'They' শব্দটি যদি পুরুষের ক্ষেত্রে হয়, তখন শুধু 'Hum'(هم) লিখলেই চলে। এই শব্দ থেকেই বুঝে ফেলা যায় যে, এখানে আসলে পুরুষদের বোঝানো হচ্ছে। আবার, 'They' দিয়ে যদি নারীদের বোঝানো লাগে, তখন শুধু 'Hunna' (هن) বললেই হয়ে যায়। এখানে সহজেই বোঝা যায়—'তারা' বলতে নারীদের বোঝানো হচ্ছে।'

জোবায়ের বলল, 'অ্যামেইজিং ফিচারস!'

সাজিদ বলল, 'আরও চমৎকার জিনিস আছে। যেমন ধর 'Camel' বা 'উট' শব্দটি। নারী-উট বা পুরুষ-উট বোঝানোর জন্য ইংরেজিতে কিন্তু একক কোনো শব্দ নেই। যদি নারী-উট বোঝাতে হয় ইংরেজিতে কী বলতে হবে? বলতে হবে 'Female Camels'. পুরুষ-উট বোঝাতে গেলে বলতে হবে 'Male Camels।' কিন্তু আরবীতে পুরুষ-উট বোঝানোর জন্যে আলাদা শব্দ, নারী-উট বোঝানোর জন্যে আলাদা শব্দ রয়েছে। ইংরেজিতে Camel বলতে ইন জেনারেল সব ধরনের উটকেই বোঝানো হয়ে থাকে। আরবীতে ইন জেনারেল সব উটকে বোঝানোর জন্যেও শব্দ আছে। যেমন : Ibil (الإبل) এই শব্দ ইংরেজি 'Camel' শব্দের মতোই। এটার মধ্যে সব ক্যাটাগরির উটই অন্তর্ভুক্ত। আবার যদি ইংরেজিতে 'পুরুষ-উট' বোঝাতে যাই, তখন কী বলতে হবে? তখন বলতে হবে 'Male

Camels'; কিন্তু আমি যদি আরবীতে 'পুরুষ-উট' বোঝাতে চাই, আমাকে কিন্তু ইংরেজির মতো এত ঝামেলা পোহাতে হবে না। আমি স্রেফ একটি শব্দ দিয়েই কাজ সেরে ফেলতে পারব। যেমন-আমি যদি পুরুষ উটের কথা বলি, তখন খালি আরবী 'Jamal (الجمل) শব্দটি বললেই হবে, ব্যস। এই শব্দ দিয়েই বোঝানো হয়ে গেছে—আমি পুরুষ উটের কথা বলছি।'

আমাদের সবার চোখেমুখে বিস্ময়ের ভারি রেশ। সাজিদ বলল, 'তোদের একটি আয়াতের কথা বলি। সূরা তাকবীরের শুরুতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের পূর্বে ঘটবে এমন কিছু নির্দশনের কথা বলেছেন। ওই সূরার চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'যখন পূর্ণকালীন গর্ভবতী উটগুলো উপেক্ষিত হবে।' এই আয়াতের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে এরকম-'When full term she camels will be neglected।' দেখ, বাংলায় বলা হয়েছে 'পূর্ণকালীন গর্ভবতী উট', আর ইংরেজিতে বলা হয়েছে 'Full term she camels'. উটগুলো যে নারী-উট হবে এবং সেগুলো যে পূর্ণকালীন গর্ভবতী হবে, সেটি বোঝাতে বাংলায় দরকার হয়েছে তিনটি শব্দ—পূর্ণকালীন গর্ভবতী উট আর ইংরেজিতে দরকার হয়েছে চার চারটি শব্দ—Full term she camels' অথচ, আরবীতে পুরো ব্যাপারটির জন্যে কয়টি শব্দ দরকার হয়েছে জানিস?'

রাহাত জিজ্ঞেস করল, 'কয়টা?'

'জাস্ট ওয়ান! কুরআন কেবল 'Ishar' (الْعِشَارُ) শব্দ দিয়েই পুরো ব্যাপারটি ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে দিয়েছে। আরবীতে 'Ishar' (الْعِشَار) শব্দের অর্থ হলো এমন নারী-উট, যেটি হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই বাচ্চা প্রসব করবে। চিন্তা করতে পারিস আরবী ভাষার গভীরতা কতটুকু?'

সঞ্জু তৃতীয়বার 'সুবহানাল্লাহ' বলে চিৎকার করে উঠল। সে আরও বলল, 'এমন সমৃদ্ধ যে-ভাষা, সে ভাষায় কুরআন নাযিল হবে না তো কোন ভাষায় হবে? সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!'

বাড়ির ভেতর থেকে ডাক চলে এসেছে। সাজিদের বড় কাকা চিৎকার করে বলছেন, 'কই রে সাজিদ! তোরা কি খাওয়া দাওয়া করবি না নাকি? ছেলেগুলো সেই কোন সন্ধ্যায় এসেছে। আরেকটু হলে তো ফজরের আযান হবে মসজিদে।'

আমরা যেন কেউই সেদিকে খেয়াল দিইনি। সাজিদের কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। এত চমৎকার কুরআন নিয়ে কখনোই আমাদের সেভাবে ভাবা হয় না। সামান্য একটি শব্দের মধ্যেও যে এরকম বিস্ময় লুকিয়ে থাকতে পারে সেটি আজ সাজিদের মুখে না শুনলে বুঝতামই না।

সাজিদ বলল, 'এই দেখ, আমার বাড়িতে এনে তোদের না খাইয়ে লেকচার শোনাচ্ছি। চল, এবার খাওয়া-দাওয়া করা যাক...।'

ভাজা ইলিশের গন্ধ আসছে নাকে। আচ্ছা, এতক্ষণ এই গন্ধ টের পাইনি কেন? কে জানে, হয়তো পেয়েছি কিন্তু সাজিদের লেকচারে এমন বুঁদ হয়ে ছিলাম যে ইলিশের গন্ধ নাকে লাগছে অথচ সেটি টেরই পাইনি।

সূর্য যাবে ডুবে

সাজিদদের ডিপার্টমেন্ট থেকে একটি ম্যাগাজিন বের হবে। বিজ্ঞান ম্যাগাজিন। নাম 'প্রণোদনা'। এই ম্যাগাজিনের খবর আমি অবশ্য সাজিদের কাছ থেকে পাইনি; পেয়েছি তাদের ডিপার্টমেন্টের আরেকজনের কাছ থেকে। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে দেখি সাজিদ তার টেবিলে সোজা হয়ে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে। বাসায় যে আমার মতো আস্ত একটি মানুষ এসে ঢুকল, সেটি হয়তো সে টেরও পায়নি। হয়তো পেয়েছে; কিন্তু আমার আগমন হয়তো তার কাছে তেমন কোনো ব্যাপার না, অথবা এমনও হতে পারে যে, আমার চাইতে তার কাছে বই পড়াটাই বেশি মূল্যবান। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মনে হলো আজকাল আমি খুব বেশিই ফেলুদা সাজার চেষ্টা করছি। অকারণ সন্দেহ আর কৌতূহলের ব্যাপারটি ইদানীং খুব প্রকট আকারে আমার মধ্যে দেখা দিয়েছে। নিজেকে বোঝালাম, বাপু তুমি ফেলুদাও নও, হ্যারি পটারও নও। তোমার কাজ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ষোলকলা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। প্রাণীর কোষের ভেতর থেকে অভূতপূর্ব তথ্য বের করে আনাই তোমার কম্ম। আর যাই হোক, সাইকোলজি তোমার সাবজেক্ট নয়!

আমি কাঁধ থেকে টেবিলে ব্যাগ রাখতে রাখতে বললাম, 'শুনলাম তোদের ডিপার্টমেন্ট থেকে নাকি একটি ম্যাগাজিন বের হচ্ছে?'

সাজিদ ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে আগেই বাসায় ফিরেছি। অন্য কেউ হলে হয়তো জিজ্ঞেস করত, 'কীরে! আজকে এত তাড়াতাড়ি ফিরলি যে?'

কিন্তু সাজিদের এসব জিজ্ঞেস করার টাইম নেই। ম্যাগাজিনের কথা শুনে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ।’

‘কী বিষয়ক ম্যাগাজিন?’

‘বিজ্ঞান।’

‘তুই কোনো লেখা দিচ্ছিস?’

সাজিদ বইটি বন্ধ করল। এরপর বলল, ‘লেখা দিতে পারি; কিন্তু ব্যাপার হলো, মফিজুর রহমান স্যার ওই লেখা ছাপাবেন কি না, সন্দেহ আছে।’

সাজিদ যেহেতু মফিজুর রহমান স্যারের আপত্তির কথা ভাবছে, তখন আমার আর বোঝার বাকি থাকে না, লেখাটি আসলে কোন কেন্দ্রিক হতে যাচ্ছে। আমি বললাম, ‘ছাপাবে না কেন? আলবত ছাপাবে। ভালো লেখা হলে মফিজুর রহমান স্যার অবশ্যই ছাপাতে বাধ্য।’

আমার কথাগুলো শুনে সাজিদ খুব-একটা আগ্রহ পেল বলে মনে হলো না। বলল, ‘দেখি।’ এইটুকু বলে সে আবার বইয়ের মাঝে ডুব দিল।

এরপর কেটে গেছে কয়েক মাস। পড়াশোনা, ল্যাব আর পরীক্ষার চাপে আমিও ম্যাগাজিনের ব্যাপারটি বেমালুম ভুলে গেলাম। একদিন রাতে বাসায় ফেরার পর দেখি সাজিদ বাসায় নেই। তার টেবিলের ওপরে নীল মলাটের একটি ম্যাগাজিন রাখা। কৌতূহল থেকে ম্যাগাজিনটি হাতে নিয়ে দেখি ওপরে মোটা মোটা বাংলায় লেখা ‘প্রণোদনা’। সাথে সাথে ম্যাগাজিনটা হাতে তুলে নিলাম। এটাই তো সাজিদদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বের হবার কথা ছিল। শেষমেশ হলো তাহলে; কিন্তু এতে কি সাজিদের লেখা আছে? সাজিদ লেখা দিলেও মফিজুর রহমান স্যার কি তা আদৌ ছেপেছে? অতশত না ভেবে ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে সোজা চলে গেলাম ম্যাগাজিনের সূচিপত্র অংশে। আমার চোখ দুটো খুঁজে ফিরছে সাজিদের নাম। মাঝামাঝিতে এসে আমি ঠিক ঠিক পেয়ে গেলাম। ইয়েস! ইটস দেয়ার! একটি প্রবন্ধের নাম আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। ‘সূর্য যাবে ডুবে’ চুয়াত্তর পৃষ্ঠায়। আমি তড়িঘড়ি করে পৃষ্ঠা নম্বর চুয়াত্তর খুঁজে বের করে দাঁড়ানো অবস্থাতেই পড়তে শুরু করলাম।

ম্যাগাজিনটির ইনার-ডিজাইন খুব সুন্দর করে সাজানো। প্রতিটি লেখার সাথে কিছু স্থির চিত্র দেওয়া আছে যাতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠক সহজে অনুমান করতে পারে। 'সূর্য যাবে ডুবে' এই লেখাটার সাথেও দেওয়া হয়েছে খুব সুন্দর একটি চিত্র। ডুবুডুবু অবস্থায় একটি সূর্য। আমি আর লোভ সামলাতে পারছি না। সরাসরি পাঠে মনোযোগ দিলাম।

সূর্য যাবে ডুবে

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের প্রতিনিয়ত নানা বিস্ময়কর সব তথ্য জানিয়ে হতবাক করে ছাড়ছে। পাল্টে দিচ্ছে আমাদের রোজকার জীবন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পদে পদে বিজ্ঞানের অবদান অবশ্যই অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের হাত ধরেই মানুষ যাত্রা করেছে চাঁদ থেকে মঙ্গলে। বিজ্ঞানের রূপরেখা ধরেই মানুষ গভীর সমুদ্র চষে বেড়াচ্ছে। জয় করে নিচ্ছে অজেয় সব ব্যাপার। প্রাণঘাতী রোগের চিকিৎসা আমাদের জন্য বিজ্ঞান সহজলভ্য করে দিয়েছে। আধুনিক জীবনে বিজ্ঞান যেন আমাদের জীবনের প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেক অনেক সুখকর তথ্য, আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের সাথে সাথে বিজ্ঞান আমাদের প্রায়ই বেশ কিছু দুঃসংবাদও শুনিয়ে থাকে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম যে-দুঃসংবাদ বিজ্ঞান আমাদের সম্প্রতি জানিয়েছে তা হলো, আমাদের সূর্য একদিন তার সব তেজ-শক্তি আর আলো হারিয়ে নিঃশেষ হয়ে পড়বে।

অবাক করা ব্যাপার হলেও সত্য যে, একদিন আমাদের পৃথিবী আর সূর্যের আলোয় আলোকিত হবে না। সকালের সোনা রোদের আশায় অপ্রস্ফুটিত ফুলের কলিটি আর কখনোই প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পাবে না। পৃথিবী ছেয়ে যাবে অন্ধকারে। ঘোর অন্ধকার...।

বিজ্ঞান ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছে এভাবে, 'একটি পর্যায়ে গিয়ে মহাকাশের তারাগুলো তাদের সব শক্তিমত্তা, তেজ হারিয়ে ফেলবে। যেসব তারকার ভর সৌর ভরের আট গুণের কম থাকে, অন্তিম দশায় পৌঁছালে তাদের কেন্দ্রের ভর চন্দ্রশেখরের সীমা, অর্থাৎ ১.৪ গুণ সৌর ভরের নিচে থাকবে। এরকম অবস্থায় যারা পতিত হবে তাদের বলা হয় 'শ্বেতবামন।' এর বিপরীতে, অর্থাৎ যেসব তারকার ভর সৌর ভরের আট গুণের বেশি থাকে, অন্তিম দশায় পৌঁছালে তাদের কেন্দ্রের ভর চন্দ্রশেখরের সীমা, অর্থাৎ ১.৪ গুণের মধ্যে থাকলে সেই তারকাগুলো 'নিউট্রন'

তারকায় পরিণত হবে। তবে এদের ভর যদি ৩ গুণ সৌরভর অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে তারা আর নিজেদের ধরে রাখতে পারে না। সংকুচিত হতে হতে এরা একটি ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়ে যায়।

আমাদের অতি প্রিয়, অতি পরিচিত সূর্যের বেলাতেও এই কথাগুলো প্রযোজ্য। সাম্প্রতিক বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে যে, সূর্যের জ্বালানি ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছে। সূর্যের জ্বালানি হলো Hydrogen Fuel. নাসার বিজ্ঞানীরা বলছেন, সূর্য তার ভেতরে যে-তাপ ধারণ করে আছে, গত ৪.৫ বিলিয়ন বছরে সেই তাপের প্রায় অর্ধেকটাই শেষ হয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত সূর্যের এই জ্বালানি খরচ হচ্ছে এবং কমছে নিজের তেজস্ক্রিয়তাও; কিন্তু সূর্যের তাপের মাত্রা এতই বেশি যে, তার ক্ষয়ে যাওয়া শক্তির ঘাটতি সাধারণত আমাদের চোখে পড়ে না। খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া এই ব্যাপারগুলো বোঝা যায় না। এভাবে নিজের শক্তি ক্ষয় হতে হতে এমন একটি সময় উপস্থিত হবে, যেদিন সূর্য একেবারেই আলোহীন এবং নিস্তেজ হয়ে পড়বে। আমাদের পরিচিত সূর্য পরিণত হবে শ্বেতবামনে।

তবে খুব শীঘ্রই যে এমনটি ঘটবে, তা নয়। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, সূর্যের মধ্যে এখনো যে-পরিমাণ জ্বালানি মজুদ আছে, সেই জ্বালানি দিয়ে আগামী আরও ৫ বিলিয়ন বছর সূর্য এভাবে বহাল তবিয়তে থাকতে পারবে।

নাসার বক্তব্য এবং তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে যে-সারমর্ম পাওয়া যায় তা হলো, সূর্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করছে যখন সূর্য আলোহীন, শক্তিহীন হয়ে পড়বে। শুধু সূর্যই নয়, সূর্যের মতো আরও অসংখ্য, অগণিত এরকম নক্ষত্রের ভাগ্যেও যে এই পরিস্থিতি জুটবে, সেটাও বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে খুব স্পষ্ট করে। ইতোমধ্যেই অসংখ্য নক্ষত্র নিজেদের শক্তি, জ্যোতি হারিয়ে শ্বেতবামন আর নিউট্রন তারকায় পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও হবে।

খুব মজার ব্যাপার হলো, আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে, মরুভূমিতে একজন নিরক্ষর লোকের ওপর নাযিল হওয়া পবিত্র কুরআনুল কারীমে ঠিক এই কথাগুলো খুব সুন্দর, খুব গোছালো এবং সুস্পষ্ট করে বলা আছে।

'প্রণোদনা' ম্যাগাজিনের এতটুকু পড়ে এবার আমি নড়েচড়ে বসলাম। আমি আসলে এতক্ষণ এই টুইস্টটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম; কিন্তু ঘটনা যে—এতটা কাহিনির রূপ নেবে, সেটি বুঝতে পারিনি। সূর্যের অন্তিম পরিণতি, সূর্যের জ্বালানির নিঃশেষ

হয়ে যাওয়া, শ্বেতবামন আর নিউট্রন তারকা সম্পর্কিত তথ্যাবলি আমাকে পুরোটাই চমকে দিয়েছে; কিন্তু এই ব্যাপারগুলো কুরআনে কীভাবে আছে সেই কৌতূহলটাই এখন বেশি। আর অপেক্ষা করতে পারছি না। পরের অংশটুকু পড়ার জন্যে মনটি ব্যাকুল হয়ে আছে। ধপাস করে গিয়ে বসলাম সাজিদের খাটে। চোখজোড়া 'প্রণোদনা' ম্যাগাজিনের ওই পাতাগুলোতেই আটকে আছে। আমি আবার পড়তে শুরু করলাম :

'এখন যে-কেউ প্রশ্ন করতে পারে, সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য চৌদ্দশো বছর আগের একটি বইতে কীভাবে থাকতে পারে? এই প্রশ্নটি আসা স্বাভাবিক। প্রথমত, আমাদের যে-জিনিসটি বুঝতে হবে তা হলো, এই কুরআন কোনো মানুষের লেখা বই নয়। এটি এমন এক সত্তার বাণী, যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরের সবকিছু। তিনিই সৃষ্টি করেছেন চাঁদ, তারা, সূর্য, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি। তিনিই সৃষ্টি করেছেন পাহাড়-পর্বত, নদী, সমুদ্র, বন—সবকিছুর ওপর তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি সময়ের বাঁধনে আবদ্ধ নন; বরং তিনিই সময়ের সৃষ্টিকর্তা। মহাকাশের ক্ষুদ্র তারকা থেকে গভীর সমুদ্রতলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালুকণা—এমন কোনো পদার্থ, এমন কোনো জিনিস নেই, যা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল নন। এদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবই তার জানা। সূর্য এবং নক্ষত্ররাজির সৃষ্টিকর্তাই তো জানবেন—এদের ভবিষ্যৎ পরিণতি কী হতে পারে। সুতরাং, সূর্যের সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আসা বাণীর মধ্যে সূর্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা থাকবে, এটি খুব আশ্চর্যের কিছু নয়। বিশ্বাসী মানুষমাত্রই এটি সহজে বুঝতে পারবে।

দ্বিতীয়ত এই কুরআন কোনো সাইন্সের বই নয়। অর্থাৎ এটি এমন কোনো বই নয় যে, এতে কেমিস্ট্রির বিক্রিয়া, পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র আর জীববিজ্ঞানের মোটা মোটা থিওরি এতে গৎবাঁধা লেখা থাকবে। এতে সাইন্স থাকবে না; বরং সাইন থাকবে। অর্থাৎ এতে থাকবে বহু নিদর্শন। এই নিদর্শনগুলো কোনো স্পেশাল বিজ্ঞানী বা কোনো স্পেশাল মানুষের জন্যে দেওয়া হয়নি। এগুলো সকল মানুষের জন্যই দেওয়া। তাই এগুলো এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যেন মাঠের কৃষক থেকে শুরু করে গবেষণাগারের বিজ্ঞানী, সবাই বুঝে নিতে পারে।

এবার তাহলে আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। কুরআন কোথায় বলেছে সূর্য একদিন তার সকল শক্তি নিঃশেষ করে আলোহীন, নিস্তেজ হয়ে পড়বে, তাই না?

আমরা প্রথমেই সূরা ইয়াসীনের আটত্রিশ নম্বর আয়াতের দিকে তাকাই। আয়াতটিতে বলা হচ্ছে 'And the Sun runs (on course) toward its stopping point. That is the determinaton of the exalted in might, the knowing'.

অর্থাৎ এই আয়াতের সরল বাংলা করলে এরকম হয়, 'আর, সূর্য ছুটে চলছে তার জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া গন্তব্যের দিকে। এটি মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের সুনিরূপিত নির্ধারণ।'

একটু গভীরভাবে যদি খেয়াল করি, এই আয়াতে সূর্যের জন্য নির্ধারিত গন্তব্য বোঝাতে যে-অ্যারাবিক ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি হলো 'লিমুসতাকাররিন।' এই আরবী শব্দের জন্য যদি আমরা ব্রিটিশ ইংরেজি ডিকশনারি খুলি, তাহলে দেখব যে, এই আয়াতের অর্থ করা আছে, 'The resting place, 'The stopping point'. সরল বাংলা করলে হবে, 'থেমে যাওয়ার স্থান', 'নির্ধারিত গন্তব্য' ইত্যাদি।

তাহলে কী বোঝা গেল? উক্ত আয়াতের ভাষ্যমতে, সূর্য তার জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া গন্তব্যের দিকে অবিরত ছুটে চলেছে। তার জন্যে একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট, একটি নির্দিষ্ট অবস্থা নির্ধারণ করা আছে, যে-সময়ে, যে-অবস্থায় এসে তাকে থেমে যেতে হবে এবং এটাই হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্ধারিত নিয়ম।

আধুনিক বিজ্ঞান কী বলছে? আধুনিক বিজ্ঞান বলছে—সূর্যের সকল জ্বালানি একটি নির্দিষ্ট সময় পরে শেষ হয়ে যাবে। সেদিন সূর্য হয়ে পড়বে তেজহীন, আলোহীন তথা শক্তিহীন। সূর্যের এই জ্বালানি প্রতিনিয়ত নিঃশেষ হচ্ছেই। একটি পর্যায়ে গিয়ে ঘটবে চূড়ান্ত পতন। সেদিন সূর্যকে থেমে যেতে হবে। ঠিক এই কথাগুলোই কি আল কুরআন আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে আমাদের জানায়নি?

শুধু তা-ই নয়। সূর্য যে একটি সময়ে আলো ও শক্তিহীন হয়ে পড়বে, সে ব্যাপারটি খুব স্পষ্ট করেই বলেছে কুরআন। সূরা তাকবিরের একেবারে শুরুতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, 'যখন সূর্য হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন।'

এই সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের আগের কিছু নিদর্শন নিয়ে কথা বলেছেন। সেখানে তিনি খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন, কিয়ামতের আগে সূর্য জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে। কিয়ামত কবে হবে সে-জ্ঞান আমাদের কারও জানা নেই। এমনকি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও কিয়ামতের চূড়ান্ত সময়টি

সম্পর্কে জানানো হয়নি। এই জ্ঞান কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছেই। তো, তিনি বলছেন, কিয়ামতের আগে সূর্য জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে। একই কথা কি আমাদের বিজ্ঞানও বলছে না? বিজ্ঞান কি বলছে না, একটি সময়ে গিয়ে সূর্য হারিয়ে ফেলবে তার তেজ, জ্যোতি ও শক্তি? বিজ্ঞান কি বলছে না, সূর্য হয়ে পড়বে আলোহীন? বিজ্ঞান কি বলছে না, সূর্য হয়ে যাবে শ্বেতবামন?

একটি দৃশ্য কল্পনা করার চেষ্টা করা যাক। মরুভূমির অঞ্চল। নিরক্ষর একজন লোক। দিনের আকাশে গনগনে সূর্য দেখে কেন তার মনে হবে এই সূর্য একদিন নেতিয়ে পড়বে? আলোহীন হবে? একজন সাধারণ মানুষ হলে তো তার ভাবা উচিত ছিল যে, এই সূর্য অবিনশ্বর। যার এত তেজ, এত শক্তি, এত তাপ, সে কীভাবে নিঃশেষ হতে পারে? আলোহীন হতে পারে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঠিক এরকম ভাবতেন যদি তিনি ঐশী বাণীপ্রাপ্ত না হতেন। যদি না তাকে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্যালাক্সির সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানাতেন—সূর্য একদিন আলোহীন হয়ে পড়বে। তাকে জানানো হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে। তবেই তিনি জেনেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান এই সময়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে-সকল তথ্য আমাদের জানাচ্ছে, সেই তথ্যগুলো সম্পর্কে আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। এটি যদি সুমহান আল্লাহর কাছ থেকেই না আসে তবে কীভাবে সম্ভব?

না। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। শুরুতেই বলেছিলাম যে, কেবল সূর্যই নয়, সূর্যের মতো আরও অসংখ্য তারকা, নক্ষত্রের কপালেও জুটবে একই ভবিতব্য। সূর্যের মতো সেগুলোও হয়ে পড়বে আলোহীন, শক্তিহীন ও তাপহীন। তাদের কেউ হয়ে যাবে শ্বেতবামন, আবার কেউ হয়ে যাবে নিউট্রন তারকা। ঠিক এই ইঙ্গিতটাও আমরা পবিত্র কুরআন থেকে পাই। যেমন সূরা তাকবিরের দ্বিতীয় আয়াতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, 'যখন নক্ষত্ররাজি পতিত হবে (বা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে)।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই আয়াতে 'পতিত হওয়া' বা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া' অর্থে যে-আরবী ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হলো—'ইনকাদারাত' انكَدَرَتْ। এটার দুটো অর্থ। প্রথম অর্থ হলো—কোনো কিছু আলোহীন হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় অর্থ হলো—ঝরে যাওয়া, বিচ্যুত হওয়া, পতিত হওয়া। আবার,

'কাদারাতুন' অর্থ হলো—বৃহদাকৃতির পিণ্ড বস্তু। আয়াতটিতে বলা হচ্ছে, 'ওয়া ইযান নুজূমুন কাদারাত।' অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি আলোহীন হয়ে বৃহদাকৃতির ঢেলা বা বস্তুপিণ্ডের রূপ ধারণ করবে।'

ঠিক এমনটাই আমরা ওপরে জেনেছি। আমরা জেনেছি যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে এসে সূর্যের মতো অন্যান্য উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজিও তাদের জ্যোতি হারিয়ে ফেলবে এবং তারা পরিণত হবে শ্বেতবামন আর নিউট্রন তারকায়। আলো, শক্তি-তেজ এবং তাপহীন। এই অবস্থাগুলোকে বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন এভাবে বলছে,

'যখন সূর্য জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে'

আর, খসে পড়বে নক্ষত্ররাজি'

এখানেও শেষ নয়। সূরা মুরসালাতের আট নম্বর আয়াতেও ঠিক একই কথা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন,

'যখন নক্ষত্ররাজি হয়ে পড়বে আলোহীন'

আজ সাম্প্রতিক বিজ্ঞান আমাদের যা জানাচ্ছে, সৃষ্টিকুলের মালিক কত আগেই-না তা আমাদের জানিয়ে রেখেছেন। তিনি মানুষকে সত্যানুসন্ধানী হতে বলেছেন। তার সৃষ্টিজগৎ থেকে খুঁজে বের করতে বলেছেন তার নিদর্শনসমূহ। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের বহু আগে একজন নিরক্ষর লোকের দ্বারা এগুলো রচনা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তার পক্ষে কখনোই বলা সম্ভব নয় যে, কীভাবে সূর্যের মতো এত তেজস্বী নক্ষত্র আলোহীন হয়ে যেতে পারে। কীভাবে সুবিশাল নক্ষত্ররাজি হয়ে পড়তে পারে আলো, শক্তিহীন। বলা তো দূরের কথা, তার ভাবনাতেও এগুলো আসা স্বাভাবিক যুক্তিবিরুদ্ধ, যদি-না তিনি কোনো ঐশীবাণী দ্বারা এগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত না হন। এই বাণীগুলো নিশ্চিতরূপে সেখান থেকেই আসা সম্ভব, যে-সত্তা এই আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি সুমহান আল্লাহ।

সাজিদের প্রবন্ধটি এখানেই শেষ। পুরো লেখাটি পড়ার পরে আমার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি বিমোহিত হয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। এতটা বিস্ময়ে ভরা আল কুরআন? মানুষকে জানাচ্ছে কিয়ামতপূর্ব কিছু নিদর্শন। অথচ, তার মধ্যেই কি না বিজ্ঞানের ছোঁয়া। সুবহানাল্লাহ!

আমি পকেট থেকে মোবাইল বের করে সাজিদকে ফোন করলাম। তাকে আজ টিএসসির সাতরঙা চা খাওয়াব। ওর ফোনে কল গেল না। বন্ধ দেখাচ্ছে। আমি কাপড়চোপড় পাল্টিয়ে টিএসসি যাওয়ার জন্যে রেডি হলাম। ইতোমধ্যেই দেখি একগাদা বই হাতে সাজিদ রুমে ঢুকল। তাকে বললাম, 'তোর ফোন বন্ধ পাচ্ছিলাম।'

সে বলল, 'ফোন চুরি গেছে।'

আমি বেশ অবাক হয়ে বললাম, 'কীভাবে?'

'এক আত্মীয়কে দেখতে গিয়েছিলাম পিজিতে। আসার পথে রিক্সায় কথা বলছিলাম ফোনে। পেছন থেকে এক ছোকরা ঝাপটা মেরে নিয়ে দৌড় দিল।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'বেচারা দৌড় দিল কেন?'

সাজিদ আমার কথা শুনে বেশ অবাক হলো। সে খুব কমই অবাক হয়। সে যখন অবাক হয় তখন তার চোখের পাতা নড়ে না। একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সে বলল, 'ছিনতাইকারী ছিনতাই করে দৌড় দেবে এটাই স্বাভাবিক নয় কি?'

আমি বেশ বিজ্ঞসুলভ চেহারায় বললাম, 'তা ঠিক; কিন্তু সে যদি জানত—তুই কোনো দিনও বেচারাকে ধাওয়া করবি না, তাহলে সে কিন্তু ফোন নিয়ে দৌড়ে পালাত না।'

আমি বুঝতে পারলাম সাজিদ এই মুহূর্তে বিশাল এক লেকচার শুরু করবে। সে আমাকে ক্রিমিনাল সাইকোলজির নানান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনিয়ে প্রমাণ করে ছাড়বে যে, ওই মুহূর্তে ছিনতাইকারীর কেন দৌড়টি দেওয়া যৌক্তিক ছিল। লেকচার শুরুর পূর্বেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'ওসব বাদ দে। আসল কথায় আসি। তোকে ফোন করেছিলাম একটি কারণে।'

'কী কারণ?' জানতে চাইল সাজিদ।

'তোকে এখন আমার সাথে টিএসসি যেতে হবে। আজ তোকে সাতরঙা চা খাওয়াব।'

সাজিদ কিছুই বলল না। কিছু না বলার মানে হলো সে আমার সাথে টিএসসিতে যাবে। তাকে বললাম, 'তোর আর্টিকেলটি একটু আগে পড়ে শেষ করলাম। ফাটাফাটি লিখেছিস। এ জন্যেই আজকে তোকে সাত রঙা চা খাওয়াব।'

এবারও সে কিছু না বলে তার চেয়ারে গিয়ে বসল। হাত থেকে বইগুলো রেখে আবার উঠে দাঁড়াল। আমি আবার বললাম, 'আচ্ছা, তুই না বলেছিলি এই ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ দিলে মফিজুর রহমান স্যার নাও ছাপাতে পারে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ছাপাল কীভাবে?'

'তা তো জানি না।'

'তার কোনো প্রতিক্রিয়া জানতে পেরেছিস?'

সাজিদ কোনো উত্তর না দিয়ে তার ব্যাগ থেকে একটি নীলরঙা খাম বের করে আমার হাতে দিল। সম্ভবত ভেতরে একটি চিঠি আছে। আমার হাতে খামটি দিয়েই সে ওয়াশরুমে ঢুকে গেল। আমি খামটি খুলে পড়তে শুরু করলাম :

সাজিদ,

প্রণোদনা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তোমার আর্টিকেলটি আমি পড়েছি। আমি বলব না—তোমার আর্টিকেলটি পড়ে আমি বিমোহিত হয়েছি। তোমার আর্টিকেল পড়ার পরের অনুভূতি বোঝানোর মতো শব্দ আমার ডিকশনারিতে মজুদ নেই। ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে ইতিপূর্বে তোমার সাথে আমার বেশ কয়েকবার ঠান্ডা বিতর্ক হয়েছে। খুব তাচ্ছিল্যভরে তোমাকে আমি 'মি. আইনস্টাইন' বলে ডাকতাম। আই অ্যাপোলোজাইয মাই সান। খুব ধার্মিক পরিবারে বেড়ে উঠলেও জীবনে আমি বেশ কড়া অবিশ্বাসীতে পরিণত হই। বারবার চেষ্টা করেছি এই হতাশাগ্রস্ত জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে। পারিনি; কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমার আর্টিকেলটি পড়ে আমার খুব করে আবার মন চাচ্ছে বিশ্বাসী শিবিরে ফিরে আসতে। আশা করছি আমি সফল হব। আমার জন্যে দোয়া কোরো। তোমাকে ধন্যবাদ।

তোমার স্যার
মুহাম্মদ মফিজুর রহমান

চিঠি পড়া শেষ হতে খেয়াল করলাম আমার চোখ দুটো খুব ভারী হয়ে উঠেছে। টুপ করে দু-ফোটা জল নিচেও গড়িয়ে পড়ল। আমার চোখের জলে এই নীল খাম যাতে ভিজে না যায় সে জন্য তাড়াতাড়ি খামটি নিরাপদে সরিয়ে ফেললাম। চোখের জলে এই নীলরং মুছে না যাক। এই নীল শুভ্রতার প্রতীক। এই শুভ্রতা পবিত্রতার বাহক। এই পবিত্রতা ছড়িয়ে পড়ুক সব প্রাণে। জগতের সকল দ্বিধাগ্রস্ত মফিজুর রহমান স্যারেরা এই শুভ্রতায় পবিত্র হয়ে উঠুক। আমি মনে মনে বললাম, 'সাজিদ, আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ মাই ফ্রেন্ড।'

সমুদ্রবিজ্ঞান

আজ আমার আবৃত্তির ক্লাস আছে। নতুন একটি আবৃত্তি ক্লাবে জয়েন করেছি সেদিন। কবিতার প্রতি অন্যরকম ভালোলাগা থেকেই মূলত আবৃত্তি ক্লাবে আসা। সারা দিন গুনগুন করে কবিতা আওড়াই। যেদিন থেকে আবৃত্তি শিখতে শুরু করেছি, সেদিন থেকে আমার মধ্যে অদ্ভুত কিছু ব্যাপার দেখা দিয়েছে। কয়েকদিন আগের কথা। সাজিদসহ ফিরছিলাম সদরঘাট থেকে। দেখতে গিয়েছিলাম বুড়িগঙ্গা নদী। একটি জীবন্ত, সতেজ আর শুদ্ধ স্রোতের নদী মানুষের অত্যাচারে কীভাবে ধুঁকেধুঁকে মরে যায়, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই বুড়িগঙ্গা।

আসার পথে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে খুব সুন্দর একটি বিলবোর্ড দেখলাম। সম্ভবত কোনো বেসরকারি এনজিওর বিলবোর্ড হবে। সাধারণত কোম্পানি আর কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিলবোর্ড হয় বলে জানতাম; কিন্তু এরকম এনজিওরও বিলবোর্ড থাকে সেটি আমি ওইদিনই জানতে পারলাম। যাই হোক, ওই বিলবোর্ডে বেশ সুন্দর কিছু কথা লেখা ছিল। মানবসেবাধর্মী কথা। কথাগুলোতে চোখ পড়ে যাওয়ায় আমি থমকে দাঁড়িয়ে সেগুলোর ওপর চোখ বুলাতে লাগলাম। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। আমি ওদিকে তাকিয়েই আছি। বিলবোর্ডের দিকে তাকিয়ে আমাকে এরকম 'হাঁ' হয়ে থাকতে দেখে সাজিদ বলল, 'ওটি কবিতা নয়, বিলবোর্ড। এত মনোযোগ দিয়ে পড়ার কিছু নেই।'

ওর কথা শুনে আমার সংবিৎ ফিরল। খেয়াল করলাম সে আমার দিকে বেশ বিরক্ত চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'মানুষ তো বায়োস্কোপের

মধ্যেও এভাবে চোখ ডুবিয়ে দেয় না, তুই বিলবোর্ডে যেভাবে ডুব দিয়েছিস।'

আমার এই হয়েছে এক সমস্যা। সবখানে আমি আজকাল সাহিত্য খুঁজে বেড়াই। আমার সেই খোঁজাখুঁজি বিলবোর্ড থেকে শুরু করে ঝালমুড়ির ঠোঙা পর্যন্ত বিস্তৃত।

সকাল থেকে আমি একটি কবিতাই আবৃত্তি করে যাচ্ছি। নির্মলেন্দু গুণের 'স্ববিরোধী' কবিতাটি।

আমি জন্মেছিলাম এক বিষণ্ণ বর্ষায়

কিন্তু আমার প্রিয় ঋতু বসন্ত।

আমি জন্মেছিলাম এক আষাঢ় সকালে

কিন্তু ভালোবাসি চৈত্রের বিকেল।

আমি জন্মেছিলাম দিনের শুরুতে

কিন্তু ভালোবাসি নিঃশব্দ নির্জন নিশি।

আমি জন্মেছিলাম ছায়াসুনিবিড় গ্রামে

ভালোবাসি বৃক্ষহীন রৌদ্রদগ্ধ ঢাকা।

জন্মের সময় আমি খুব কেঁদেছিলাম

এখন আমার সবকিছুতেই হাসি পায়।

আমি জন্মের প্রয়োজনে ছোট হয়েছিলাম

এখন মৃত্যুর প্রয়োজনে বড় হচ্ছি।

কবি নির্মলেন্দু গুণের একটি ব্যাপারের সাথে আমার বেশ মিল পাচ্ছি। কবি জন্মেছেন বর্ষায়; কিন্তু বর্ষার বদলে তার পছন্দের ঋতু হলো বসন্ত। বাবার কাছে শুনেছি, আমি নাকি জন্মেছিলাম ফাগুন মাসে। ফাগুনের আগুন লাগা সময়ে যখন গাছগুলো কৃষ্ণচূড়া ফুলে রক্তাক্ত লাল হয়ে ওঠে, ঠিক ওই সময়টাতেই নাকি আমার জন্ম। ফাগুন মাসে জন্মালেও লাল রং আমার একদম অপছন্দ। বিচ্ছিরি লাগে। নির্মলেন্দু গুণের সাথে আমার এরকম অপূর্ব মিল দেখে আমি যারপরনাই আনন্দিত।

সাজিদ তার বেডের ওপরে শুয়ে ম্যাগাজিন পড়ছে। আমি যে এত সুন্দর করে কবিতা আবৃত্তি করছি সেদিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। সবকিছুতেই তার এই নির্মোহ ভাবটি আমার কাছে বিরক্তিকর লাগে।

আমি তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'শুনছিস?'

সে মুখের ওপর থেকে ম্যাগাজিন না সরিয়েই বলল, 'বল।'

'আমার সাথে না নির্মলেন্দু গুণের একটি ব্যাপারে বেশ মিল আছে।'

সাজিদ বলল, 'হুম।' এটি বলেই সে আবার চুপ মেরে গেল। আমি আবার বললাম, 'কোন ব্যাপারে মিল আছে শুনবি না?'

'বল।'

আমি তার বেডে এসে বসলাম। বললাম, 'মুখের ওপর এরকম ছাতা টেনে রাখলে কথা বলা যায়?'

সে এবার ম্যাগাজিনটি সরিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'ঠিক আছে, বল।'

আমি এবার একটু নড়েচড়ে বসলাম। নিজের গল্প অন্যকে শোনাতে আমার বেশ লাগে। বললাম, 'কবি নির্মলেন্দু গুণের নাকি বর্ষাকাল পছন্দ না। অথচ তিনি জন্মেছেন ঘোর বর্ষায়।'

সাজিদ বলল, 'হুম।'

'তার সাথে আমার একটি মিল রয়েছে। আমি জন্মেছি ফাগুন মাসে; কিন্তু লাল রং আমার একদম অপছন্দ। বিচ্ছিরি।'

'ফাগুনের সাথে লাল রঙের কী সম্পর্ক?', জিজ্ঞেস করল সাজিদ।

'ওমা! ফাগুন মাসেই তো কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে, তাই না?'

'তো? কৃষ্ণচূড়া ফুল কি তুই পছন্দ করিস না?'

'তা তো করি।'

'তাহলে?'

'লাল রংটি কেমন যেন অপছন্দের।'

সাজিদ জোরে একটি নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'ফাগুন মাসের সাথে লাল রঙের কোনো সম্পর্ক নেই। ফাগুন মাসে অনেক অনেক ফুল ফোটে। সেই ফুলগুলোর কোনোটির রং সবুজ, কোনোটি নীল। কোনোটি আবার হলুদ। তার মধ্যে কৃষ্ণচূড়া হলো টকটকে লাল। কবির অপছন্দ হলো বর্ষাঋতু, আর তোর অপছন্দ কেবল একটি নির্দিষ্ট রং। কবির সাথে তাহলে তোর মিল কোথায়?'

সাজিদের সাথে আমি কখনো খুব বেশি তর্কে যাই না। আমার ধারণা পৃথিবীতে যদি সেরা তিনজন কাঠখোট্টা লোক নির্বাচন করা হয়, তার মধ্যে সাজিদের নামও থাকবে। দুনিয়ার সবকিছু নিয়েই তার বিশ্লেষণ থাকে। সেই বিশ্লেষণগুলো আবার যুক্তি, দর্শন আর বিজ্ঞাননির্ভর। একজন সুস্থ মানুষের মাথা ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে এরকম একজন লোকই যথেষ্ট।

দ্রুতই প্রসঙ্গ পাল্টানো উচিত। তাকে বললাম, 'হ্যাঁ রে, তোর পছন্দ কীসে? মানে, প্রকৃতির কোন জিনিসটি তোর বেশি পছন্দের?'

সাজিদ আবারও চুপ মেরে গেল। হঠাৎ করে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যাওয়াতে সে হয়তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে। আবার বললাম, 'তোর কি সমুদ্র দেখতে ভালো লাগে?'

সে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

আমি বললাম, 'চল, তাহলে আমরা একদিন সমুদ্র দেখতে যাই।'

আমার এই প্রস্তাবে সাজিদ রাজি হয়ে গেল। বললাম, 'কোথায় যাবি? কক্সবাজার না সেন্ট মার্টিন?'

সে কিছুক্ষণ ভেবে এরপর বলল, 'সেন্ট মার্টিন যাওয়া যায়।'

শীতের এই সময়টায় সেন্ট মার্টিনে থাকে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। সমুদ্রবিলাসী মানুষগুলো এই মৌসুমে দল বেঁধে এখানে আসে। স্বচ্ছ নোনা জল, পাথর বিছানো পথ আর দৃষ্টিসীমাজুড়ে জলতরঙ্গ—পৃথিবী যেন তার সব সৌন্দর্যের ডালাহাতে দাঁড়িয়ে আছে এই দ্বীপে।

এমন সময়ে টিকেট পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। তবে আমাদের 'থিওরি অফ এভ্রিথিং' বালক মাশুককে টিকেটের ব্যবস্থা করতে বলামাত্রই সে বলল, 'এটি কোনো ব্যাপার হলো দোস্ত?'

মাশুককে আমরা 'থিওরি অফ এভ্রিথিং' বলে ডাকি। আমাদের যার যা সমস্যা, সবকিছুর সমাধান মাশুকের কাছে পাওয়া যাবে। কারও ক্লাসে প্রক্সি দেওয়া লাগবে? মাশুককে বললেই কাজ হয়ে যায়। ডিপার্টমেন্ট চেয়ারম্যানের কাছে কোনো অভিযোগ করা লাগবে? মাশুকই ভরসা। ডিপার্টমেন্টে কোনো প্রোগ্রামের আয়োজন করা লাগবে? মাশুক একাই একশো। কারও কারও মতে, দুনিয়ায় এমন কোনো সমস্যার জন্ম হয়নি, যেটার সমাধান মাশুকের কাছে নেই। সেই থেকে মাশুকের নাম হয়ে গেছে 'থিওরি অফ এভরিথিং।'

মাশুক ঠিক ঠিক আমাদের জন্য তিনটে টিকেট জোগাড় করে নিয়ে এলো। সে কীভাবে যেন পেরে যায় সবকিছু। সে যখন টিকেট নিয়ে এলো, তখন আমি বেশ বিস্ময় নিয়ে বললাম, 'কীভাবে ম্যানেজ করলি?'

মাশুক তার সেই কমন ডায়ালগ ছেড়ে বলল, 'এটি কোনো ব্যাপার হলো দোস্ত?'

আসলেই তার কাছে এটি কোনো ব্যাপার না। এই কারণেই তার নাম থিওরি অফ এভ্রিথিং।

দু-দিন পর আমরা রওনা করলাম। আমি, সাজিদ আর রাজিব। রাজিবের পরিচয় দিয়ে নিই। পুরো ঢাবি ক্যাম্পাসের সেরা কয়েকজন ফটোগ্রাফারের একজন ও। শুধু ঢাবি বললে অবশ্য ভুল হবে, বাংলাদেশের সেরা ফটোগ্রাফারদের তালিকা করা হলে সেখানেও অনায়েসে ঢুকে পড়বে সে। ফটোগ্রাফিতে আন্তর্জাতিক পুরস্কারও এই বয়সে পকেটে পুরে নিয়েছে। আমার মুখে সেন্ট মার্টিন যাওয়ার কথা শুনেই এক পায়ে খাড়া হয়ে গেল যাওয়ার জন্য।

বাসে করে আমরা ঢাকা থেকে রওনা করলাম। আমাদের বাস যখন টেকনাফে এসে ঢুকল, তখন সন্ধ্যে প্রায়। প্রচণ্ড খিদেয় আমাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাওয়ার জোগাড়। পাশের একটি হোটেলে ঢুকে খাওয়া-দাওয়া সেরে বের হয়ে এলাম।

আমরা ধরেই নিয়েছিলাম—রাতের সমুদ্রবিলাস উদ্‌যাপন করতে করতেই আমরা সেন্ট মার্টিন গিয়ে পৌঁছাব; কিন্তু না। এখানে এসে জানতে পারলাম যে, রাতের বেলায় এখান থেকে কোনো জাহাজই সেন্ট মার্টিন যায় না। মহা বিপদ!

আমাদের বন্ধু মাশুক থাকলে এতক্ষণে কোনো না কোনো উপায় নির্ঘাত বের করে ফেলত। জাহাজ না-হলে ট্রলার, ট্রলার না-হলে নৌকায় চেপে সে আমাদের সেন্ট মার্টিন ফেলে আসতই। মাশুকের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল রাজিব। সে এদিক-ওদিক খোঁজখবর নিয়ে শেষমেশ একটি ট্রলারের সন্ধান পেল যেটি একটু পরেই সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশে ছাড়বে। সাধারণত, এরকম ট্রলারগুলো কতটুকু নিরাপদ সে ব্যাপারে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে বৈকি। তবুও সকল জল্পনা-কল্পনার পরে এই ট্রলারে করে সেন্ট মার্টিন যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

মাগরিবের সালাত পড়ে এসে ট্রলারে উঠে বসলাম। আমরা একা নই। আরও কিছু সেন্ট মার্টিনগামী যাত্রীও আমাদের সাথে আছে এই ট্রলারে।

দেখতে দেখতে কখন যে নাফ নদী পার হয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়লাম তা টের পাইনি মোটেও। ঢেউয়ের আধিক্য আর উপচে পড়ার শক্তিমত্তা দেখেই বুঝলাম যে, আমরা এখন নোনা জলের ওপরে ভাসছি। ঢেউগুলো একটির পর একটি এগিয়ে আসছে আর ভেঙে পড়ছে কূলঘেঁষে। দূরে তাকালে মনে হবে পুরো সমুদ্র দুধে ছেয়ে গেছে। রাতের বেলার সমুদ্র যে এত সুন্দর হয় তা আমি জানতাম না।

আমরা তিনজন বসেছি ট্রলারের সামনের দিকে। এদিক থেকে সমুদ্রটি অন্যরকম লাগছে দেখতে। রাজিব প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আমি যতদূর জানি সেন্ট মার্টিনে একশো ভাগ মুসলিম বাস করে। অথচ দ্বীপটির নাম সেন্ট মার্টিন কীভাবে হলো? একজন খ্রিস্টানের নামে?'

রাজিবের প্রশ্ন শুনে মনে হলো—এটি একটি ভালো প্রশ্ন। আস্ত একটি দ্বীপের নাম কীভাবে খ্রিস্টান ব্যক্তির নামে হয়ে গেল তা জানা জরুরি। উত্তরের জন্য আমরা সাজিদের দিকে তাকালাম। সে তখনো সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, 'আমাকে কিছু বলছিলি?'

রাজিব বলল, 'তোমাকেই তো বলছিলাম।'

'কী বলছিলি?'

'এই যে এই সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, এটার নাম সেন্ট মার্টিন হলো কীভাবে? আমি শুনেছি এই দ্বীপে নাকি একশো ভাগ মুসলিমের বসবাস। পুরোপুরি মুসলিম অধ্যুষিত একটি

অঞ্চলের নাম খ্রিস্টান কোনো ব্যক্তির নামে, ব্যাপারটি বেশ বেখাপ্পা।'

সাজিদ বলল, 'তোর হঠাৎ এই ব্যাপারটি মাথায় এলো কেন?'

সাজিদের পাল্টা প্রশ্নে চুপ হয়ে গেল রাজিব। তাকে চুপ মেরে যেতে দেখে আমার বেশ হাসি পেয়ে গেল। তার মন খারাপ দেখে সাজিদ আবার বলল, 'তোর ক্যামেরাটি দে।'

'কেন?', জানতে চাইল রাজিব।

'তোর একটি ছবি তুলব।'

'আমার ছবি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'মানুষ তো ফটোগ্রাফারদের তোলা সুন্দর সুন্দর ছবিই দেখে। মন খারাপের সময়ে ফটোগ্রাফারদের চেহারা যে ব্ল্যাক হোলের মতো অন্ধকার হয়ে যায়, সেটাও তো মানুষের জানা উচিত।'

সাজিদের কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেলল রাজিব। সম্ভবত চেহারার উপমাটি শুনে সে খুব মজা পেয়েছে। হেসে ফেললাম আমিও। হাসাহাসির পর্ব শেষে সাজিদ আবারও সমুদ্রবিলাসে ডুব দিল। সাঁই সাঁই করে বাতাস বইছে সাগরের বুকে। ট্রলারের দুলুনি খেতে খেতে আমরা ছুটে চলছি। অন্ধকার রাত। এই তল্লাটে কেবল আকাশ আর সাগরের মিতালি।

অনেকক্ষণ পরে রাজিব আবারও প্রশ্ন করে বসল সাজিদকে। বলল, 'তোমার নাকি সমুদ্র খুব পছন্দের?'

'হুম।'

'কেন?'

'সমুদ্রে একটি বিস্ময় আছে।'

'কীরকম বিস্ময়?'

'সমুদ্র একই সাথে সুন্দর এবং ভয়ংকর।'

'যেমন?'

'সমুদ্রের এই যে বিশালতা, উপচে পড়া ঢেউ, তার বুকে সূর্যের হারিয়ে যাওয়া, নীল জলরাশির উন্মত্ততা, এগুলো হলো সমুদ্রের অপার রহস্য আর সৌন্দর্য। আবার এই সমুদ্র যখন উন্মাতাল হয়ে যায়, সে হয়ে ওঠে বিধ্বংসী আর ভয়ংকর। যে-জলরাশির মাধ্যমে জীবন সঞ্চারিত হয়, সেই জলরাশিই হয়ে ওঠে জীবন হরণের কারণ। খুব অদ্ভুত না?'

সাজিদের কথা শুনে রাজিব বেশ অবাক হলো বলে মনে হলো। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'আসলেই অদ্ভুত!'

সমুদ্র নিয়ে যে সাজিদ এত দার্শনিকসুলভ চিন্তা-ভাবনা করতে পারে তা আমি জানতাম না। অবশ্য ওর যত দার্শনিকতা সব পেটের মধ্যেই জমিয়ে রাখে। প্রসঙ্গ এসে পড়লেই সেগুলো বের হয়ে আসে।

সমুদ্রের বুক চিরে ছুটে চলেছে আমাদের ট্রলার। সাজিদের ভাষায় ভয়ংকর এই সুন্দরের সাথে এরকম চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ খেলা খেলতে বেশ ভালোই লাগছে আমার।

রাজিব আবারও সাজিদকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মনে হচ্ছে সমুদ্র নিয়ে তোমার বেশ আগ্রহ আছে?'

সাজিদ মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো তোমার ঝুলিতে বেশ চমৎকার-সব গল্প আছে সমুদ্র নিয়ে, তাই না?'

সাজিদ আবারও মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল। রাজিব বলল, 'তাহলে তো সেই গল্পগুলো আমাদের সাথে তুমি করতেই পারো।' আমার দিকে তাকিয়ে রাজিব আবার বলল, 'তুমি কী বলো আরিফ?'

আমি বললাম, 'সহমত।'

সমুদ্র নিয়ে কোন ধরনের গল্প যে সাজিদ করবে তা আমার জানা নেই। সে বিভিন্ন দেশের সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়িয়েছে তার বাবার সাথে। সেগুলোর কিছু কিছু গল্প আমার সাথে সে শেয়ারও করেছিল আগে। পর্তুগিজ জেলেদের সমুদ্র থেকে তিমি মাছ শিকারের কাহিনিটাই সবচেয়ে মজার ছিল। সেটি নিয়ে সাজিদের বাবার লেখা একটি ইয়া বিশাল আর্টিকেলও আছে।

সাজিদ সম্ভবত এতক্ষণে ঠিক করে ফেলেছে—সে সমুদ্র নিয়ে কোন ধরনের গল্প করবে। একটু নড়েচড়ে বসে রাজিবকে দিয়েই শুরু করল। বলল, 'রাজিব, তোকে যদি এখন ধাক্কা দিয়ে ট্রলার থেকে ফেলে দিই, কেমন হবে তাহলে?'

রাজিব চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে বলল, 'কী অদ্ভুত! আমাকে সমুদ্রে ফেলতে যাবে কেন?'

আমিও বুঝলাম না ব্যাপারটি। সমুদ্রের গল্পে হঠাৎ করে এরকম ফেলে দেওয়া-দেওয়ি কীভাবে ঢুকল? রাজিবের চেহারার বিষণ্ণতা দেখে হেসে ফেলল সাজিদ। বলল, 'ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি কি সত্যি সত্যিই তোকে ফেলতে যাব নাকি? মজা করে বললাম।'

রাজিব বলল, 'তোমার কোনটি মজা আর কোনটি যে সিরিয়াস সেটি বোঝাই তো দুরূহ ব্যাপার।'

আমি মনে করেছিলাম রাজিব খুব সাহসী ছেলে। ফটোগ্রাফারদের বন-জঙ্গাল, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-অরণ্য চষে বেড়িয়ে প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর রূপ আর মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দী করতে হয়। এরকম কাজ রাজিবের মতো ভীতু টাইপের একটি ছেলেকে দিয়ে কীভাবে সম্ভব হচ্ছে সেটাই এখন আমার কাছে আশ্চর্যের।

সাজিদ বলল, 'তোদের তাহলে সমুদ্রের গল্পই বলা যাক, কী বলিস রাজিব?'

'শুরু করো শুরু করো', রাজিব উৎসাহের সাথে বলল।

সাজিদ নড়েচড়ে বসল। এরপর বলতে লাগল, 'সমুদ্রের অনেক ব্যাপার কম-বেশি আমরা সকলেই জানি। আজ আমি এমন কিছু বলব, যা সম্ভবত তোদের দুজনের কেউই জানিস না।'

'ওয়াও', বলে চিৎকার দিয়ে উঠল রাজিব। তাকে বেশ উৎসুক আর উৎফুল্ল বলে মনে হচ্ছে। সাজিদ যে নতুন কিছু বলতে যাচ্ছে সেটি নিশ্চিত। সে কখনো একই গল্প

দু-বার আমার কাছে বলবে না। তার মানে হলো সে এখন যে-গল্প বলতে যাচ্ছে সেই গল্প আমি আগে শুনিনি। নতুন গল্প শোনার জন্যে আমি নিজেও একপ্রকার উৎসুক হয়ে আছি বলা চলে।

সাজিদ বলতে শুরু করল, 'সমুদ্রের অপার সৌন্দর্যের মধ্যে একটি হলো তীরে উপচে পড়া ঢেউগুলো। এই ঢেউগুলো নিয়ে অসংখ্য কবিতা লেখা হয়েছে। এই ঢেউয়ের কথা এসেছে গল্প, উপন্যাস আর নাটকেও; কিন্তু যে-ঢেউ সাধারণত আমরা দেখে থাকি সেই ঢেউ ছাড়া আরও এক প্রকার ঢেউ আছে সমুদ্রে। মজার ব্যাপার হলো, এই ঢেউ নিয়ে কোনোদিন কোনো কবিতা লেখা হয়নি। এই ঢেউয়ের কথা কোনোদিন কোনো গল্প, উপন্যাস কিংবা নাটকেও আসেনি। এমনকি, গত শতাব্দীতেও বিজ্ঞানীরা এই ঢেউয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানত না।'

রাজিব বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'সেটি আবার কেমন ঢেউ?'

আমি বললাম, 'ঢেউ তো ঢেউই। ঢেউ আবার দুই প্রকার কীভাবে হয়?'

'হয়', বলল সাজিদ। 'এই ঢেউয়ের অস্তিত্ব ওপরে নয়, সমুদ্রের গভীরে।'

ব্যাপারটি আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। সাজিদকে বললাম, 'তুই বলতে চাইছিস যে সমুদ্রের গভীরেও এক ধরনের ঢেউ তৈরি হয় এবং তা অদৃশ্য থাকে? কেউ দেখতে পায় না?'

'এক্সাক্টলি', বলল সাজিদ। 'সমুদ্রের রয়েছে কয়েকটি স্তর। সব স্তরে পানির ঘনত্ব সমান থাকে না। কোনো স্তরে পানির ঘনত্ব কম আবার কোনো স্তরে বেশি। সমুদ্রের গভীরতা যত বেশি, পানির ঘনত্বও তত বেশি। আবার গভীরতা যত কম, পানির ঘনত্বও তত কম হয়।'

'তো?', প্রশ্ন রাজিবের।

'তো, সমুদ্রের এসব স্তরের মধ্যে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম সংযোগ। বেশি ঘনত্বের পানি যখন কম ঘনত্বের পানির সাথে এসে মেশে, তখন সেখানে একটি ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়।[১]

---

১ *Oceanography*, Page : 205

আমি বললাম, ‘এই ঢেউ চোখে দেখা যায় না?’

সাজিদ বলল, ‘না। কেবল পানির লবণাক্ততা এবং তাপমাত্রা পরীক্ষা করেই এই ঢেউয়ের অস্তিত্ব নিরূপণ করা সম্ভব। তাহলে বুঝতেই পারছিস খুব অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি না হলে এই ঢেউয়ের ব্যাপারে জানা কোনোভাবেই সম্ভব না এবং আরও মজার ব্যাপার হলো, বিজ্ঞানীরা মাত্র কয়েক বছর আগেই এ ব্যাপারে জানতে পেরেছে।’

রাজিব বলল, ‘মজার তো!’

সমুদ্রের তীব্র বাতাসে আমাদের শরীরে প্রচণ্ড কাঁপনি ধরিয়ে দিল। ভাগ্যিস আমরা ব্যাগে করে চাদর নিয়ে এসেছিলাম। গায়ে চাদর মুড়িয়ে আমরা আবার আড্ডায় মজে গেলাম।

‘বিস্ময়ের কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সমুদ্রের গভীরে রয়েছে এক অদ্ভুত রকমের অন্ধকার।’

‘অদ্ভুত রকমের অন্ধকার?’, জানতে চাইল রাজিব।

‘হ্যাঁ।’

‘কীরকম সেটা?’

‘সূর্য থেকে সাতটি রং সমুদ্রের পানিতে এসে পড়ে। এই সাতটি রং হলো লাল, নীল, বেগুনি, সবুজ, কমলা, আসমানী আর হলুদ।’

আমি বললাম, ‘তার মানে রংধনু?’

‘এক্সাক্টলি’, বলল সাজিদ। ‘রংধনুর রংগুলো যখন সূর্য থেকে সমুদ্রে এসে পড়ে, তখন সেগুলো সমুদ্রের পানি ভেদ করে গভীরে ঢুকতে থাকে। গভীরে যেতে যেতে এই রংগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।’

রাজিব বলল, ‘সাজিদ ভাই, তোমার কথার কিছুই কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না।’

‘আচ্ছা আমি বুঝিয়ে বলছি তোকে। সূর্য থেকে প্রতিফলিত আলোর রং যখন সমুদ্রের পানিতে মেশে, সেই রং তখন ধীরে ধীরে গভীরে প্রবেশ করতে শুরু করে।

সমুদ্রের প্রথম বিশ মিটার পর্যন্ত পানিতে কেবল লাল রঙেরই আধিক্য থাকে। এরপর বিশ মিটার পার হয়ে যখনই পঁচিশ মিটারে পৌঁছায়, তখন কিন্তু পানিতে আর লাল রং থাকে না। লাল রং এর আগেই মিলিয়ে গেছে।'

'প্রতি বিশ মিটার পরপরই কি এভাবে একেকটি রং ফিকে হয়ে হারিয়ে যায়?', প্রশ্ন করলাম আমি।

'অনেকটাই তা-ই', বলল সাজিদ। 'বলা চলে প্রতি বিশ থেকে ত্রিশ মিটারের পরেই একেকটি রং হারিয়ে ফিকে হয়ে যায়। একারণেই, সমুদ্রের প্রথম বিশ মিটারে যেকোনো কিছুকে লাল দেখায়, পরের বিশ মিটারে হলুদ, এরপরে নীল, তারপরে সবুজ।'

'দারুণ তো! এ তো দেখি সমুদ্রের নিচে রঙের খেলা', বলল রাজিব।

'হুম। তবে রঙের এই আধিপত্য দুইশো মিটার পর্যন্তই। দুইশো মিটারের ঘরে পৌঁছেই সব রং ফিকে হয়ে হারিয়ে যায়। ফলে সমুদ্রের নিচে দুইশো মিটারের পরে আর কোনো রঙের উপস্থিতি না থাকায় সেই অঞ্চল হয় একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেখানে যদি কেউ হাত বের করে চোখের সামনে আনে তারপরেও সে তার হাত দেখতে পাবে না।'

দুইশো মিটার নিচে কি কোনো মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব?', প্রশ্ন রাজিবের।

'তা অবশ্য অসম্ভব। তবে সাবমেরিন আবিষ্কারের পরে বিজ্ঞানীরা এমন অনেক অসম্ভব ব্যাপারকে জানার ব্যাপারে আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে; কিন্তু আজ থেকে মাত্র কয়েক বছর আগেও সমুদ্রের নিচের এই নিকষ কালো অন্ধকার সম্পর্কে কেউ জানত না। এমনকি এটাও জানত না যে, সমুদ্রের গভীরেও একটি ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। যদি জানত তাহলে সেগুলোও নিয়েও হয়তো কবিতা লেখা হতো। সেগুলোও হয়তো স্থান পেত কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যে।'

রাজিব বলল, 'আসলেই অদ্ভুত! প্রকৃতিজুড়ে এরকম কত রহস্য যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আল্লাহ মালুম।'

সাজিদ বলল, 'তবে, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের আগে এই ব্যাপারটি সম্পর্কে একজন কিন্তু ঠিকই জানে।'

উৎসুক চোখ নিয়ে রাজিব বলল, 'কে?'

আমার দৃষ্টিও সাজিদের দিকে নিবদ্ধ। একটু আগেই সে বলল, এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে নাকি সেদিনও কেউ কিছু জানত না, আবার এখন বলছে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের আগেও একজন ঠিকই জানত। কে হতে পারে সেই একজন?

আমিও প্রশ্ন করে বসলাম, 'কে?'

হেসে ফেলল সে। বলল, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। এবং শুধু তা-ই নয়, কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ব্যাপারে আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগেই মানবজাতিকে জানিয়ে রেখেছেন।'

রাজিবের চোখেমুখে বিস্ময়ের পারদ সর্বোচ্চ পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। সে এতক্ষণ বুঝতেই পারেনি যে, কাহিনি এরকম একটি মোড় নেবে। তা ছাড়া, অতি সাম্প্রতিক এই ব্যাপারগুলো কীভাবে সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগের কুরআনে থাকতে পারে সেটাও তার মাথায় ধরছে না। সে বলল, 'সত্যি সত্যিই?'

'হ্যাঁ। সত্যি সত্যিই।'

বিস্ময়ে তার কণ্ঠে উত্তেজনার আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। সে বলল, 'আমি শুনতে চাই প্লিজ।'

সাজিদ আরেকটু নড়েচড়ে বসল। এরপর বলতে শুরু করল, 'কুরআনের সূরা নূরের চল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাফিরদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এমন কিছু উপমা টেনেছেন, যা আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত। উক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, 'তাদের (কাফিরদের আমলের) অবস্থা হচ্ছে গভীর সমুদ্রে ঘনীভূত অন্ধকারের মতো, যাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ঢেউয়ের ওপর ঢেউ। তার উপরিভাগে রয়েছে ঘন মেঘমালা। অন্ধকারের ওপর আরেক অন্ধকার। কেউ যদি তাতে নিজের হাত বের করে তখন সে নিজের হাতটাও আর দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না তার জন্যে আর কোনো আলো থাকে না।'

খেয়াল করো, এই আয়াতে উপমার মূল বিষয়বস্তু হিশেবে কোনটি ধরা হয়েছে? সেটি হলো সমুদ্র। এরপর সেখানে নতুন উপমা হিশেবে নিয়ে আসা হয়েছে আরও কিছু ব্যাপার, যা আসলে সমুদ্রের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। সেগুলো কী কী? প্রথমে বলা

হলো তাদের অবস্থা হচ্ছে গভীর সমুদ্রে ঘনীভূত অন্ধকারের মতো। সমুদ্রের গভীরে যে অন্ধকার থাকে, সেটি সাবমেরিন আবিষ্কারের আগে মানুষ জানতই না। কারণ, সমুদ্রের নিচে যতটুকু পর্যন্ত মানুষ পৌঁছাতে পারত, তাতে কোনো অন্ধকারের লেশমাত্র ছিল না। আগেই বলেছি সমুদ্রের দুইশো মিটার গভীর পর্যন্ত আলো পৌঁছাতে পারে। এর নিচে আর আলো যেতে পারে না। ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি সাবমেরিন আবিষ্কারের আগে বিজ্ঞানীরাই জানত না, সেটি আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে জানলেন?

এরপরের অংশে বলা হচ্ছে, 'সেই অন্ধকারকে আচ্ছন্ন করে আছে ঢেউ এবং তার ওপরে আরও ঢেউ। তার উপরিভাগে রয়েছে ঘন মেঘমালা।'

এই অংশটুকু খুবই ইন্টারেস্টিং। আল্লাহ বলছেন, 'সেই অন্ধকারকে আচ্ছন্ন করে আছে ঢেউ এবং তার ওপর আরও ঢেউ।' এখানে খুবই স্পষ্টভাবে দুইটি ঢেউয়ের কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন। ঢেউ এবং তার ওপরে আরও ঢেউ এবং তার ওপরে মেঘমালা। তাহলে, এখানে প্রথম যে-ঢেউয়ের কথা বলা হচ্ছে সেটি হলো

সমুদ্রের গভীরের যে-ঢেউয়ের কথা বলেছিলাম, সেটাই। Internal Waves. এই ঢেউয়ের ওপরে রয়েছে আরেকটি ঢেউ। সেটি কোনটি তাহলে? সেটি হলো সমুদ্রের উপরিভাগের ঢেউ যা আমরা চোখে দেখি, উপভোগ করি। যে-ঢেউয়ের কথা কবি-সাহিত্যিকরা কবিতা-গল্প আর উপন্যাসে লিখে থাকে। এর ওপরে রয়েছে মেঘমালা। একদম ক্লিয়ার। সমুদ্রের উপরিভাগেই তো মেঘ থাকে। একটি আয়াতে উপমা টানতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুই দুইটি সমুদ্রবিজ্ঞানের কথা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। এটি আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে কোনো মানুষের পক্ষে জানা এবং বলে দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। এটি সমুদ্রের সৃষ্টিকর্তা, যার নির্দেশে সমুদ্র প্রবাহিত, তার পক্ষ থেকে আসা বলেই সম্ভব।'

রাজিবের মুখে কোনো কথা নেই। সে এতটাই হতভম্ব হয়ে গেছে যে—মুখ দিয়ে কোনো শব্দই বেরুচ্ছে না। সাজিদ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আরিফ, তোকে একবার ড. গ্যারি মিলারের ব্যাপারে বলেছিলাম না?'

'কোন গ্যারি মিলার? ওই যে ম্যাথমেটিশিয়ান, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। তার কথাই বলছি। তিনি একবার একটি ঘটনা বলেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এরকম, কানাডার টরেন্টোর এক নাবিককে একবার তার এক মুসলিম বন্ধু কুরআনের একটি কপি উপহার দিয়েছিল। বেচারা তখনো ইসলাম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, তবে কুরআন তিনি বেশ আগ্রহভরেই গ্রহণ করেছিলেন। কুরআন পড়ে শেষ করে যখন সেই মুসলিম বন্ধুর কাছে তিনি সেটি ফেরত দিচ্ছিলেন, তখন বললেন, 'আচ্ছা বন্ধু, এই বইটির লেখক মুহাম্মদ কি কোনো নাবিক ছিলেন?'

অর্থাৎ তিনি জানতে চাইলেন, এই বই যিনি লিখেছেন তিনি কোনো জাহাজের নাবিক ছিলেন কি না, যার সমুদ্র সম্পর্কে বেশ ভালো রকমের জানাশোনা ছিল। তিনি মূলত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই কুরআনের রচয়িতা মনে করেছিলেন। তখন সেই মুসলিম বন্ধু বলল, 'না তো। তিনি তো কোনো নাবিক ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন উত্তপ্ত মরুভূমির বাসিন্দা।' এই কথা শুনে তিনি খুবই অবাক হলেন। বললেন, 'কীভাবে সম্ভব? নাবিক কিংবা সমুদ্রবিজ্ঞান সম্পর্কে না জেনে এত নিখুঁত সামুদ্রিক অবস্থা বর্ণনা করা তো কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনোদিনও সম্ভব না।'

রাজিব বলল, 'তারপর?'

'তারপর আর কী। সেই লোকটি ইসলাম গ্রহণ করেন।'

রাজিব 'ওয়াও' বলে আবারও চিৎকার দিয়ে উঠল।

আমরা যখন সেন্ট মার্টিন এসে পৌঁছালাম তখন রাত নয়টা বেজে সাইত্রিশ মিনিট। ট্রলার থেকে নেমেই আমরা ভালো একটি হোটেলের সন্ধানে লেগে গেলাম। শেষমেশ যে-হোটেলটায় উঠলাম সেটার নাম 'সীমানা পেরিয়ে।' হোটেলের নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মানুষের ক্রিয়েটিভিটি দেখে আশান্বিত হওয়াই যায়।

লেট দেয়ার বি লাইট

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাইরের করিডোরে বসে আছি আমরা। আমি আর সাজিদ। পৌষের হাড় কাঁপানো শীত। অল্প দূরের বস্তুগুলোও ভারী কুয়াশায় আচ্ছন্ন। শীতের তীব্রতায় ঘরে টেকা যেখানে দায়, সেখানে এরকম খোলা পরিবেশে যে আমরা অপেক্ষার প্রহর গুনতে পারছি, সেটাই ঢের আশ্চর্যের।

আমরা অপেক্ষা করছি ডেভিডের জন্যে। ডেভিডের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে? ওই যে, সাজিদের সেই আমেরিকান বন্ধু, যার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় সাজিদের পরিচয় হয়েছিল। সে এখন অনর্গল বাংলা বলা শিখে গেছে। সাজিদ বলেছিল বাংলায় লেখা ওর মেইলগুলো পড়লে নাকি বোঝার উপায়ই নেই যে, এই ছেলে জন্মসূত্রে আমেরিকান। এমনকি বাংলা যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহারও নাকি খুব ভালোমতোই রপ্ত করেছে সে।

আজ ডেভিড দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশে আসছে। আমি আর সাজিদ ছাড়াও ডেভিডের আরও কিছু বাঙালি বন্ধু জুটেছে। তাদের সবাই খ্রিষ্টান। তার খ্রিষ্টান বন্ধুদের আমন্ত্রণে সে এবারের ক্রিসমাস ডে পালন করতেই মূলত বাংলাদেশে আসছে; কিন্তু ডেভিড নাকি বারবার করে সাজিদকে বলে রেখেছে আমরা যেন এয়ারপোর্টে তার জন্যে অপেক্ষা করি।

ঘড়ির কাঁটায় যখন সকাল সাতটা বাজে, ঠিক তখন ডেভিডের ফ্লাইট ল্যান্ড করে। ফ্লাইট ল্যান্ড করার বিশ মিনিট পরে কাঁধে একটি ইয়া মোটা ব্যাগ ঝুলিয়ে ডেভিড

বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমাদের খুঁজতে লাগল সে। আমরা ভিড়ের মধ্যে ছিলাম বলে সে আমাদের দেখতে পায়নি। চশমার গ্লাস নাড়তে নাড়তে তার চোখ দুটো আমাদের তখনো খুঁজে ফিরছিল। পেছন দিক থেকে এসে আমি চিৎকার করে বললাম, 'হাই ডেভিড। হেয়ার উই আর মাই ফ্রেন্ড।'

পেছনে ফিরে আমাকে দেখে সেও চিৎকার করে বলল, 'ওয়াও! আররিফ, নাইস টু মিট ইউ এগেইন।' এটি বলেই সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমার পেছনেই ছিল সাজিদ। সে বলল, 'ডেভিড, তোমার তো বাংলায় কথা বলার কথা। ইংরেজি কপচানোর তো কথা ছিল না।'

সাজিদকে দেখে ডেভিড আরেকবার চিৎকার করে বলে উঠল, 'হেইই, সাজিদ। কেমন আছ তুমি?' বলতে বলতেই সে সাজিদকে জড়িয়ে ধরল। আমেরিকানদের মধ্যে কোলাকুলির এই সংস্কৃতি আছে কি না জানি না। তবে সাজিদকে যেভাবে সে জড়িয়ে ধরল তা দেখে বোঝার উপায়ই নেই যে, সে কোনো বিদেশি। মনে হচ্ছে কোনো বাংলাদেশি বন্ধু অনেক বছর পরে দেশে ফিরে এসেছে। ডেভিডের চোখেমুখেও সে রকম উচ্ছ্বাস।

সাজিদ বলল, 'আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছো বলো তো?'

'ফাইন', ডেভিড বলল। 'ও সরি সরি। আই অ্যাপোলোজাইজ। আমার তো বাংলায় কথা বলার কথা, রাইট?'

আমি আর সাজিদ দুজনেই হেসে ফেললাম। আমি বললাম, 'তোমার অ্যাপোলোজিতেও কিন্তু বেশ ভালো রকমের ইংরেজি রয়ে গেছে। হা-হা-হা।'

মাথা চুলকাতে চুলকাতে এবার ডেভিডও আমাদের সাথে হেসে ফেলল।

আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করেছে। ডেভিড মাঝখানে, আমি আর সাজিদ তার দুই পাশে বসা। ডেভিড যত ভালোই বাংলা শিখুক, বাংলা বলার মধ্যে এখনো বেশ অস্পষ্টতা রয়ে গেছে তার। তার 'ত' উচ্চারণ এখনো 'ট' এর মতো শোনায়। সে বলল, 'শোনো সাজিদ, আগামীকাল তোমরা দুজনেই কিন্তু আমার সাথে যাচ্ছ।'

'কোথায়?', জানতে চাইল সাজিদ।

'অ্যালেনদের বাসায়।'

'অ্যালেন কে?', আমার প্রশ্ন।

ডেভিড বলল, 'অ্যালেন ক্রিস্টোফার। আমার বাঙালি বন্ধু।'

'ওখানে কী?', সাজিদ জানতে চাইল।

'আগামীকাল ক্রিসমাস ডে না? অ্যালেনদের বাসায় আমরা আগামীকাল একসাথে সেলিব্রেইট করব, ওকে?'

আমি বললাম, 'আই সী; কিন্তু ডেভিড, একটি সমস্যা আছে।'

ডেভিড বলল, 'সমস্যা? কী সমস্যা?'

'যেহেতু আমরা মুসলিম, তাই আমরা অন্য... ।'

আমাকে কথা শেষ করতে দিল না সাজিদ। আমাকে থামিয়ে দিয়েই সে বলে উঠল, 'ডেভিড, তোমার কি ক্ষুধা লেগেছে?'

ডেভিড আমার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সাজিদের দিকে তাকাল। বলল, 'ইয়াপ।'

সাজিদ বলল, 'এক কাজ করি। চলো আমরা ভাপা পিঠা খাই।'

সাজিদের কথা শুনে আমার বেশ রাগ হলো। আমাকে কথাটুকু শেষ করতে দিলে কী এমন হতো? আমি ডেভিডকে সুন্দরভাবেই বুঝিয়ে বলতাম যে, কেন একজন মুসলমানের উচিত নয় অন্য ধর্মাবলম্বীদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া; কিন্তু সাজিদের জন্যে আমি এগোতেই পারলাম না।

সাজিদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল ডেভিড। সে বলল, 'আমি বাংলাদেশি পিঠা খুব পছন্দ করি।'

আমি বললাম, 'তুমি আবার বাংলাদেশি পিঠা খেলে কবে?'

'আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কিছু বাঙালি ছেলেমেয়ে আছে। তাদের সাথে আমার খুব ভাব হয়েছে। ওরাই খাওয়ায় মাঝে মাঝে।'

আমি আবার বললাম, 'বাহ, তুমি তো দেখছি আমাদের চেয়েও বেশি বাঙালি বনে গেছ ভাই। গ্রেট জব!'

ঢাকার বিভিন্ন রাস্তার ধারে শীতকালীন পিঠা পাওয়া যায়। ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা ইত্যাদি। মাটির ঢেলার একটি চুলা বানিয়ে মহিলারা এসব পিঠা বানায় আর পথচারীরা কিনে খায়। এরকম একটি পিঠার দোকান দেখে আমাদের গাড়িটি থামল। আমরা সবাই পিঠা খাওয়ার উদ্দেশ্যে নেমে আসলাম বাইরে।

চালের গুড়া আর খেজুর গুড়ের ভাপা পিঠা খেতে খেতে ডেভিড শীতের আমেরিকা কীরকম হয় সেই গল্প সেরে নিল। পিঠা খাওয়ার পর্ব শেষ করে আমরা আবার গাড়িতে চড়ে বসলাম। চলতে শুরু করল আমাদের গাড়ি।

এবার প্রশ্ন করল ডেভিড। বলল, 'আরিফ, তুমি কী যেন বলছিলে তখন?'

সাজিদ বলল, 'আমি বলছি ডেভিড। আরিফ মে বি জানতে চাচ্ছিল যে, অ্যালেনদের বাসাটি ঢাকার কোনো জায়গায়। দূরে হলে কিন্তু ঢাকায় ট্রাভেল করা খুব ঝামেলার ব্যাপার। ঢাকার যে-ক'টি জিনিস বিখ্যাত, তার মধ্যে অন্যতম ঢাকার জ্যাম। তুমি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে জানো?'

ডেভিড বলল, 'ও মাই গড! এই ট্রাফিক জ্যামের কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। গতবার ঢাকা এসে আমি বুঝেছিলাম ট্রাফিক জ্যাম কাকে বলে।'

আমি আর সাজিদ আবারও হেসে উঠলাম। সাজিদ বলল, 'হ্যাঁ। এটাই তো সমস্যা। তা, অ্যালেনদের বাসাটি কোথায় যেন?'

সে বলল, 'আই ডোন্ট নো একচুয়ালি। তার সাথে কনট্যাক্ট করে জানতে হবে।'

'ঠিক আছে', বলল সাজিদ। 'কিন্তু ডেভিড, আমার একটি প্রশ্ন আছে।'

ডেভিড বলল, 'শিওর।'

'ক্রিসমাস ডে কেন পালন করা হয় সে ব্যাপারে আমরা তোমার কাছ থেকে জানতে চাই।'

ডেভিড অবাক হয়ে বলল, 'আই সী। তোমরা জানো না ক্রিসমাস ডে কেন পালন করা হয়?'

আমরা দুজনেই চুপ করে রইলাম। ডেভিড আবার বলল, 'ক্রিসমাস ডে হলো জিসাস ক্রাইস্টের জন্মদিন। এই দিনে, অর্থাৎ পঁচিশে ডিসেম্বর মাতা মেরী জিসাস ক্রাইস্টকে জন্ম দেন। আমাদের পরম পবিত্র ঈশ্বরের এই দিনে পৃথিবীতে আগমনের স্মৃতি হিশেবে আমরা পঁচিশে ডিসেম্বরকে ক্রিসমাস ডে হিশেবে পালন করি।'

সাজিদ বলল, 'আই সী...।'

সাজিদকে 'আই সী' বলতে দেখে ডেভিড বলল, 'সাজিদ, আমার কথা শুনে তুমি বেশ অবাক হলে বলে মনে হলো।'

সাজিদ বলল, 'অবাক হওয়ার মতোই তো ব্যাপার।'

সাজিদের কথা শুনে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনেই তো বড়দিন তথা ক্রিসমাস ডে পালন করা হয়। এ কথা তো একটি বাচ্চা ছেলেও জানে। এটি শুনে তো সাজিদের অবাক হবার কথা নয়।

আমার মতো ডেভিডও অবাক হলো। সে তার কপালের ভাঁজ মোটা করে বলল, 'অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার মানে? বুঝতে পারলাম না কিছুই।'

সাজিদ থামল একটু। বলল, 'আচ্ছা ডেভিড, তোমার জন্মদিন কবে?'

ডেভিড বুঝতে পারল না জিসাস ক্রাইস্টের জন্মদিনের সাথে তার জন্মদিনের কী সম্পর্ক। তারপরও সে বলল, জুলাইয়ের সতেরো তারিখ।'

সাজিদ বলল, 'বাহ। তোমার জন্মদিনের সাথে একজন বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মদিনের মিল রয়েছে।'

ডেভিড বলল, 'কার?'

'স্যার জর্জ ল্যামিত্রে। আধুনিক বিগ ব্যাং থিওরির জনক বলা হয় যাকে। তিনিও জন্মেছিলেন আঠারোশো চুরানব্বই সালের সতেরোই জুলাইতে।'

আমি বুঝতে পারছি না সাজিদ এসব কী আলাপ করছে ডেভিডের সাথে। বুঝতে না পারলেও কিছু করার নেই। চুপ করে শুনে যেতে হবে।

সাজিদ আবার বলল, 'আচ্ছা ডেভিড, তোমার জন্মদিন হলো জুলাইয়ের সতেরো তারিখে; কিন্তু আমি যদি তোমার জন্মদিন পালন করি জানুয়ারির পাঁচ তারিখে, তোমার তখন কেমন লাগবে?'

ডেভিড বলল, 'স্ট্রেইঞ্জ! জানুয়ারির পাঁচ তারিখে কেন আমার জন্মদিন পালন করতে যাবে?'

'যদি পালন করা হয়, তোমার কেমন লাগবে সেটাই বলো।'

ডেভিড চোখমুখ শক্ত করে বলল, 'এটি অবশ্যই ঠিক কাজ হবে না। আমি যেদিন জন্মেছি, সেদিনই আমার জন্মদিন পালন হওয়া উচিত। অন্য কোনো দিনে নয়।'

'দ্যাটস রাইট', বলল সাজিদ। 'একদম ঠিক বলেছ; কিন্তু আমি যদি বলি তোমরা ঠিক এমন একটি দিনে যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন পালন করো যেদিন আসলে তার জন্মদিনই নয়?'

এবার হাঁ হয়ে গেল ডেভিডের মুখ। চমকে গেলাম আমিও। কী বলল এটি সাজিদ? ডেভিড কিছুক্ষণ ওভাবেই তাকিয়ে ছিল সাজিদের দিকে। এরপর প্রশ্ন করল, 'কী বললে তুমি?'

সাজিদ বলল, 'আমি বললাম যে, খ্রিষ্টানরা যে-দিনটি যিশুর জন্মদিন হিশেবে পালন করে, সে-দিন আসলে যিশুর জন্মদিন নয়। তারা ভুল একটি দিনকে উদ্‌যাপন করে যাচ্ছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।'

বুঝতে পারলাম না। সাজিদ কি ড্যান ব্রাউন সাজতে চাচ্ছে নাকি? খ্রিষ্টানরা নাকি যুগের পর যুগ ধরে ভুল দিনে যিশুর জন্মদিন পালন করে আসছে। হাউ স্ট্রেইঞ্জ!

ডেভিড মুখ খুলল। বলল, 'সরি, ক্যুডন'ট আন্ডারস্ট্যান্ড। ক্যান ইউ ক্ল্যারিফাই ইট প্রোপারলি?'

এই প্রথম ডেভিডের মুখে ন্যাটিভ আমেরিকান টোন শুনলাম। সাজিদ নড়েচড়ে বসল। বলল, 'আচ্ছা, আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। তুমি কি কখনো তোমাদের পবিত্র বাইবেল আগাগোড়া পড়ে দেখেছ?'

ডেভিড না সূচক মাথা নাড়ল। পড়েনি। সাজিদ বলল, 'কোনো সমস্যা নেই; কিন্তু ডেভিড, আমি যদি তোমাকে বলি যিশু খ্রিষ্ট কোন দিনে জন্মগ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে বাইবেলে একটি শব্দও নেই, তুমি কি বিশ্বাস করবে?'

ডেভিড কোনো কিছুই বলল না। একটি প্রচ্ছন্ন নীরবতা নেমে এলো আমাদের মাঝে। সাজিদ আবার বলতে শুরু করল, 'ডেভিড, খুব আশ্চর্যের ব্যাপার হলেও সত্য এই যে, পুরো বাইবেলে যিশুর জন্মদিনের ব্যাপারে এক্সাক্ট একটি শব্দও তুমি খুঁজে পাবে না; বরং যিশুর জন্মদিন নিয়ে বাইবেল যা ইঙ্গিত করে, তা শুনলে তুমি নিজেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে।'

'যেমন?', জানতে চাইল ডেভিড।

'আচ্ছা, বল তো যিশু কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?'

ডেভিড দ্রুত উত্তর দিল। বলল, 'বেথেলহামে।'

'রাইট। এই বেথেলহাম কোন দেশে অবস্থিত জানো?'

'হ্যাঁ। ফিলিস্তিন।'

'এক্সাক্টলি। তুমি কি জানো ফিলিস্তিনে ডিসেম্বরে কোন ঋতু থাকে? আই মিন, এখন ফিলিস্তিনে কোন ঋতু চলছে?'

ফিলিস্তিন সম্পর্কে খুব বেশি জানাশোনা নেই ডেভিডের। এ জন্য সে বলতে পারল না ডিসেম্বরে ফিলিস্তিনে কোন ঋতু চলে। তাকে হেল্প করল সাজিদ। বলল, 'আমি বলছি। ডিসেম্বরে ফিলিস্তিনে এখানকার মতোই শীতকাল। তবে ফিলিস্তিনের শীতটা আরও প্রকট। ইউরোপের মতো শীতকালে ওখানেও তুষারবৃষ্টি হয়। গরমকালে প্রচণ্ড গরম আর শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডা, শীতল হয়ে পড়ে ওই অঞ্চল।'

ডেভিড বলল, 'আই সী।'

সাজিদ আবার বলতে শুরু করল, 'এবার তোমাকে বাইবেল থেকেই যিশুর জন্মদিনের কথা শোনাই। তুমি কি কখনো বাইবেলের লূক পড়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। লূকের শুরুতেই কিন্তু যিশু খ্রিস্টের জন্মের কাহিনি বর্ণনা করা আছে। সেখানে কী বলা আছে জানো?'

ডেভিড তাকিয়ে আছে সাজিদের দিকে। সাজিদ বলল, লূকের কাহিনিতে বর্ণনা করা আছে যে, যিশু খ্রিস্টের জন্ম হয় বেথেলহামে। রাজ্যে যখন আদমশুমারির ডাক পড়ে, তখন সুদূর গালীল প্রদেশের নাসরত থেকে যিশুর বাগদত্তা পিতা জোসেফ, যিশুর মাতা মেরীকে নিয়ে বেথেলহামে আসেন। মেরী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। বেথেলহামে আসার পরেই যিশু ভূমিষ্ঠ হয়।'

ডেভিড বলল, 'এই শ্লোক আমি পড়েছি; কিন্তু এটি দিয়ে তুমি কী বোঝাতে চাইছ, সাজিদ?'

সাজিদ বলল, 'তুমি এখনো বুঝতে পারোনি?'

'না।'

'আচ্ছা। আমি আরও সহজ করে বলছি। খেয়াল করো, প্রথমত, মাতা মেরী অন্তঃসত্ত্বা। দ্বিতীয়ত, গালীল প্রদেশ থেকে বেথেলহামে আসতে হলে তাদের পাড়ি দিতে হবে বহুদূরের পথ। রাইট?'

'হ্যাঁ।'

'তৃতীয়ত, মাসটি যদি সত্যিই ডিসেম্বর হয়ে থাকে, তাহলে তো তুষারপাতে ঢাকা রাস্তা ভেঙে এতদূরের পথ পাড়ি দিয়ে মাতা মেরীকে নিয়ে বেথেলহামে আসা কোনোভাবেই জোসেফের পক্ষে সম্ভব না। তোমার কি মনে হয় বরফে আচ্ছাদিত অঞ্চলে, মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীকে নিয়ে কোনো পুরুষ বেথেলহামে আসতে পারে?'

কিছুই বলল না ডেভিড। সাজিদ আবার বলতে লাগল, 'শুধু তা-ই নয়। কোনো রাজা কখনোই এরকম প্রচণ্ড শীতের সময়ে তার রাজ্যের আদমশুমারি ডাকবেন না। কারণ, এরকম পরিস্থিতিতে রাজ্যের সকল প্রান্ত থেকে লোকজনের পক্ষে এসে হাজিরা দিয়ে যাওয়া জাস্ট ইমপসিবল।'

ডেভিড বলল, 'তো, তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে, যিশু বেথেলহামে জন্মগ্রহণ করেনি?

তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে, বাইবেলের কাহিনিগুলো বানোয়াট?'

'না। আমি তা বলিনি ডেভিড। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে, এই ঘটনাগুলো ডিসেম্বরে, অর্থাৎ বরফজমা শীতের মৌসুমে সম্ভব না।'

'মানে?'

'মানে হলো, এই ঘটনাগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এগুলো অবশ্যই শীত মৌসুমের ঘটনা নয়। কীভাবে মাতা মেরী যিশুকে গর্ভে নিয়ে পাড়ি দেবেন বরফঢাকা পথ? কীভাবে একজন রাজা এমন সময়ে আদমশুমারি ডাকতে পারেন যখন রাজ্যজুড়ে নেমে আসে বরফ ঢাকা শীতের মৌসুম?'

'তাহলে?'

'হতে পারে, এই ঘটনাগুলো ডিসেম্বর ব্যতীত অন্য মাসের। অন্য মৌসুমের।'

'কোন মাস বা কোন মৌসুম?'

'সে ব্যাপারে বাইবেল অবশ্য নির্দিষ্ট করে কিছুই বলে না।'

আমাদের গাড়ি শাহবাগে এসে থামল। সাজিদ গাড়ি ভাড়া পরিশোধ করতে করতে বলল, 'একটু আগেই নেমে গেলাম আমরা। কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে, কী বলো ডেভিড?'

'ফাইন', ডেভিড বলল। 'আমরা কি টিসিতে যাব না?'

আমি ফিক করে হেসে ফেললাম। বললাম, 'ওটি টিএসসি হবে, মাই ফ্রেন্ড।'

'ও হ্যাঁ। টিএসসি।'

'আমরা ওদিকেই যাচ্ছি', বলল সাজিদ।

শাহবাগের প্রশস্ত রাস্তা ধরে হাঁটছি আমরা। প্রশ্ন করল ডেভিড। বলল, 'তো, তুমি বলতে চাচ্ছ যে, যিশু ডিসেম্বরে, অর্থাৎ পঁচিশে ডিসেম্বরে জন্মগ্রহণ করেনি, তাই তো?'

'আমি বলছি না আসলে। বাইবেলের বর্ণনা সে রকমই ইঙ্গিত করছে', বলল সাজিদ।

'আই সী। কেবল এটুকু ইঙ্গিত দিয়ে কি প্রমাণিত হয় যে, যিশু ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখে জন্মাননি? আই থিংক, তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে বাইবেলে এরকম আরও কিছু তথ্য থাকার কথা।'

'আছে', সাজিদ বলল। 'লূকের দ্বিতীয় অধ্যায়েই আরও কিছু তথ্য আছে যা নির্দেশ করে যে, যিশু আসলে ডিসেম্বরে নয়, এমন কোনো একটি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন শীত ঋতু ছিল না।'

'যেমন?'

'যেমন লূকের আট নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে, 'যে-রাতে যিশু জন্মগ্রহণ করছিলেন, ওই সময়টায়, অর্থাৎ রাতের বেলায় মেষপালকরা মাঠে তাদের মেষ পাহারা দিচ্ছিল।' এই শ্লোক থেকে কয়েকটি ব্যাপার আমাদের বোঝার আছে। আগেই বলেছি ডিসেম্বরে বেথেলহামে প্রচণ্ডরকম শীত পড়ে। তুষারপাতও হয়। এমন একটি সময়ে, রাতের বেলা মেষপালকরা কোন দুঃখে মাঠে মেষ চরাবে? এটি একেবারেই অসম্ভব এবং অযৌক্তিক। প্রথমত, প্রচণ্ড শীতের রাতে মেষপালক এবং মেষ দুটোরই বাইরে থাকা অযৌক্তিক। দ্বিতীয়ত, সে-রকম শীতের রাতে আকাশ কুয়াশায় ঢাকা থাকে। চারদিকে থাকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এরকম অন্ধকার পরিবেশে মেষপালকরা মাঠে মেষ ছেড়ে দিয়ে পাহারা দিচ্ছে, ব্যাপারটি খুব অযৌক্তিক নয় কি ডেভিড?'

'তো, তুমি বলতে চাচ্ছ এই ঘটনা মিথ্যা?'

'তুমি সম্ভবত আমাকে আবার ভুল বুঝছ, ডেভিড। আমি বলছি না যে, এই ঘটনা মিথ্যা; বরং আমি বলতে চাচ্ছি যে, বাইবেলের এই ঘটনা ডিসেম্বর মাসের কনকনে শীতের রাতে ঘটা একেবারেই অসম্ভব।'

'তাহলে?'

'এই ঘটনা ডিসেম্বর মাসের শীত ঋতুর নয়। এই ঘটনা নিশ্চিতরূপে গ্রীষ্ম ঋতুর। কারণ, গ্রীষ্মকালে আকাশে চাঁদের জোছনা থাকে। আবহাওয়া গরম এবং শুষ্ক থাকে। এমন সময়েই সাধারণত মেষপালকরা রাতে তাদের মেষ চরাবে। বাইবেলের ইঙ্গিত এবং যুক্তি তা-ই বলে।'

ডেভিড কিছুই বলল না। সাজিদ আবার বলতে শুরু করল, 'খেয়াল করো, যিশুর বাগদত্তা পিতা জোসেফ এবং যিশুকে গর্ভে নিয়ে মাতা মেরীর পক্ষে কি কখনোই গালীল প্রদেশের নাসরত অঞ্চল থেকে বরফে আচ্ছাদিত পথ, কুয়াশার আস্তরণ মাড়িয়ে বেথেলহামে আসা সম্ভব ছিল? ছিল না। যুক্তিতে বিশ্বাসী এমন যে-কেউ বলবে যে, এটি কোনোভাবেই সম্ভব না। তাছাড়া, একজন রাজাও এমন সময়ে রাজ্যে আদমশুমারি ডাকবেন না, যখন ওই রাজ্যে কনকনে শীতকাল। চারদিকে তুষারপাত। তিনি ভালো করেই জানেন—এরকম পরিস্থিতিতে দূর-দূরান্তের প্রজাদের পক্ষে বেথেলহামে আসা সম্ভব না। তাই তিনি ডিসেম্বরে আদমশুমারি ডাকবেন, এটি অসম্ভব। তাহলে কোন সময়ের ঘটনা হতে পারে এটা? হতে পারে এমন সময়ের যখন আবহাওয়া শুষ্ক ছিল। রাস্তাঘাট ভালো ছিল। তাহলে মেরী এবং জোশেফের পক্ষে গালীল প্রদেশ থেকে বেথেলহামে আসা সহজ। আর, রাজাও এমন সময়ে আদমশুমারি ডেকেছিলেন যখন আবহাওয়া শুষ্ক ছিল। কারণ, আদমশুমারিগুলো সাধারণত ফসল কাটার পর পর ডাকা হতো। কিন্তু ডিসেম্বর কোনোভাবেই ফসল কাটার মৌসুম নয়। তাহলে কোন সময়ের ঘটনা হতে পারে এটি? হতে পারে গ্রীষ্ম ঋতুর ঘটনা।'

'তাহলে?', প্রশ্ন ডেভিডের।

'তাহলে দুইয়ে দুইয়ে চার হয়। মানে, জোসেফ এবং মেরী এমন সময়ে বেথেলহামে এসেছিলেন যখন আবহাওয়া শুষ্ক ছিল এবং রাস্তাঘাট ভালো ছিল। রাজাও এমন একটি সময়ে আদমশুমারি ডেকেছিলেন যখন আবহাওয়া শুষ্ক ছিল। আবার অন্যদিকে, মেষপালকরাও এমন একটি সময়ে, রাতের বেলা মেষ চরাচ্ছিল যখন আকাশে জোছনা ছিল। আবহাওয়া শুষ্ক ছিল। কনকনে শীত ছিল না। মোদ্দাকথা, বাইবেলের বর্ণনা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যিশু আসলে শীতের সময়ে, অর্থাৎ ডিসেম্বরে জন্মগ্রহণ করেননি।'

আমি এতক্ষণ চুপ করেই ছিলাম; কিন্তু আর চুপ থাকতে পারলাম না। বললাম, 'সাজিদ, তোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, যিশু পঁচিশে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেননি; কিন্তু আমার প্রশ্ন, কুরআনে কি যিশু, আই মিন ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত আছে?'

আমার প্রশ্নের সাথে ডেভিডও মাথা নেড়ে সহমত জানাল। সম্ভবত সেও এই প্রশ্নটাই মনে মনে প্রস্তুত করছিল। সাজিদ বলল, 'বাইবেলের মতো কুরআনও ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো দিন-তারিখের ব্যাপারে বলে না। তবে কুরআনে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের সময়ের পরিবেশ সম্পর্কে।'

'যেমন?', আমি জানতে চাইলাম।

'যেমন ধর, পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ একটি সূরার নামই হলো মারইয়াম। ঈসা আলাইহিস সালামের মাতার নামে এই সূরার নামকরণ। এই সূরার মধ্যে ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মের সময়কার কয়েকটি চিত্রের বর্ণনা আছে। মারইয়াম আলাইহাস সালাম যখন আল্লাহর ইচ্ছায় গর্ভবতী হলেন, তখন তিনি খুব ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন তার কওম তার বিরুদ্ধে-না আবার ব্যভিচারের অপবাদ আনে! মারইয়াম আলাইহিস সালাম ছিলেন পূত-পবিত্র নারী। তাকে কোনোদিন কোনো পুরুষ স্পর্শও করেনি। কওমের নিন্দার ভয়ে তিনি লোকালয় থেকে দূরে কোথাও চলে গেলেন। যখন তার প্রসববেদনা শুরু হয়, তখন তিনি একটি খেজুর গাছের নিচে অবস্থান করছিলেন। প্রচণ্ড ব্যথা আর কওমের নিন্দার ভয়ে তিনি একেবারেই ভেঙে পড়লেন। প্রচণ্ড দুঃখবোধ থেকে তিনি ওই মুহূর্তে মুখে বিড়বিড় করে যে-কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলো হুবহু কুরআনে স্থান পায়। সূরা মারইয়ামের তেইশ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে, 'হায়! এর আগেই (অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম ভূমিষ্ঠের আগেই) যদি আমি মরে যেতাম এবং মুছে যেতাম মানুষের স্মৃতি থেকে।'

এমন সময় তাকে শান্তনা দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হলো, 'তুমি চিন্তা কোরো না। তোমার রব তোমার পায়ের নিচে একটি ঝরনা সৃষ্টি করেছেন। আর তুমি খেজুর গাছের ডাল ধরে নাড়া দাও। তাহলে সেখান থেকে তোমার জন্য পাকা খেজুর পড়বে।' এই কথাগুলো আছে সূরা মারইয়ামের চব্বিশ এবং পঁচিশ নম্বর আয়াতে।'

আমি বুঝতে পারলাম না, এখান থেকে সাজিদ কী প্রমাণ করতে চাচ্ছে। সম্ভবত ডেভিডও বুঝতে পারেনি। আমি বললাম, 'এই আয়াতগুলো থেকে কী প্রমাণিত হয়?'

সাজিদ বলল, 'পঁচিশ নম্বর আয়াতটি খেয়াল কর। ওই আয়াতে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে কী করতে বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে তিনি যেন খেজুর গাছের ডাল ধরে

নাড়া দেন। তাহলে খেজুর গাছ থেকে পাকা খেজুর পড়বে এবং তা মারইয়াম আলাইহাস সালাম খেতে পারবেন।'

'তো?'

'এখনো বুঝতে পারিসনি?', সাজিদ আমার কাছে জানতে চাইল।

আমি মুখ কালো করে বললাম, 'না।'

হঠাৎ 'ইয়েস...ইয়েস...' শব্দে চেঁচিয়ে উঠল ডেভিড। এই আমেরিকানকে এভাবে চিৎকার দিয়ে উঠতে দেখে আমি যারপরনাই অবাক হলাম বটে। ডেভিড বলল, 'আমি মনে হয় বুঝতে পেরেছি তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ।'

'কী?', প্রশ্ন সাজিদের।

'মারইয়ামকে বলা হলো খেজুর গাছের ডাল ধরে নাড়াতে। তাহলে খেজুর গাছ থেকে পাকা খেজুর পড়বে। তার মানে হলো, ডিসেম্বর বা শীতকালে তো খেজুর পাকার কথা নয়। খেজুর পাকে গ্রীষ্মকালে। যেহেতু ওই সময়ে গাছে পাকা খেজুর থাকার কথা বলা হচ্ছে, তাহলে সময়টি নিশ্চিত ডিসেম্বর নয়। কারণ, ডিসেম্বরে কোনোভাবেই খেজুর গাছে পাকা খেজুর থাকবে না।'

সাজিদ মুচকি হাসল। বলল, 'ইউ আর রাইট মাই ফ্রেন্ড। ঠিক এই ব্যাপারটিই আমি বলতে চাচ্ছিলাম। কুরআনের এই ইঙ্গিত থেকেও বোঝা যায় যে, ঈসা আলাইহিস সালাম ডিসেম্বরের শীতে নয়; বরং গ্রীষ্মের কোনো একটি সময়ে জন্মেছেন। বাইবেল থেকেও এরকম ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। তাহলে ডেভিড, যে-দিনটায় আসলে যিশু জন্মই নেননি, সে দিনটি তার জন্মদিন হিশেবে পালন করা কি আদৌ ঠিক? তুমি বলো?'

ডেভিডের উৎফুল্ল চেহারা মুহূর্তেই আবার অন্ধকারে ছেয়ে গেল। সে বুঝতে পারছে না—কীভাবে তারা যুগের পর যুগ ধরে ভুল একটি দিনে যিশুর জন্মদিন পালন করে যাচ্ছে। ডেভিড মুখ কালো করে বলল, 'সাজিদ, পঁচিশে ডিসেম্বরে যদি যিশু জন্মগ্রহণ না-ই করে, তাহলে খ্রিস্টানরা কেন এই দিনে যিশুর জন্মদিন পালন করে?'

'সরি টু সে মাই ফ্রেন্ড। কোনো খ্রিস্টানের কাছেই এই প্রশ্নের যথাযথ কোনো উত্তর নেই।'

'এই দিনটি কীভাবে তাহলে যিশুর জন্মদিন হিশেবে স্বীকৃতি পেল?'

'সে ইতিহাস অবশ্য অনেক লম্বা। সেই গল্পটি চা খেতে খেতে করা যাক, চলো... ।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে টিএসসিতে চলে এলাম। মতি ভাইয়ের দোকানের টুলে এসে বসলাম আমরা তিন জন। আমাদের সাথে সাদা চামড়ার এই আগন্তুককে দেখে খানিকটা অবাক হলেন টিএসসির এই সুদর্শন চা-ওয়ালা। একটু পরপর তিনি ডেভিডের দিকে তাকাচ্ছেন। আমাদের দেখে ইতোমধ্যেই কেটলিতে পানি বসিয়ে দিয়েছেন তিনি। মতি ভাইকে নিয়ে আমাদের ক্যাম্পাসে বেশ ভালো রকমের গল্প রটানো আছে। কথিত আছে, তিনি নাকি গ্রামে থাকাবস্থায় কোনো এক পরীর সাথে প্রেম করতেন। দীর্ঘ দুই বছরের প্রেমের ইতি ঘটে, যখন মতি ভাই চায়ের দোকান নিয়ে বসে। মতি ভাই চা বিক্রি করছেন, এটি জানতে পেরেই নাকি পরী মতি ভাইয়ের সাথে ব্রেকআপ করে। একটি পরীর বয়ফ্রেন্ড সামান্য চা-বিক্রেতা, এটি সম্ভবত জিন-সমাজে বেশ অপমানজনক ব্যাপার। এ জন্যেই পরীটি মতি ভাইকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

আমি মতি ভাইকে বললাম, 'তা মতি ভাই, তোমার পরী কি পরে আর আসছিল?'

মতি ভাই বেশ নরম সুরে বললেন, 'না। আর আইব কিয়েল্লাই। হেতির আর আমারে দিয়া কাম কী কও?'

'কোনো চিঠিপত্রও কখনো পাঠায়নি?'

এবারও মতি ভাই 'না-সূচক' উত্তর দিলেন। এরপর বললেন, 'তোমাদের কি আদা চা-ই দিমু?'

আমি বললাম, 'তা-ই দাও।' ডেভিডের দিকে ফিরে বললাম, 'ডেভিড, তুমিও কি আদা চা-ই খাবে?'

ডেভিড আমেরিকান ইংরেজিতে বলল, 'হোয়্যাট ডাজ ইট মিন বাই আদা চা?'

ডেভিডের ইংরেজি শুনে মতি ভাই আমাকে বলল, 'কেডা এই লোক?'

'আমাদের বন্ধু।'

'কই থাহে?'

'আমেরিকা। বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছে।'

মতি ভাই 'ও' বলে আবার চা বানানোয় মন দিল। সাজিদ ডেভিডকে আদা চায়ের ব্যাপারে বুঝিয়ে বলার পরে ডেভিডও আদা চা খাওয়ার ব্যাপারে রাজি হয়ে গেল। ডেভিড বলল, 'সাজিদ, এবার বুঝিয়ে বলো কেন খ্রিষ্টানরা ভুল দিনে ক্রিসমাস ডে পালন করে।'

সাজিদ গলা খাঁকারি দিল হালকা করে। বলল, 'সারপ্রাইজিং ট্রুথ কী জানো ডেভিড? এই ক্রিসমাস ডের সাথে ক্রিশ্চিয়ানিটির আসলে কোনো সম্পর্কই নেই।'

সাজিদের এই কথা শুনে ডেভিড আর আমি দুজনেই চমকে উঠলাম। বলে কী ও! ক্রিসমাস ডের সাথে নাকি খ্রিষ্টানদের কোনো সম্পর্ক নেই! চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলছিস এসব তুই? ক্রিসমাস ডের সাথে ক্রিশ্চিয়ানিটির সম্পর্ক নেই মানে? তাহলে ক্রিশ্চিয়ানিটির মধ্যে ক্রিসমাস ডে এলো কোত্থেকে?'

সাজিদ মুচকি হেসে বলল, 'সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। ক্রিশ্চিয়ানিটির মধ্যে এই উৎসব ঢুকল কী করে! আরও অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, ক্রিশ্চিয়ানিটির মধ্যে এই ক্রিসমাস ডে তথা পঁচিশে ডিসেম্বরে উৎসব পালনের রীতিটি এসেছে প্যাগানদের কাছ থেকে।'

এবার আমি আর ডেভিড দুজনেই হাঁ করে রইলাম। কারও মুখে কোনো কথা নেই যেন। সাজিদ আবার বলতে শুরু করল, 'এই ইতিহাস অনেক পুরোনো। যিশুর জন্মের আগে ইউরোপে রাজত্ব করত প্যাগানরা। এই প্যাগানরা তখন 'স্যাটারন্যালিয়া' নামক একটি উৎসব পালন করত। দেবতা 'স্যাটার্ন' এর পূজোই এই উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। দেবতা স্যাটার্ন ছিল ফসলের দেবতা। ফসল কাটার মৌসুম শেষে যখন সবার ঘরে ঘরে খাবার এবং ফসল মজুদ হয়ে যেত, তখনই এই উৎসব পালন করা হতো বলে জানা যায়। ডিসেম্বরের সতেরো তারিখে এই স্যাটারন্যালিয়া উৎসব পালন করা হতো।'

মতি ভাই আমাদের দিকে চা এগিয়ে দিল। আমরা সন্তর্পণে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সাজিদের কথার দিকে মনোযোগ দিলাম।

'প্যাগানদের মধ্যে আরেকটি প্রধান উৎসবের প্রচলন ছিল। সেটি হলো দেবতা মিথ্রাসের জন্মদিন। এটিকে মিথ্রাইজম বলা হয়। মিথ্রাস ছিল আলোর প্রতীক। যিশুর জন্মের দুই হাজার বছর আগ থেকে এই দেবতা মিথ্রাসের পুজোর প্রচলন ছিল

প্যাগানদের মধ্যে। জানা যায়, এই মিথ্রাস দেবতার জন্মদিন ছিল পঁচিশে ডিসেম্বর। তাই, প্যাগানরা ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখ এই মিথ্রাসের জন্মদিন পালন করত। প্যাগানরা এই উৎসবকে বলত 'Dies Natalis Solis Invicti'. এর মানে হলো 'The Birthday of Unconquerable Sun'.

যাইহোক, তখন ইউরোপে আস্তে আস্তে ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রবেশ করছিল মাত্র। কিছু কিছু প্যাগান প্যাগানিজম ছেড়ে খ্রিষ্টধর্মে চলে আসা শুরু করে। তখন কনস্ট্যানটাইন নামের একজন রোমান, যিনি প্যাগানধর্মের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত, তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার পরে তিনি প্যাগানদের মধ্যে খ্রিস্টান চার্চের ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে দেন; কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, প্যাগানিজম ছেড়ে তিনি খ্রিষ্টধর্মে আসলেও প্যাগানদের রীতি-নীতিকে মন থেকে ছুড়ে ফেলতে পারেননি। তখন থেকে তিনি চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন ক্রিশ্চিয়ানিটি এবং প্যাগানিজমের মধ্যে একটি মেলবন্ধন তৈরি করতে। পরে তিনিই দেবতা স্যাটার্ন এবং দেবতা মিথ্রাসের জন্মদিনকে যিশুর জন্মদিন বলে প্রচার করতে লাগলেন, যাতে একই দিনে প্যাগানরা এবং খ্রিস্টানরা উৎসব পালন করতে পারে।'

আমাদের বিস্ময়ের রেশ এখনো কাটেনি। বললাম, 'তো, কনস্ট্যানটাইন নামের ভদ্রলোক যে, প্যাগান উৎসবকে যিশুর জন্মদিন বলে চালিয়ে দিল, খ্রিস্টান পাদ্রীরা আপত্তি করল না কেন?'

সাজিদ বলল, 'গুড পয়েন্ট। কনস্ট্যানটাইন যখন প্যাগান এই উৎসবগুলো যিশুর জন্মদিন বলে চালিয়ে দিল, তখন খ্রিস্টান পাদ্রীরা কয়েকটি কারণে আপত্তি করেনি। প্রথমত, তাদের নিজেদের কাছেও যিশুর সঠিক জন্মদিনের কোনো প্রমাণ নেই। কারণ, বাইবেলে এটি সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছুই বলা নেই। দ্বিতীয়ত, এই পাদ্রীরা চাচ্ছিলেন যে, ওই সময়ে ক্রিশ্চিয়ানিটি যেন সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায়, যদি প্যাগানদের বোঝানো যায় যে, 'দেখো, আমরাও কিন্তু তোমাদের মতো পঁচিশে ডিসেম্বরে আমাদের ঈশ্বরের জন্মদিন পালন করি। তোমাদের ঈশ্বর আর আমাদের ঈশ্বর, সে তো একই। আসো, তোমরাও খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করো'।

ডেভিড এতক্ষণ পর কথা বলে উঠল। সে বলল, 'সাজিদ, তুমি বলতে চাচ্ছ যে, প্যাগানদের খ্রিষ্টধর্মে ভিড়ানোর জন্যে চার্চের পাদ্রীরা প্যাগান দেবতার জন্মদিনকে যিশুর জন্মদিন হিশেবে মেনে নিয়েছে?'

'একদম তা-ই', বলল সাজিদ।

'কিন্তু ক্রিসমাস ডেতে প্র্যাকটিস হওয়া রিচ্যুয়ালগুলো তাহলে কীভাবে এলো?'

'কোন রিচ্যুয়ালগুলো?', জানতে চাইল সাজিদ।

'এই ধরো, ক্রিসমাস ট্রি এর কথা। ক্রিসমাসের দিন একটি সবুজ গাছকে ঘিরে যে-সাজ-সজ্জা এবং আনন্দ-ফুর্তি হয়, সেটা।'

'সত্যি বলতে, এই রিচ্যুয়ালগুলোও প্যাগানদের থেকে ধার করা। প্যাগানরা মনে করত সবুজ বৃক্ষ হলো প্রাণ তথা জীবনের প্রতীক। তাই তারা তাদের পুজো-উৎসবে তাদের ঘর এবং ঘরের আশপাশ এরকম সবুজ বৃক্ষ দিয়ে সাজিয়ে রাখত এবং পুজো করত। এমনকি সান্তা ক্লজ, যেটি ক্রিসমাস ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেটাও ধার করা জার্মান মিথোলজি থেকে। সান্তা ক্লজ যে ক্রিসমাসের আগের রাতে এসে বাচ্চাদের উপহার দিয়ে যায়, সেটি মিথোলজির দেবতা Odin এর কাহিনি থেকে আসা।'

আমি বললাম, 'তা না-হয় বুঝলাম বাপু; কিন্তু যিশুর সময়কাল থেকেই যদি এই উৎসব পালন হয়ে থাকে তো এত যুক্তি-প্রমাণের তো কোনো দরকার নেই, তাই না?'

'রাইট', বলল ডেভিড। তার চোখেমুখে উজ্জ্বল আভা। যেন সে শক্ত কোনো ভিত্তি পেয়ে গেল পায়ের তলায়।

সাজিদ বলল, 'সরি টু সে, পৃথিবীর ইতিহাসে চতুর্থ শতাব্দীর আগে ক্রিসমাস ডে উদ্‌যাপনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই কথাটি ক্রিশ্চিয়ান চার্চের অক্সফোর্ড ডিকশনারি এভাবে লিখেছে, 'Though speculation as to the time of the year of Christ's birth dates from the early 3rd century.... the celebration of the anniversary does not appear to have been general till the later 4th century.' ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া লিখেছে এরকম, 'Christmas was not among the earliest festivals of the Church' খেয়াল করো, যিশুর জন্মের আরও তিনশো বছর পরে এসে হঠাৎ করে ক্রিসমাস ডে পালন করা শুরু হলো। এর আগে এরকম কোনো উৎসবের নাম-গন্ধও খ্রিস্টানদের ইতিহাসে ছিল না। অদ্ভুত না ব্যাপারটি?'

আমি আর ডেভিড দুজনেই চুপ করে রইলাম। আমাদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হলো মতি ভাইয়ের কথায়। মতি ভাই বলল, 'কী ব্যাপার! আন্নেরা দেহি চা-টারে বরফ বানাইয়া ছাইড়লেন।'

আমরা খেয়াল করলাম যে, আসলেই আমাদের তিনজনের চা-ই ঠান্ডা বরফ হয়ে আছে। ক্রিসমাসের প্রকৃত রহস্য শুনতে শুনতে ভুলেই গিয়েছি যে, হাতে চায়ের কাপ ধরে বসে আছি।

আমাদের ওই চা আর খাওয়া হলো না। চায়ের বিল পরিশোধ করে দিয়ে হাঁটা ধরলাম বাসার উদ্দেশ্যে। ডেভিডের মুখ একেবারে শুকনো হয়ে আছে। বেচারা কত শখ করে বাংলাদেশে ক্রিসমাস ডে পালন করতে এসেছিল। সাজিদ সবটায় জল ঢেলে দিল। আমি বললাম, 'তা ডেভিড, অ্যালেনদের বাসার ঠিকানা তো নিলে না এখনো। আগামীকাল তো তোমার সেখানে যাওয়ার কথা।'

সে মুখ নিচু করে বলল, 'না আরিফ। আমি ক্রিসমাস ডেতে অ্যাটেন্ড করব না।'

বেচারার শুকনো মুখ দেখে আমার খুব মায়া হলো। আমি সাজিদকে টেনে একপাশে নিয়ে গিয়ে বললাম, 'অ্যাই, আজকেই তোর এই ইতিহাস টানতে হলো কেন? বেচারা কত শখ করে সেই সুদূর আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে ক্রিসমাস পালনের জন্যে এসেছে। তুই তো ওর সব আশায় জল ঢেলে দিলি।'

সাজিদ আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। বলল, 'বাইবেলে খুব সুন্দর একটি শ্লোক আছে। জানিস কী সেটা?'

আমি বললাম, 'কী?'

সাজিদ বলল, 'Let There Be Light'. অর্থাৎ আলোকিত হতে দাও। বাইবেল বলছে, যেখানে অন্ধকার, অজ্ঞতা রয়েছে, সেখানে আলো দাও। আমিও তা-ই করলাম। অন্ধকারে আলো দিলাম।'

ঠিক কী কারণে জানি না। শ্লোকটি আমারও বেশ পছন্দ হয়ে গেল। লেট দেয়ার বি লাইট...।

ক্রিসমাস ডে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে—

১) McGowan, A. How December 25th Became Christmas, Bible History Daily.

২) Stephen Nissenbaum, The Battle for Christmas : A Cultural History of America's Most Cherished Holiday, New York : Vintage Books, 1997, p. 4.

৩) The two babylons by Alexander Hislops

৪) The Golden Bough- Sir James Frazer

৫) Encyclopedia-Man, Myth & Magic by Richard Cavendis

কাবার ঐতিহাসিক সত্যতা

ডেভিডের খুব মন খারাপ। গতকাল সাজিদের কথাগুলো শোনার পর থেকেই সে কেমন যেন নির্জীব হয়ে আছে। সকাল থেকে বাংলায় সে একটি কথাও বলেনি। টুকটাক যা বলেছে তার সবটাই টান টান ইংরেজিতে।

পঁচিশে ডিসেম্বর হিশেবে আজ সরকারি ছুটির দিন। আমার একবার মনে হয়েছিল ডেভিড রাতের মধ্যেই সিদ্ধান্ত পাল্টাবে এবং সকালেই তার বন্ধু অ্যালেনদের সাথে ক্রিসমাস পার্টিতে জয়েন করবে; কিন্তু সকাল থেকেই তার মধ্যে তেমন কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। সাদা চামড়ার এই ছেলেটিকে এরকম বিষণ্ণ চেহারায় দেখতে আমার একদমই ভালো লাগছে না। সাজিদ মনোযোগ দিয়ে কী যেন লিখছে। মন খারাপ নিয়ে ডেভিড ম্যাগাজিন পড়ছে, আর আমি হাত-পা গুটিয়ে বেডের ওপর বসে আছি। পুরো ঘরটি জুড়েই প্রচ্ছন্ন নীরবতা।

নীরবতা ভেঙে আমি বললাম, 'ডেভিড, তুমি কি অ্যালেনদের বাসায় সত্যিই যাচ্ছ না?'

আমার কথা শুনে সে ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। যেন আমার এই প্রশ্নটি তার কাছে খুব অপ্রত্যাশিত। চশমার ফ্রেম ঠিক করতে করতে সে বলল, 'নো।'

আমার কথা শুনে সাজিদ লেখা থামিয়ে দিল। সম্ভবত আমাদের আলোচনায় সেও অংশগ্রহণ করবে। আমি বললাম, 'তুমি যে যাচ্ছ না, সেটি অ্যালেনকে জানিয়েছ?'

ডেভিড আবারও বলল, 'নো।'

'অ্যালেন চিন্তা করবে না তোমার জন্যে?'

'হোয়াই?', ডেভিভ প্রশ্ন করল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'বলো কী! তুমি কিন্তু অ্যালেনের ইনভাইটেশান পেয়েই বাংলাদেশে এসেছ। বাংলাদেশে পা রাখার পরে অ্যালেনের সাথে তোমার কি একবারও যোগাযোগ হয়েছে?'

ডেভিড পুনরায় বলল, 'নো।'

এবার কথা বলে উঠল সাজিদ। সে বলল, 'ডেভিড, এটি কিন্তু ঠিক হয়নি মোটেও। অ্যালেন তো তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কোনো খোঁজ না পেয়ে সে ভাবতে পারে, হয়তো তোমার কোনো বিপদ হয়েছে।'

সাজিদের কথা শুনে ডেভিড 'ও মাই গড' বলে চিৎকার করে উঠল। এরপর বলল, 'ইউ আর রাইট, সাজিদ।' বলতে বলতেই সে তার ব্যাগ খুলে একটি ডায়েরি বের করল এবং দ্রুতই ডায়েরি থেকে অ্যালেনের নাম্বার খুঁজে বের করল। সেখান থেকে ফোন নম্বর নিয়ে অ্যালেনকে ফোন করল। সবকিছু সে খুব দ্রুততার সাথেই করল। বিদেশিরা যে কাজকর্মে খুব চটপটে হয়ে থাকে সেটি ডেভিডকে দেখে হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া গেল।

নাহ, ডেভিডের কল যায়নি। আমি বললাম, 'তোমার ফোনে তো নেটওয়ার্কই নেই, মাই ফ্রেন্ড। কল কীভাবে যাবে?'

ডেভিড ফোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আই সী...।'

আমি আমার ফোনটি তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'তুমি চাইলে আমার মোবাইল থেকে কল করতে পারো।'

সে 'থ্যাংক ইউ' বলে আমার হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে অ্যালেনকে ফোন করল। অ্যালেনের সাথে কথা বলা শেষ করে ডেভিড বলল, 'আই হ্যাভ টু গো দেয়ার।'

আমি বললাম, 'কোথায়?'

'অ্যালেনদের বাসায়।'

'ক্রিসমাস ডে সেলিব্রেইট করার জন্যে?'

'নো নো।'

'তাহলে?'

ডেভিড এবার খুব স্পষ্ট বাংলায় বলল, 'ক্রিসমাস ডের দিন যদি জিসাস ক্রাইস্ট জন্মগ্রহণ না-ই করে, সেটি তো অ্যালেনেরও জানা উচিত, তাই না? অ্যালেন তো আমার বন্ধু। আমি আমার বন্ধুকে এই সত্যটি জানাব না?'

আমি বললাম, 'কিন্তু ডেভিড, তুমি যদি এটি করতে চাও তো...।'

আমাকে আবার থামিয়ে দিল সাজিদ। সে বলল, 'অবশ্যই অ্যালেনেরও জানা উচিত এইটা।' এরপর সে ডেভিডের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি অবশ্যই যাবে, মাই ফ্রেন্ড।'

এবার হাসল ডেভিড। সাজিদের উৎসাহ পেয়ে তাকে যারপরনাই খুশি বলে মনে হলো; কিন্তু ডেভিড যদি অ্যালেনদের কাছে গিয়ে আজকের দিনে এসব কথাবার্তা বলে, তা যে কতটা হিতে বিপরীত হতে পারে তা কি সাজিদ বুঝতে পারছে না?

ডেভিডের অনুরোধে আমাদের দুজনকেই তার সাথে যেতে হচ্ছে। অ্যালেনদের বাসা শ্যামলীতে। অ্যালেনের সাথে ফোনে কথা বলার সময় ডেভিড একেবারে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছে যে, সে ক্রিসমাস ডেতে অ্যাটেন্ড করছে না। তার কথা শুনে অ্যালেন ভারি অবাক হলো। ডেভিড ক্রিসমাস পার্টিতে কেন অ্যাটেন্ড করবে না সে ব্যাপারে বারবার জানতে চাচ্ছিল অ্যালেন। ডেভিড শুধু একটি বাক্যই বলেছে তাকে, 'আগে দেখা হোক তারপর বলব।'

আমাদের দেখা হলো শ্যামলী স্কয়ারে। বিশাল এই স্কয়ারের পাঁচ তলার একটি রেস্টুরেন্টে আমরা চারজন এসে বসলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, অ্যালেনের কাছে অনেক আগেই নাকি ডেভিড আমাদের গল্প করে রেখেছে। সাজিদের পরিচয় পাওয়ার পরে অ্যালেন বলল, 'ওহ! সো ইউ আর মি. আইনস্টাইন।'

অ্যালেনের মুখে এই নাম শুনে আমি বেশ অবাক হলাম। সে বলল, 'আপনাদের গল্প ডেভিড আমার কাছে সবসময়ই করত। ইচ্ছে ছিল ঢাবি ক্যাম্পাসে গিয়ে একদিন আপনাদের সাথে দেখা করে আসব; কিন্তু হয়ে উঠল না আর। আজকে তো দেখা হয়েই গেল', বলতে বলতে হেসে ফেলল অ্যালেন।

খেতে খেতে ডেভিড বলতে লাগল, 'তোমাদের বাংলা ভাষা যে কী দুর্বোধ্য! এই ভাষা রপ্ত করতে আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে। একবার কী হয়েছে শোনো। একদম প্রথম দিকের কথা। তখন আমি নতুন নতুন বাংলা শিখছি মাত্র। এক বাঙালি লোকের সাথে পরিচয় হলো ক্যান্টিনে। তার কাছে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলাম চেয়ারকে বাংলা ভাষায় কী বলে? সে বলল, 'চেয়ার'। আমি বললাম, 'আরে না না। চেয়ার তো ইংরেজি। এটিকে বাংলা ভাষায় কী বলে থাকে?' সে আবার বলল 'চেয়ার বলে।' আমার মাথা গেল গরম হয়ে। বললাম, 'আরে চেয়ার তো ইংরেজি শব্দ। এটার বাংলা আছে না? আমি সেই বাংলাটি জানতে চাইছি।'

আমি চটে গেছি দেখে লোকটি তার ব্রেড হাতে নিয়ে আমার টেবিল থেকেই উঠে চলে গেল। এর অনেক পরে আমি জানতে পারলাম—চেয়ারের বাংলা করলে হয় 'কেদারা।' বাঙালিরা এই কঠিন শব্দে না বলে চেয়ারকে সোজাসুজি 'চেয়ার'-ই বলে। এটি জানার পরে সেদিনের ওই লোকটার জন্যে আমার খানিকটা মায়া হলো। বেচারা সেদিন সঠিক উত্তর দিয়েও কি ঝাড়িটাই-না খেলো আমার। হা-হা-হা।'

ডেভিডের কথা শুনে আমরাও হেসে উঠলাম। খেতে খেতে আমাদের আরও বেশ কিছু বিষয়ে গল্প হলো। অ্যালেনের আগ্রহের বিষয় রাজনীতি। সে ট্রাম্প-হিলারির নির্বাচন নিয়ে বেশ বড় রকমের লেকচার ফেঁদে বসল। অ্যালেন আমাকে আর সাজিদকে 'আপনি' করে বলছে দেখে ডেভিড বলে উঠল, 'হেই, তুমি ওদের আপনি বলে সম্বোধন করছ কেন? বাংলা ভাষার আরেকটি সমস্যা হলো এই জিনিস। সম্বোধনের কতগুলো স্তর। তুই-তুমি-আপনি। আমাদের ইংরেজিতে বাবা এত ঝামেলা নেই। ছোট-বড় সবাইকে আমরা 'You' দিয়েই সেরে ফেলি।'

অ্যালেন বলল, 'তা তুমি ঠিক বলেছ অবশ্য। বাংলা ভাষা হলো সর্বনামের আখড়া। হাহাহা।'

অ্যালেন বলল, 'তা ডেভিড, তুমি ক্রিসমাস পার্টিতে জয়েন করবে না কেন? কী সমস্যা?'

'বিরাট সমস্যা', বলল ডেভিড। 'তুমি জানলে খুব অবাক হবে যে, আমাদের জিসাস ক্রাইস্ট কিন্তু ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখে জন্মগ্রহণ করেননি। আমরা একটি ভুল-দিনে জিসাস ক্রাইস্টের জন্মদিন পালন করি। আই সোয়ার।'

ডেভিডের কথার আগামাথা কোনো কিছু অ্যালেন বুঝতে পারল না। সে কপাল কুঁচকে বলল, 'কী বললে তুমি?'

ডেভিড খুব সিরিয়াস চেহারায় বলল, 'আমাদের জিসাস ক্রাইস্ট পঁচিশে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেননি। আমরা, মানে খ্রিষ্টানরা একেবারে একটি ভুল-দিনে জিসাস ক্রাইস্টের জন্মদিন পালন করি।'

'আর ইউ কিডিং?', অ্যালেনের চেহারা থেকে রুক্ষ ভাবটি যায়নি। কুঁচকানো কপাল আর গুটানো চোখে যেন তার রাজ্যের বিস্ময়।

'নো, মাই ফ্রেন্ড। ট্রাস্ট মি। আই অ্যাম নট লায়িং টু ইউ। আই সোয়ার।'

আমার সবচেয়ে মজা লাগছে ডেভিডের হাবভাব দেখে। সে এমনভাবে অ্যালেনকে বোঝাচ্ছে যেন অ্যালেন ক্রিসমাস ডে পালন না করলে তারই লাভ। সিরিয়াসনেসের সবটুকু তার চেহারায় বিরাজ করছে।

অ্যালেন বলল, 'তুমি এই কথা কোথায় শুনলে?'

'আমাকে সাজিদ বলেছে। সে কিন্তু মিথ্যে বলেনি অ্যালেন। সে একেবারে এভিডেন্স সহকারে আমাকে প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে—জিসাস ক্রাইস্ট পঁচিশে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেননি। আমরা ভুলদিনে ক্রিসমাস ডে পালন করি।'

'তাই?'

'হ্যাঁ।'

এবার অ্যালেন সাজিদের দিকে মুখ ফেরাল। তার চেহারায় একটু আগের উচ্ছ্বলতাটুকু নেই। সেখানে স্থান করে নিয়েছে একগাদা অবিশ্বাস আর আস্থাহীনতা। সে হয়তো এতক্ষণে ধরে নিয়েছে যে, আমরাই ডেভিডের মাথা গুলিয়ে খেয়েছি। অ্যালেন সাজিদকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তুমিই বলেছ ডেভিডকে এই কথা?'

আমি খেয়াল করলাম অ্যালেন এবার 'আপনি' সম্বোধন ছেড়ে 'তুমি'তে চলে এসেছে। সচেতনভাবে এসেছে না অবচেতনভাবে এসেছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

সাজিদ বলল, 'হ্যাঁ।'

'তোমার কাছে কী ধরনের এভিডেন্স আছে?'

সাজিদ ধীরে ধীরে অ্যালেনকে সব কাহিনি খুলে বলল, যা সে গতকাল ডেভিডকে বুঝিয়েছিল। তবে একটি ব্যাপার বুঝেছি, অ্যালেন বাইবেল সম্পর্কে বেশ ভালো জ্ঞান রাখে। কয়েকটি জায়গায় সাজিদকে প্রশ্ন করে আটকাতেও চেয়েছে; কিন্তু সাজিদ দুর্দান্তভাবে সেগুলো রিফিউট করেছে। একটি পর্যায়ে গিয়ে অ্যালেন তো স্বীকার করেই বসল যে, জিসাস ক্রাইস্টের জন্ম কোনদিন সেটি বাইবেল নিশ্চিত করে না এবং সে এও বলল যে—আর্লি খ্রিস্টানদের থেকে এই দিনটি জিসাস ক্রাইস্টের জন্মদিন হিশেবে উদ্‌যাপনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তার কথা শুনে ডেভিড বলল, 'তাহলে, আমরা এই দিন পালন করি কেন অ্যালেন?'

অ্যালেন বলল, 'ধর্মের কিছু কিছু রিচ্যুয়াল এভাবেই তৈরি হয়ে যায়। হতে পারে এই দিনেই জিসাস ক্রাইস্টের জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এমন কোনো ব্যাখ্যা আছে, যা আমরা কেউই জানি না। যারা জানে তারা হয়তো গত হয়েছে। তবে আমাদের উচিত প্রশ্ন না করে সেগুলো পালন করে যাওয়া।'

তার কথা শুনে অবাক হলো ডেভিড। অবাক হলাম আমিও। সে ক্রিসমাস ডের জন্য এমন এক ব্যাখ্যার কথা বলছে যা বাইবেলে নেই, আর্লি ক্রিশ্চিয়ানরা পালন করেনি। সে এটিকে একটি রিচ্যুয়াল বানিয়ে সার্টিফায়েড করে দিতে চাইছে। অদ্ভুত!

অ্যালেন আবার বলল, 'এরকম রিচ্যুয়ালগুলো যে কেবল ক্রিশ্চিয়ানিটির মধ্যেই আছে তা নয়। মোটামুটি সব ধর্মেই এসব পাওয়া যায়। এমনকি, ইসলামধর্মেও।'

আমি আর সাজিদ সাথে আছি বলেই হয়তো অ্যালেন ইসলামধর্মের নামটি বেশ জোর দিয়েই বলল। ইসলামধর্মেও এরকম রিচ্যুয়াল আছে শুনে আরেকবার অবাক হলো ডেভিড। সে বেশ বিস্ময়ের সাথেই আমার আর সাজিদের চেহারার দিকে তাকাল। এই কথা শুনে আমাদের রিঅ্যাকশান কী হতে পারে সম্ভবত সেটি দেখাই তার উদ্দেশ্য।

আমি অ্যালেনকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'ইসলামধর্মেও এরকম রিচ্যুয়াল আছে বলতে?'

অ্যালেন আমার দিকে তাকাল। বলল, 'শিওর।'

'যেমন?'

'এই যেমন ধরো তোমাদের কাবা ঘর। তোমাদের কুরআন বলে এটি নাকি আব্রাহাম আই মিন নবী ইবরাহীম তার পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে নির্মাণ করেছিলেন। দেখো, এটি যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে জিসাস ক্রাইস্টের জন্মের আগেও পৃথিবীতে কাবা ঘরের অস্তিত্ব থাকবে, রাইট? এমনকি, জিসাস ক্রাইস্টের জন্মের সময়েও এটার অস্তিত্ব থাকা স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু নবী মুহাম্মদের জন্মের আগে তুমি এমন কোনো নন-মুসলিম সোর্স পাবে না যেখান থেকে প্রমাণ করা যায় যে, কাবা ঘরের অস্তিত্ব সেই আদিকাল থেকেই আছে। তাহলে কাবা ঘর আসলেই সেই আদিকাল থেকে ছিল কি ছিল না, সেটি নিয়ে একটি সংশয় কিন্তু আছে। তবুও মুসলিমরা সেটার দিকে মুখ করে ইবাদত করে। কাবায় হজ করে ইত্যাদি। এই যে, এভাবেই তো রিচ্যুয়াল তৈরি হয়।'

সাজিদ বলল, 'তো, তুমি বলতে চাচ্ছ যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের আগে, নন-মসুসলিম কোনো সোর্স থেকে কাবার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না?'

অ্যালেন বলল, 'হ্যাঁ। দ্যাটস ইট।'

কফি চলে এলো। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ডেভিড বলল, 'হাউ স্ট্রেইঞ্জ!'

সাজিদ বলল, 'অ্যালেন, আমার মনে হয় তুমি কোথাও একটি ভুল করছ।'

'না', বলল অ্যালেন। 'আমি এ ব্যাপারে একেবারে সুনিশ্চিত।'

'তুমি কার কাছে শুনেছ এ ব্যাপারে?'

অ্যালেন একটু ইতস্তত বোধ করল। এরপর বলল, 'আমাদের এক ফাদারের কাছে।'

আমার আর বুঝতে বাকি রইল না এই ফাদার আসলে কে। নিশ্চিত ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি।

সাজিদ বলল, 'ইটস ওকে। বাট, হতে পারে তোমার ফাদারের জানার মধ্যে কোথাও একটি গ্যাপ আছে।'

অ্যালেন বলল, 'আই ডোন্ট নো। বাট, তুমি কী বলতে চাচ্ছ, কাবার অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক কোনো সত্যতা আছে? নন-ইসলামিক সোর্স থেকে?'

'অবশ্যই', বলল সাজিদ। 'খুব সুন্দরভাবেই আছে।'

সাজিদের কথা শুনে ডেভিডের চোখে-মুখে আবারও বিস্ময়ের রেশ দেখা গেল। এবারের বাংলাদেশ সফরে সে এত বেশিই বিস্মিত হচ্ছে যা সে তার পুরো জীবনেও হয়নি। সে বলল, 'ওয়াও! সাজিদ, ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন ইট, প্লিজ?'

সাজিদ কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলল, 'শিওর।'

এরপর সে অ্যালেনের দিকে ফিরল। বলল, 'অ্যালেন, তোমার কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছে, বাইবেল, ইতিহাস এবং রাজনীতি নিয়ে তোমার বেশ জানাশোনা আছে। তুমি কি ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ Edward Gibbson-এর নাম শুনেছ কখনো?'

অ্যালেন একটু মনে করার চেষ্টা করল। এরপর বলল, 'ঠিক মনে করতে পারছি না। হয়তো আমি তাকে চিনি না।'

'ফাইন', বলল সাজিদ। 'আমি বলছি। Edward Gibbson হচ্ছেন পৃথিবীর হাতেগোনা সেরা কয়েকজন ইতিহাসবিদদের একজন। তার একটি বই এতই বিখ্যাত যে, ওই বইটির নামেই তাকে চেনা হয়ে থাকে।'

ডেভিড বলে উঠল, 'গ্রেট! কী নাম বইটির?'

'The History of the Decline and the Fall of the Roman Empire.'

ডেভিড আবার বলল, 'নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে বইটি আগাগোড়া ইতিহাসের বই। হা-হা-হা।'

সাজিদ আবার বলতে শুরু করল, 'এই বইতে তিনি বিভিন্ন ধর্ম, সেগুলোর উৎপত্তি থেকে শুরু করে সেগুলোর বিস্তৃতি ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

পৃথিবীতে ক্রিশ্চিয়ানিটির আগমনেরও আগে কাবার অস্তিত্ব নিয়ে তিনি কথা বলেছেন। মূলত তিনি এই রেফারেন্স টেনেছেন যিশু খ্রিষ্টেরও এক শতাব্দী আগের একজন ইতিহাসবিদ থেকে। তার নাম ছিল Diodorus Siculus. গ্রিক এই ইতিহাসবিদ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আবিষ্কৃত অঞ্চল নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম হলো *Bibliotheca Historica.* এডওয়ার্ড গিবসন তার সেই বই থেকেই কোট করেছিলেন।'

'কী আছে গিবসনের বইতে?'

'গিবসন লিখেছে, 'blind mythology of barbarians - of the local deities, of the stars, the air, and the earth, of their sex or titles, their attributes or subordination. Each tribe, each family, each independent warrier, created and changed the rites and the object of this fantastic worship; but the nation, in every age, has bowed to the religion as well as to the language of Mecca. The genuine antiquity of Caaba ascends beyond the Christian era : in describing the coast of the Red sea the Greek historian Diodorus has remarked, between the Thamudites and the Sabeans, a famous temple, whose superior sanctity was revered by all the Arabians; the linen of silken veil, which is annually renewed by the Turkish emperor, was first offered by the Homerites, who reigned seven hundred years before the time of Mohammad'[১]

অর্থাৎ ক্রিশ্চিয়ানিটির আগেই যে কাবার অস্তিত্ব পাওয়া যায়, সেটি গিবসন অকপটে স্বীকার করেছে। এই দাবি গিবসনের নিজের নয়। তিনি কোট করেছেন গ্রিক হিস্টোরিয়ান ডিয়োডোরাসকে, যিনি আবার যিশু খ্রিষ্টের জন্মের আগেই মারা গেছেন। ডিয়োডোরাস তার বইতে গ্রিক ভাষায় যা লিখেছেন সেটার ইংরেজি ট্রান্সলেশান করলে যা দাঁড়ায় তা হলো, 'And a temple has been set-up there, which is very holy and exceedingly revered by all Arabians.'

---

১ *The history of decline & the fall of the Roman Empire*, Volume- 5, Page : 223-224

খেয়াল করো, গ্রিক হিস্টোরিয়ান বলছে যে, তখন সেখানে এমন একটি টেম্পল তথা প্রার্থনাস্থল তৈরি করা হয়েছিল, যা ছিল অতি পবিত্র এবং সেটি ছিল সকল আরবের কাছে পরম শ্রদ্ধার।'

তো, এই যে টেম্পল তথা প্রার্থনাস্থল যা ছিল সকল আরবদের কাছে অতিশয় পবিত্রতা আর শ্রদ্ধার প্রতীক, এটি কি কাবাকেই নির্দেশ করে না, যা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামকে নিয়ে নির্মাণ করেছিলেন?'

অ্যালেন বলল, 'তা যে কাবা হবে, তা কীভাবে নিশ্চিত? অন্য কোনো ধর্মের কোনো গির্জা বা প্রার্থনাস্থলও তো হতে পারে, তাই না?'

'গুড কোয়েশ্চান', বলল সাজিদ। 'কিন্তু, এখানে যে-সময়টার কথা বলা হচ্ছে তা যিশুর জন্মেরও অনেক আগের ঘটনা। ইতিহাস এবং বাইবেল থেকেও আমরা জানতে পারি—ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার স্ত্রী হাজেরা এবং শিশুপুত্র ইসমাঈলকে আরব দেশে রেখে যান। সে সময় আরব তথা মক্কায় তেমন কোনো লোকালয় ছিল না। এমনকি, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী হাজেরা আলাইহাস সালাম শিশু ইসমাঈলের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ির ঘটনাগুলোও তো সুপ্রসিদ্ধ, তাই না?'

'হুম।'

'এরকম একটি সময়ে ওই এলাকায় কি অনেকগুলো ধর্ম থাকা সম্ভব? নাকি, কেবল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে-ধর্ম প্রচার করেছেন সেটি থাকা সম্ভব?'

'ইবরাহীমের ধর্ম থাকাই অধিক যুক্তিযুক্ত, তবে...।', অ্যালেন একটি আপত্তি তুলতে যাচ্ছিল।

তাকে থামিয়ে দিয়ে সাজিদ বলল, 'বেশ। ধরে নিলাম যে ওই সময়ে অনেকগুলো ধর্ম ছিল। তাহলে, গ্রিক হিস্টোরিয়ান ডিয়োডোরাস যে-টেম্পল তথা প্রার্থনাস্থলের কথা বলেছেন, তা একই সাথে ওই সময়ের সকল আরবদের কাছে পবিত্র এবং শ্রদ্ধার জায়গা হয় কীভাবে? যদি একেকজনের ধর্ম আলাদা আলাদা হয়, তাহলে তো ওই প্রার্থনাস্থল একই সাথে সবার কাছে সম্মানের এবং শ্রদ্ধার স্থান হিশেবে পরিচিতি পেতে পারে না। যদি তা-ই হয়, ডিয়োডোরাস কীভাবে লিখলেন যে,

'And a temple has been set-up there, which is very holy and exceedingly revered by all Arabians?'

অ্যালেন চুপ মেরে গেল। সাজিদ আবার বলতে লাগল, 'ডিয়োডোরাসের এই বক্তব্য থেকে এটাই পরিষ্কার যে, ওই সময়ে কেবল একটিই ধর্ম প্রচলিত ছিল এবং আরব দেশে অন্য কোনো ধর্মের এমন কোনো প্রার্থনাস্থলের নিদর্শন পাওয়া যায় না, যা একই সাথে খুবই প্রসিদ্ধ এবং শ্রদ্ধার বস্তু ছিল, কেবল কাবা ছাড়া। সেই ঐতিহাসিককাল থেকে আজ পর্যন্ত কাবা পুরো বিশ্বের সকল মুসলমানের কাছেই সমানভাবে সম্মানের, শ্রদ্ধার এবং ভালোবাসার জায়গা।'

ডেভিড বলল, 'ইটস অ্যা গুড পয়েন্ট, মাই ফ্রেন্ড।'

'তাহলে ডিয়োডোরাসের এই বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারলাম—যিশুর জন্মেরও অনেক আগেই কাবার অস্তিত্ব ছিল। এবার আসা যাক পরের পয়েন্টে। অ্যালেন, তুমি কি টলেমিকে চেনো?'

কথা বলে উঠল ডেভিড। বলল, 'বিজ্ঞানী টলেমির কথা বলছ তো?'

'হুম।'

-সাইন্সের ছাত্র হয়ে টলেমিকে চিনবে না এরকম আবার হতে পারে নাকি? হা-হা-হা।'

'বেশ', বলল সাজিদ। 'টলেমি ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি নিজের কাজের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন সুপ্রাচীন অঞ্চলের একটি ম্যাপ তৈরি করেছিলেন। যিশুর জন্মেরও অনেক আগে পৃথিবীর কোথায় কোথায় প্রসিদ্ধ অঞ্চল বা লোকালয় আছে সেসব জড়ো করাই ছিল মূলত তার উদ্দেশ্য।

এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি তৎকালীন 'মক্কা'-কে Macoraba বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং এই Macoraba-কে তিনি ধর্মীয় উপসনালয় এবং আরবের প্রাণকেন্দ্র হিশেবে উল্লেখ করেছিলেন। এই ব্যাপারটি অস্ট্রিয়ান ইতিহাসবিদ Gustave E. Von Grunebaum কোট করে লিখেছেন, 'Mecca is mentioned by Ptolemy, and the name he gives it allows us to identify it as a south

Arabian foundation created around a sanctuary.'[১]

এতটুকু বলে সাজিদ থামল। ডেভিড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরিফ, তোমার কি ব্যাপারটি ইন্টারেস্টিং লাগছে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আমি তো খুব এনজয় করছি ডেভিড। তুমি?'

'আমিও খুব এনজয় করছি।'

'খ্রিষ্টপূর্ব সময়ে কাবার অস্তিত্ব যে ছিল এবং সেটি যে উপাসনালয় হিশেবে আরব পেনিনসুলাতে খুবই পরিচিত ছিল সেটাও আমরা টলেমির এসব রেফারেন্স থেকে বুঝতে পারি। তাহলে, এই কথা অস্বীকারের আর কোনো উপায় থাকে না যে, কাবার অস্তিত্ব কেবল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকেই নয়; বরং আমরা দেখলাম যে—কাবার ইতিহাস যিশু খ্রিষ্টের ইতিহাসের চাইতেও পুরোনো। যিশুর জন্মেরও বহু আগেও কাবার অস্তিত্ব পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল।'

ডেভিড বলল, 'কোয়াইট কনভিন্সিং, মাই ফ্রেন্ড।'

চুপ করে আছে অ্যালেন। সাজিদ আবার বলা শুরু করল, 'আচ্ছা অ্যালেন, বাইবেল কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগের না পরের?'

'ডেফিনেইটলি আগের', বলল অ্যালেন।

'আচ্ছা। তাহলে নন-ইসলামিক সোর্স হিশেবে আমরা বাইবেলের রেফারেন্সও দেখতে পারি এক্ষেত্রে, কী বলো?'

ডেভিড চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে বলল, 'কী বলো! বাইবেলে এসব আছে নাকি?'

ডেভিডের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে সাজিদ বলতে লাগল, 'বাইবেলের Psalms এর চুরাশি নম্বর শ্লোকে বেশ ইন্টারেস্টিং কথা আছে। ওই শ্লোকটিতে মূলত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন স্ত্রী হাজেরা এবং পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে হিজরত করছিল, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে :

---

১ Gustave E. Von Grunebaum, Classical Islam: A History 600-1258, Page : 19

[১] How lovely is your dwelling place, O LORD Almighty!

[২] My soul yearns, even faints, for the courts of the LORD; my heart and my flesh cry out for the living God.

[৩] Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young-- a place near your altar, O LORD Almighty, my King and my God.

[৪] Blessed are those who dwell in your house; they are ever praising you.

[৫] Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on pilgrimage.

[৬] As they pass through the Valley of Baca, they make it a place of springs; the autumn rains also cover it with pools.

এই শ্লোকটিতে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হচ্ছে শেষের লাইনটি। সেখানে তাদের, অর্থাৎ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তার পরিবারের হিজরতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাইবেল বলছে, 'As they pass through the valley of Baca'. তুমি কি বলতে পারো অ্যালেন, এই 'Valley Of Baca' বলতে বাইবেল কোন জায়গাটি বুঝিয়েছে?'

অ্যালেন বলল, 'তুমি কি এটিকে 'মক্কা' বলতে চাইছ?'

'হ্যাঁ', বলল সাজিদ। 'কারণ, কুরআনের একটি আয়াতে 'মক্কা' কে সরাসরি 'বাক্কা' নামে ডাকা হয়েছে।'

ডেভিড অবাক হয়ে বলল, 'রিয়েলি?'

'হ্যাঁ। সূরা ইমরানের ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে, 'নিশ্চয় ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম যে-ঘর নির্মিত হয়েছিল তা ছিল বাক্কায়।' এ থেকে আমরা জানতে পারি যে— মক্কার আদি একটি নাম হলো বাক্কা এবং বাইবেলও কিন্তু এই নাম, অর্থাৎ মক্কার আদি নামই উল্লেখ করেছে। As they pass through the Baca, অর্থাৎ তারা যখন বা'কা বা বাক্কার উপত্যকায় পৌঁছুল। মানে হলো, তারা যখন মক্কার উপত্যকায় পৌঁছুল।'

অ্যালেন বলল, 'ইউ নো অ্যা ভেরি লিটল অ্যাবাউট বাইবেল, সাজিদ। তুমি বাইবেলের 'Valley Of Baca' এর অর্থ করেছ 'মক্কার উপত্যকা।' কিন্তু, বাইবেল-বিশারদরাও কি ঠিক এই অর্থ করেছে?'

সাজিদ হাসল। মুখে হাসি রেখেই বলল, 'ফাইন। এটি আমি তোমার কাছ থেকেই শুনতে চাই, অ্যালেন।'

'কোনটা?', অ্যালেনের প্রশ্ন।

'বাইবেল-বিশারদরা Valley Of Baca এর কী অর্থ করেছে, সেটা।'

অ্যালেন একটু কেশে নিল। এরপর বলল, 'তুমি যদি Jewish Encyclopedia দেখো তাহলে দেখবে যে, সেখানে 'Baca' এর অর্থ করা আছে এরকম : 'Valley Of Weeping।' তা ছাড়া, অনেকে এই শব্দের আরও অর্থ করেছেন, যেমন : 'Valley Of Stream', 'Valley Of Deep Sorrow' ইত্যাদি। সুতরাং, 'Baca' শব্দ থাকলেই যে তা তোমাদের কুরআনের 'বাক্কা' বা 'মক্কা' হয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়।'

অ্যালেনের চেহারায় বিজয়ীর একটি ভাব তৈরি হলো। সে সম্ভবত ধরেই নিয়েছে যে—সাজিদকে এবার সে আচ্ছামতো কাবু করে ফেলেছে। এই যুক্তি খণ্ডন করার ক্ষমতা আর সাজিদের নেই।

সাজিদ বলল, 'তুমি একদম ঠিক বলেছ অ্যালেন। বাইবেল-বিশারদরা এই শব্দটির অর্থ ঠিক এভাবেই করেছে যেমনটি তুমি বলেছ। শুধু Jewish Encyclopedia নয়, Anchor Bible Dictionary-তেও 'Baca' শব্দটির অর্থ তা-ই করা হয়েছে, যা তুমি একটু আগে বলেছ।'

অ্যালেনের চেহারার উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম না, সাজিদ কি নিজ থেকে হেরে যেতে চাচ্ছে নাকি অ্যালেনের কাছে? অ্যালেনের যুক্তি টিকে গেলে তো এতক্ষণ ধরে একটি একটি করে সাজিয়ে আসা সাজিদের সকল যুক্তি পুরোপুরিই ভেঙে পড়বে।

আবারও কথা বলে উঠল সাজিদ। সে বলল, 'তবে অ্যালেন, আমি শব্দটির অর্থগুলোর একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিচ্ছি।'

আমরা সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছি। সাজিদ বলতে লাগল, 'Baca শব্দের অর্থ হিশেবে তুমি প্রথমে কোন অর্থটি বলেছিলে?'

অ্যালেন বলল, 'Valley Of Weeping.'

'ফাইন। Valley Of Weeping.' মানে কান্নার উপত্যকা। আমি কি তোমাকে একটি করুণ ইতিহাস মনে করিয়ে দিতে পারি?'

অ্যালেনের হয়ে উত্তর দিল ডেভিড। বলল, 'হোয়াই নট।'

'দেখো অ্যালেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেমন ইসলামধর্মের একজন সম্মানিত নবী, তেমনই তিনি খ্রিশ্চিয়ানদের কাছেও সম্মানিত একজন প্রফেট, রাইট?'

অ্যালেন মাথা নাড়ল। সাজিদ বলতে লাগল, 'নবী ইবরাহীম যখন স্ত্রী হাজেরা এবং শিশুপুত্র ইসমাঈলকে একটি পাহাড়ি উপত্যকায় রেখে যান, তখন কিন্তু ওই উপত্যকায় কোনো জনবসতি ছিল না, কোনো খাবার ছিল না। এমনকি, তৃষ্ণা নিবারণের পানিটুকু পর্যন্ত কোথাও ছিল না। এরকম একটি অবস্থায় একেবারে অসহায় হয়ে পড়লেন হাজেরা আলাইহাস সালাম। তিনি শুধু কাঁদতেন। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করতেন আর চাইতেন যেন জীবনধারণের জন্য একটি ব্যবস্থা হয়। হাজেরা আলাইহাস সালামের সেই অনবরত কান্নার জন্যেই যদি এই উপত্যকার নাম হয়ে থাকে Valley Of Weeping, তা কি খুব বেশি অবাক হবার মতো ব্যাপার?'

ডেভিড বলল, 'নাইস! এরকম তো হতেই পারে। মানুষের নামে, আশপাশের পরিবেশের নামে তো দুনিয়াজুড়েই কত জায়গার নাম হয়েছে। Hill Of Tears নামে একটি জায়গাও আছে কোথায় যেন। এগুলো খুবই সম্ভব।'

সাজিদ আবার বলতে শুরু করল, 'Baca' এর আরও কয়েকটি অর্থ Jewish Encyclopedia করেছে। যেমন : Valley Of Deep Sorrow. চিন্তা করো, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন হাজেরা আলাইহাস সালাম এবং ইসমাঈলকে রেখে চলে যান, ওই সময়টুকু কি হাজেরা আলাইহাস সালামের জন্য খুব সুখকর ছিল? অবশ্যই না। তার জন্যে সময়গুলো ছিল চরম পরীক্ষার; ধৈর্যের। না আছে থাকার ব্যবস্থা, না আছে খাবার আর না আছে পানি। সাথে একটি বাচ্চা শিশু। নিজে

না-হয় ক্ষুধা সহ্য করে থাকল; কিন্তু বাচ্চাটা? তার কী অবস্থা হবে? তখন কি হাজেরা আলাইহাস সালামের মন একরকম বিষণ্ণতায় ছেঁয়ে যায়নি? একটি গভীর দুঃখবোধ কি তার মনের গভীরে ছেপে বসেনি? সেগুলো বিবেচনায় যদি Baca এর অর্থ করা হয় Valley Of Deep Sorrow, তা কি খুব অযৌক্তিক শোনায়?'

চুপ করে আছে অ্যালেন। চুপ করে আছি আমি আর ডেভিডও। ডেভিড মুখে হাত দিয়ে সাজিদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সাজিদ বলতে লাগল, 'Baca' শব্দের অর্থ হিশেবে Jewish Encyclopedia আরও একটি অর্থ করেছে। সেটি হলো valley Of Stream, যার অর্থ করলে দাঁড়ায় প্রবাহের উপত্যকা। মানে, পানির ঝরনার উপত্যকা। অ্যালেন, তোমাকে আমি আবারও একটি ঘটনা মনে করিয়ে দিই। যখন হাজেরা আলাইহাস সালাম সেই দুর্গম অঞ্চলে, জনমানবহীন পরিবেশে পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে একাকিনী দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন তৃষ্ণায় ইসমাঈলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তার তৃষ্ণার্ত চেহারা দেখে হাজেরা আলাইহাস সালাম কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছিলেন না আর। তিনি এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড় দৌড়াচ্ছিলেন একটু পানির খোঁজে। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হাজেরা আলাইহাস সালামকে জানানো হলো যে, পুত্র ইসমাঈলের কাছে ফিরে যেতে; কারণ, তার পদচিহ্ন লেগে সেখানে ইতোমধ্যেই পানির একটি ফোয়ারার সৃষ্টি হয়েছে। সেই পানির ফোয়ারার নাম হলো যমযম। যমযম কূপ সৃষ্টির এই ইতিহাস তো সর্বজনবিদিত, তাই না? এখন এই ঘটনাকে সামনে রেখে বাইবেলের Baca শব্দের অর্থ যদি Valley Of Stream বা প্রবাহের উপত্যকা করা হয়, এটাও কি অযৌক্তিক হয়ে যায়?'

ডেভিড বলল, 'গ্রেট, মাই ফ্রেন্ড। তোমার এক্সপ্লেনেশান আমার খুবই ভালো লেগেছে।' এরপর সে অ্যালেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি কিছু বলবে অ্যালেন?'

অ্যালেন না-সূচক মাথা নাড়ল। সম্ভবত সে বুঝতে পেরেছে যে, তার দাবিটি ভুল ছিল। কাবার অস্তিত্ব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কাল থেকে নয়; বরং যিশু খ্রিষ্টেরও বহু বহু আগ থেকেই এটির অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল।

অ্যালেন আমাদের কাউকে বিল পরিশোধ করতে দিল না। শ্যামলী স্কয়ার থেকে বের হয়ে আমরা অ্যালেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিলাম। একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে আমরা তিনজনই উঠে পড়লাম তাতে। ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়ার পরে ডেভিড

মাথা বের করে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'অ্যালেন, ক্রিসমাস পার্টিতে যেয়ো না কিন্তু, মাই ফ্রেন্ড।'

ডেভিডের কথা শুনে অ্যালেন মুচকি হাসল। হাসলাম আমরাও। ডেভিডের মতো সহজ-সরল মানুষ পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর।

দ্রুতই অ্যালেন আমাদের দৃষ্টি সীমানার বাইরে চলে গেল। মিলিয়ে গেল ঢাকা শহরের যানবাহনের মধ্যে। আমরা ছুটে চললাম আমাদের গন্তব্যের দিকে। বিকেল হতে চলেছে। মসজিদে আসরের আযান পড়তে শুরু করেছে ততক্ষণে।

নিউটনের ঈশ্বর

বাংলাদেশে আজ ডেভিডের তৃতীয় দিন। সে এতদিন ক্যান্টিনে খাওয়ার বায়না করে যাচ্ছিল; কিন্তু গতরাতে আমার কাছে ক্যান্টিনের বিখ্যাত-সব গল্প শুনে পারলে তো সে বমি করে বসে। তাকে বলছিলাম ক্যান্টিনগুলোর ঐতিহ্যবাহী গল্পগুলো। গল্প বলা শেষ হলে সে খক খক করে বলে উঠল, 'আসলেই কি তরকারিতে মশা-মাছি পাওয়া যায়?'

আমি জোর দিয়ে বললাম, 'শুধুই কি মশা-মাছি? কপাল ভালো হলে জুট মিলের রশিও পাওয়া যেতে পারে। কপাল আরেকটু ভালো হলে নেংটি ইঁদুরের বাচ্চা, এমনকি তেলাপোকার সন্ধান লাভেও বিস্ময়ের কিছু নেই।'

আমার কথা শুনে সে আবার খক খক করে ওয়াশ রুমের দিকে দৌড় দিল। সাদা চামড়ার আমেরিকানের কাছে এসব বিদঘুটে লাগতেই পারে; কিন্তু বাঙালি ছাত্রদের কাছে এই ব্যাপারগুলো এখন একপ্রকার ঐতিহ্যের মতো হয়ে গেছে। ক্যান্টিনে খেতে এসেছে অথচ কোনোদিন এরকম ঘটনার সাক্ষী হয়নি, এমন ছাত্র খুঁজে পাওয়াই ঢের মুশকিল হবে। আর আমাদের ক্যান্টিনের বিখ্যাত 'ডাল-কাহিনির' কথা তো বাদই দিলাম।

নীলনদের পানিকেই সবচেয়ে স্বচ্ছ পানি বলে জানতাম; কিন্তু যেদিন প্রথম ক্যান্টিনের ডালের চেহারা দেখেছি, সেদিনই ভুলটি ভেঙে গেছে। আমাদের ক্যান্টিনের ডালের পানির চেয়ে স্বচ্ছ আর কোনোকিছু থাকতেই পারে না।

এসব গল্প শোনার পরে ক্যান্টিনে খাওয়ার সব-আশা ডেভিড জলাঞ্জলি দিয়ে দিল। কিচেন থেকে তিন কাপ চা নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হলো সাজিদ। ডেভিড আর আমার হাতে চা দিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল সে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ডেভিডের উদ্দেশ্যে সাজিদ বলল, 'আচ্ছা ডেভিড, ড্যান ব্রাউনের লেখা তোমার কেমন লাগে?'

ড্যান ব্রাউনের কথা শুনেই ডেভিড মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'জঘন্য লাগে।'

ডেভিড মুখের যে এক্সপ্রেশন নিয়ে 'জঘন্য লাগে' শব্দদ্বয় উচ্চারণ করল তা ছিল দেখার মতো। সাজিদ বলল, 'জঘন্য লাগার কারণ? ভদ্রলোক তো খুব ভালো লেখে। নিউ ইয়র্ক টাইমস কি বলল শোনোনি তাকে নিয়ে? হ্যারি পটারের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কেবল ড্যান ব্রাউন। ভাবা যায়? কেউ কেউ তো আরও কয়েক কাঠি সরেস তার ব্যাপারে। একজন তো বলেই ফেলেছিল যে ড্যান ব্রাউন হচ্ছে ইতিহাসের সেই রাজপুত্রের মতো যে 'এলো, দেখল এবং জয় করে নিল।'

ডেভিড তার মুখের অবস্থার কোনোরকম পরিবর্তন না করেই বলল, 'আই সী...! লোকটি যতখানি না লেখক তারচেয়ে বেশি হলো ধর্মবিদ্বেষী। ক্রিশ্চিয়ানিটি নিয়ে তার মধ্যে বেশ ভালো রকমের এলার্জি আছে। আমার কী মনে হয় জানো সাজিদ? আমার মনে হয় লোকটি নিজেই একজন ইলুমিনাতির সদস্য।'

হেসে উঠল সাজিদ। বলল, 'হতেও পারে। দুনিয়ার কে যে কোনদিকে ইলুমিনাতি হয়ে বসে আছে তা আমরা কেউই টের পাই না। এমনও হতে পারে, তুমি নিজেই একজন ইলুমিনাতির সদস্য এবং আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছ।'

সাজিদের কথা শুনে ডেভিড তার মুখটি আরও শক্ত করে বলল, 'আর ইউ কিডিং? হোয়াই শ্যুড আই বি অ্যা মেম্বার অফ দ্যাট বুলশিট ইলুমিনাতি?'

এই আমেরিকান যে কেবল ড্যান ব্রাউনের ওপরেই খেপে আছে তা নয়, গুপ্ত সংস্থা ইলুমিনাতির ওপরেও সে দেখছি ভীষণরকম বিরক্ত! সাজিদ বলল, 'তা, ড্যান ব্রাউনকে তোমার ধর্মবিদ্বেষী বলে মনে হয় কেন?'

'ধর্মবিদ্বেষী নয় তো কী? লোকটি জোর করে প্রমাণ করতে চায় যে ক্রিশ্চিয়ানিটি হলো বিজ্ঞানবিরোধী ধর্ম। আদিকাল থেকেই চার্চ নাকি বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অবস্থান

নিয়ে এসেছে। তুমিই বলো সাজিদ, এসব কথার কি কোনো ভিত্তি আছে আদৌ? পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীরা খ্রিষ্টান ছিলেন। বিজ্ঞানী নিউটনের কথাই ধরো। তিনি তো আগাগোড়া একজন ধার্মিক খ্রিষ্টান লোক ছিলেন। কই, চার্চ কি কখনো তার বিজ্ঞানচর্চায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে? আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিই যার হাতে গড়া, আজীবন তিনি নিজেই ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ খ্রিষ্টান। ক্রিশ্চিয়ানিটি যে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কোনো ধর্ম নয়, এই প্রমাণ তো স্বয়ং নিউটনই, তাই না?'

ডেভিডের লজিক শুনে সাজিদ বলল, 'তা বেশ বলেছ তুমি। নিউটন অবশ্যই একজন খাঁটি খ্রিষ্টান ছিলেন বটে।'

সাজিদের মুখে 'খাঁটি খ্রিষ্টান' কথাটি শুনে ডেভিড সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল। বলল, 'হোয়্যাট ডু ইউ মিন বাই খাঁটি খ্রিষ্টান?'

'খাঁটি খ্রিষ্টান মানে তিনি একচুয়াল খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাস করতেন যে—ধর্মের প্রচার করেছিলেন জিসাস ক্রাইস্ট। আরও সহজ করে বলতে গেলে, নিউটন মনেপ্রাণে অবিকৃত খ্রিষ্টধর্মকেই অন্তরে লালন করতেন। বিকৃত হয়ে যাওয়া ক্রিশ্চিয়ানিটিতে তার বিন্দু পরিমাণও বিশ্বাস ছিল না। বলতে গেলে, বিকৃত ক্রিশ্চিয়ানিটির বিরুদ্ধে নিউটন একপ্রকার কলমযুদ্ধ চালিয়েছিলেন।'

সাজিদের কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। নিউটনকে তো আমরা স্রেফ একজন পদার্থবিজ্ঞানী বলেই চিনি। তিনি আবার ক্রিশ্চিয়ানিটির বিরুদ্ধে লড়াইতে কবে অংশ নিয়েছিলেন? সাজিদের কথা শুনে ডেভিডও অবাক হলো। বলল, 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারিনি সাজিদ। তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে—ক্রিশ্চিয়ানিটি একটি বিকৃত ধর্ম?'

সাজিদ বলল, 'অনেকটাই।'

'তোমার এরকম মনে হবার কারণ?'

'তোমাকে তো সেদিন দেখিয়েছিলাম যে—প্যাগানদের উৎসব কীভাবে ক্রিসমাস ডে হিশেবে পালন হয়। এটি কি বিকৃতি নয়, ডেভিড?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডেভিড বলল, 'কিন্তু এটি তো নির্দিষ্ট কিছু খ্রিশ্চানের দোষ, তাই না? ক্রিশ্চিয়ানিটি বা বাইবেলের দোষ তো নয়।'

'শুধু তো ক্রিসমাস ডে নয়, এরকম আরও অনেক কিছু খ্রিষ্টধর্মে ঢুকে পড়েছে, যা আদৌ ক্রিশ্চিয়ানিটিতে ছিল না, এবং সেগুলোর বিরুদ্ধেই মূলত বিজ্ঞানী নিউটনের অবস্থান ছিল।'

'যেমন?', প্রশ্ন করল ডেভিড।

সাজিদ বলল, 'এই যেমন ধরো ত্রিত্ববাদ।'

ত্রিত্ববাদের কথা শুনে ডেভিডের পুরো চেহারা মুহূর্তেই গুমোট আকার ধারণ করল। সে বলল, 'তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে—ট্রিনিটির ধারণাও ক্রিসমাস ডের মতো প্যাগানদের কাছ থেকে ধার করা?'

'আমি তা বলছি না। আমি বলতে চাইছি যে—ট্রিনিটির সাথে মূল ক্রিশ্চিয়ানিটির কোনো সম্পর্ক নেই। ট্রিনিটি বলে ঈশ্বর হলো তিনজন; কিন্তু আদি ক্রিশ্চিয়ানিটিতে ঈশ্বর ছিলেন কেবলই একজন। আদি ক্রিশ্চিয়ানিটিতে জিসাস ক্রাইস্টকে কখনোই ঈশ্বর হিশেবে দেখানো হতো না; বরং তাকে ঈশ্বরের দূত হিশেবে দেখানো হতো; কিন্তু কালের পরিক্রমায় ক্রিশ্চিয়ানিটিতে 'ট্রিনিটি তত্ত্ব' ঢুকে পড়ে এবং একজন ঈশ্বরের জায়গা দখল করে বসে তিন তিনজন ঈশ্বর; কিন্তু বিজ্ঞানী নিউটন এই ট্রিনিটি তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনি একজনকেই ঈশ্বর হিশেবে বিশ্বাস করতেন।'

ডেভিড বলল, 'তার মানে নিউটন জিসাস ক্রাইস্টকে স্বীকার করত না?'

'অবশ্যই স্বীকার করত। নিউটন জিসাস ক্রাইস্টকে কেবল ঈশ্বরের একজন দূত হিশেবে বিশ্বাস করত, ঈশ্বর হিশেবে নয়। নিউটন ঈশ্বর হিশেবে তাকেই বিশ্বাস করত, যিনি জিসাস ক্রাইস্টকে দূত বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।'

তাদের আলোচনায় আমি বেশ মজা পাচ্ছি। ড্যান ব্রাউন ইলুমিনাতির গোপন কোনো সদস্য কি না এই রহস্যের চেয়ে বিজ্ঞানী নিউটন ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করত কি না সেই রহস্যই এখন বেশি জমে উঠেছে। ডেভিড জানতে চাইল, 'নিউটন যে-ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করত না তার প্রমাণ কী?

সাজিদ হাসল। হেসে বলল, 'আমার এই দাবির প্রমাণ রয়েছে নিউটনের সেই বারোটি সূত্রে।'

'নিউটনের বারোটি সূত্র?', মুখে বিড়বিড় করে বলল ডেভিড। নিউটনের গতির তিন সূত্রের কথা জানি এবং বইতে পড়েছি; কিন্তু 'নিউটনের বারো সূত্র' নামে তো কোনোকিছু পড়িনি কখনো। সাজিদকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'নিউটনের বারো সূত্র আবার কী জিনিস?'

এবার সে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। আজকে তাকে এতবার হাসতে দেখে আমি হালকা অবাক হচ্ছি। আমার প্রশ্নের উত্তর হিশেবে সে বলল, 'আমরা বেশির ভাগই বিজ্ঞানী নিউটনকে চিনি; কিন্তু আমরা অধিকাংশই ধর্মীয় স্কলার নিউটনকে চিনি না।'

সাজিদের কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি। বললাম, 'ধর্মীয় স্কলার নিউটন মানে কী? নিউটন নামে কোনো ধর্মীয় স্কলার ছিলেন নাকি?'

'বিজ্ঞানী নিউটনই হলো ধর্মীয় স্কলার নিউটন।'

অবাক হলো ডেভিড। অবাক হলাম আমিও। বললাম, 'আশ্চর্য! এমন কঠিন করে কথা বলছিস কেন তুই? যা বলতে চাচ্ছিস সহজ করে বলে ফেল। একেবারে জলবৎ তরলং করে। বিজ্ঞানী নিউটন আর ধর্মীয় স্কলার নিউটন, এসব টার্ম ব্যবহার করে ধোঁয়াশা তৈরি করবি না একদম।'

সাজিদের একটা বদভ্যাস হচ্ছে সে সবকিছুতেই দার্শনিকতা কপচাতে শুরু করে। সহজ ব্যাপারকে কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করে জটিল করে তোলে। আমার কথাকে সে আমলে নিয়েছে বলে মনে হল না। সে আগের মতোই বলে যেতে লাগল, 'স্যার আইজ্যাক নিউটনকে আমরা বিজ্ঞানী হিশেবেই চিনি তার বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডগুলোর জন্যে। কিন্ত বিজ্ঞানী পরিচয়ের বাইরেও তার বিশাল একটি পরিচয় আছে। সেটি হলো তিনি ছিলেন একজন ধর্মীয় পণ্ডিত। সারা জীবন তিনি বিজ্ঞান নিয়ে যত কাজ করেছেন, ধর্ম নিয়ে কাজ করেছেন তার তিন গুণ। বিজ্ঞানের জন্য সারা জীবনে তিনি যত শব্দ লিখেছেন, ধর্মের জন্য লিখেছেন তার পাঁচ গুণ; কিন্তু কোনো এক আশ্চর্য কারণে নিউটনের ধার্মিকতা আর ধর্ম নিয়ে তার গবেষণার ব্যাপারটি আমাদের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়।'

'স্যার আইজ্যাক নিউটন একজন ধর্মীয় পণ্ডিত ছিলেন' এই কথা শুনে মনে হলো আমি আকাশ থেকে ধপাস করে মাটিতে এসে পড়লাম। তিনি একজন আস্তিক

ছিলেন সেটি আমি জানতাম; কিন্তু তিনি যে ধর্মীয় পণ্ডিত ছিলেন, ধর্মের জন্য লেখালেখি পর্যন্ত করেছেন, সেসব কোনোদিনও শুনিনি। ডেভিডের অবস্থাও আমার মতো। স্যার আইজ্যাক নিউটনের ধর্মীয় পণ্ডিত হওয়ার ব্যাপারটি তার কাছেও বেশ আশ্চর্যের। ডেভিড় বলল, 'তিনি কি সত্যিই ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে লেখাজোখা করেছেন?'

সাজিদ বলল, 'হুম।'

'হুম' বলার পরে সাজিদ আবার বলল, 'আচ্ছা ডেভিড, পদার্থের গতির অবস্থা বোঝাতে নিউটন কয়টি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন জানো?'

ডেভিডের হয়ে আমি উত্তর দিলাম, 'তিনটি।'

আমার কথায় ডেভিড মাথা ঝাঁকালো। সাজিদ আবার বলল, 'রাইট। পদার্থের গতির অবস্থা বোঝাতে নিউটনকে আবিষ্কার করতে হয়েছে তিনটি সূত্র। আর ঈশ্বরের অবস্থা বোঝাতে নিউটনকে কয়টি সূত্র দিতে হয়েছিল তুমি জানো?'

'না', জবাব দিল ডেভিড।

'গুড। আমি বলছি। ঈশ্বরের অবস্থা বোঝানোর জন্য নিউটনকে আবিষ্কার করতে হয়েছে সর্বমোট বারোটি সূত্র। একটি দুটি নয়, গুনে গুনে বারোটি...।'

আমাদের বিস্ময়ের পারদ যেন পালা দিয়ে বেড়েই চলেছে আজকে। বিজ্ঞানী নিউটনের বাইরে গিয়ে ধর্মীয় পণ্ডিত নিউটনের অজানা এক অধ্যায়ের আবেশ যেন আমাদের ঘিরে রেখেছে চারদিক থেকে।

ডেভিড জানতে চাইল, 'সেই বারোটি সূত্র কী কী?'

সাজিদ গলা খাঁকারি দিল। একটু নড়েচড়ে বসে বলতে শুরু করল, 'সেই বারোটি সূত্র খুব সুন্দর এবং একই সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিউটনের ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা এবং ক্রিশ্চিয়ানিটির ব্যাপারে তার অবস্থান জানতে এই বারোটি সূত্রকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে আমাদের। ঈশ্বরকে জানার জন্য নিউটন প্রথম যে-সূত্রটি দিয়েছিলেন তা হলো, 'There is one God the Father (everliving), Omnipresent, Omniscient, Almighty, the maker of heaven & earth, and one

Mediator between God & Man, the man Christ Jesus.

অর্থাৎ নিউটন বলেছেন, 'ঈশ্বর হলেন একজন। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞানী এবং সর্বশক্তিমান। তিনি হলেন আসমান এবং জমিনের স্রষ্টা। মানুষ এবং ঈশ্বরের মাঝে সম্পর্কস্থাপনকারী মাধ্যম হলেন যিশু।

দ্বিতীয় সূত্রে তিনি বলেছেন, 'The Fater is invisible God whom no eye hath seen or can see. All other things are sometimes visible'.

অর্থাৎ 'ঈশ্বর হলেন অদৃশ্য। কোনো দৃষ্টি তাকে দেখেনি অথবা দেখতে পারে না। তিনি ব্যতীত অন্য সব দৃশ্যমান।'

তৃতীয় সূত্রে বলেছেন, 'The Father hath life in himself & hath given the son to have life in himself'.

অর্থাৎ 'ঈশ্বর নিজেই নিজের ভেতর জীবন্ত এবং তিনি নিজের মধ্যে থেকেই নিজ ক্ষমতাবলে বান্দাদের জীবন দান করেন।'

সূত্র তিনটি শুনে আমার মাথা ওলটপালট হবার জোগাড়। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে একজন বিজ্ঞানীর এত দূরদর্শী চিন্তা সত্যিই অবাক করার মতো। সাজিদ বলে যেতে লাগল,

চতুর্থ সূত্রে তিনি বলেছেন, 'The Father is omniscient & hath all knowledge originally in his own breast. And (He) communicates knowledge of future things to Jesus Christ. None in heaven or earth or under the earth is worthy to receive knowledge of future things immediately from the Father except the Lamb. (And therefore, the testimony of Jesus is the spirit of Prophey & Jesus is the word or Prophet of God)

মানে হলো, নিউটন বলতে চেয়েছেন, 'ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বজ্ঞানী। তার অন্তরেই রয়েছে সকল জ্ঞান। তিনিই যিশুর কাছে ভবিষ্যৎ-বিষয়ক সকল জ্ঞান প্রেরণ করেন। ঈশ্বরের দূতগণ ব্যতীত আসমান কিংবা জমিনে এমন কেউ নেই, যারা সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে। এ কারণেই যিশু হলেন ঈশ্বরের ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত এবং তিনি হলেন ঈশ্বরের দূত।'

পঞ্চম সূত্রে কী বলেছেন? পঞ্চম সূত্রে বলেছেন, 'The Father is immoveable. No place being capable of becoming emptier or fuller of him then it is by the eternal necessity of nature. All other being are moveable from place to place'

অর্থাৎ 'ঈশ্বর হলেন অবিচল। জগতের কোনো স্থানই তার অনুপস্থিতিতে শূন্য কিংবা তার উপস্থিতিতে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না; বরং তার উপস্থিতিই হলো প্রকৃতির অনন্ত অপরিহার্যতা। তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে থাকে।'

ষষ্ঠ সূত্রে বলেছেন, 'All the worship whether of prayer praise or thanks giving was due to the Father before coming of Christ is still due to him. Christ came not to diminish the worship of his Father'.

অর্থ হলো, 'যিশুর আগমনের পূর্বেও সব ধরনের প্রার্থনার একচ্ছত্র হকদার ছিলেন কেবল ঈশ্বর, এবং এখনো তা-ই আছেন। যিশু ঈশ্বরের প্রার্থনা কমাতে দুনিয়ায় আগমন করেননি।'

সপ্তম সূত্রে বলেছেন, 'Prayers are most prevalent when directed to the Father in the name of son'

মানে হলো, 'প্রার্থনাগুলো তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন সেগুলোতে ঈশ্বরের মনোনীত দূতের নামের মাধ্যমে করা হয়।'

অষ্টম সূত্রে নিউটন বলেছেন, 'We are to return thanks to father alone for creating us & giving us food, raiment & other blessing of this life and whatsoever we are to thank him for or desire that he would do for us we ask of him immediately in the name of Christ'.

অর্থ হলো, 'আমরা কেবল ঈশ্বরের কাছেই কৃতজ্ঞ; কারণ, তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের খাদ্যের জোগান দিয়েছেন, পরনের বস্ত্র এবং জীবনের অন্যান্য কল্যাণ প্রদান করেন তিনিই। যিশুর নামের বদৌলতে আমরা ঈশ্বরের কাছে যা-ই চাই, তিনি আমাদের তা দিয়ে থাকেন।'

নবম সূত্রে বলেছেন, 'We need not pray to Christ to intercede for us. If we pray the Father aright, he'll intercede'.

অর্থ, 'মধ্যস্থতা বা সুপারিশের জন্য যিশুর প্রার্থনা করার কোনো দরকার নেই। আমরা যদি সঠিকভাবে ঈশ্বরের প্রার্থনা করি, তাহলে যিশু এমনিতেই আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করবেন।'

দশম সূত্রে আইজ্যাক নিউটন বলেছেন, 'It is not necessary to salvation to direct our prayers to any other than the Father in the name of the son'.

অর্থাৎ তিনি বলেছেন, 'পরিত্রাণের জন্য যিশুর নাম নিয়ে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারও কাছে প্রার্থনা করার কোনো দরকার নেই।'

এগারোতম সূত্রে বলেছেন, 'To give the name of God to angels or kings is not against the first commandment. To give the worship of the God of the Jews to angels or kings is against it. The meaning of the commandment is- Thou shalt worship no other Gods but me'.

অর্থাৎ 'কোনো ফেরেশতা বা রাজা বাদশাহকে ঈশ্বরের গুণবাচক উপাধিতে ভূষিত করলে সেটি প্রথম আদেশের বিপরীতে চলে যায় না; কিন্তু কোন ফেরেশতা বা রাজা বাদশাহকে যদি ঈশ্বরের মতো ইবাদত করা হয়, তখনই সেটি প্রথম আদেশের বিরুদ্ধে চলে যায়। প্রথম আদেশ হলো, 'তোমরা আমি ছাড়া অন্য কারও পূজা কোরো না।'

বারোতম সূত্রে বলেছেন, 'To us there is but one God the Father of whom are all things (And we of him); And one Lord Jesus Christ by whom are all things & we by him. That is, we are to worship the Father alone as God Almighty'.[১]

অর্থাৎ 'আমাদের কাছে ঈশ্বর হলেন এক এবং একক। তিনি আমাদের এবং অন্য সকল বস্তুর প্রভু, এমনকি তিনি যিশুরও প্রভু।'

---

১ Transcription & Commentry Isaac Newton's Twelve articles on God & Christ, Keynes MS 8, Kings College, Cambridge.

সাজিদ একনাগাড়ে 'নিউটনের বারো সূত্র' বলা শেষ করল। আমি বললাম, 'লোকটি তো ক্রিশ্চিয়ানিটির ধারণাই পাল্টে দিতে চেয়েছে।'

সাজিদ বলল, 'তা নয়; বরং বলা উচিত তিনি ক্রিশ্চিয়ানিটির সত্য রূপ বের করে আনতে চেয়েছেন। তিনি কখনোই যিশুকে ঈশ্বর হিশেবে মানতেন না; বরং তিনি বলতেন যে, যিশু কেবল ঈশ্বরের একজন দূত। তিনি 'তিন ঈশ্বর' তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন 'ঈশ্বর কেবল একজন এবং আমাদের তার কাছেই প্রার্থনা করা উচিত। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন মুক্তি মিলবে কেবল সেই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনাতে। বলা যায়, ত্রিত্ববাদের ধারণার মূলেই আঘাত করেছিলেন তিনি।'

সাজিদের কথাগুলো আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম। শুনছিল ডেভিডও। সাজিদ বলল, 'কাহিনির কিন্তু এখানেই শেষ নয়, ডেভিড।'

ডেভিড বলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি আবার বলে বসো না যে—বিজ্ঞানী নিউটন ইলুমিনাতির সদস্য ছিলেন।'

আমি আর সাজিদ এবার খলখলিয়ে হেসে উঠলাম। হাসি থামিয়ে সাজিদ বলল, 'না, তা বলছি না। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, যিশুকে নিয়ে বিজ্ঞানী নিউটনের যে-ধারণা ছিল, ইসলামে যিশুর অবস্থানও অনেকটাই সে-রকম।'

'মানে?', প্রশ্ন করল ডেভিড।

'মানে, আমরাও বিশ্বাস করি স্রষ্টা কেবল একজন। আমরা বিশ্বাস করি যিশু কখনোই স্রষ্টার পুত্র ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন স্রষ্টার মনোনীত একজন রাসূল তথা বার্তাবাহক। আমরাও বিশ্বাস করি যাবতীয় প্রার্থনা তথা ইবাদত একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলারই প্রাপ্য। নিউটনের ঈশ্বর-ধারণার সাথে আমাদের ধারণার খুব কম পার্থক্যই রয়েছে।'

সাজিদের কথা শুনে ডেভিড বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'হলি কাউ!'

ডেভিডের মুখে 'হলি কাউ' শব্দদ্বয় শুনে আমি আর সাজিদ আবারও হেসে উঠলাম। আমার ধারণা এবারের বাংলাদেশ সফরের কথা ডেভিড সারা জীবন মনে রাখবে।

পরমাণুর চেয়েও ছোট

আমাদের এবারের বুধবারের আড্ডায় এসে হাজির হয়েছে মিলন, পঙ্কজ, নবীন, সবুজ আর সৌমিত্র। মিলন হলো ঢাবি ক্যাম্পাসের মেসি। ফুটবল নিয়ে তার কারিকুরি দেখলে মনে হবে এই ছেলের ডিএনএ-জুড়ে কোডিং-এর বদলে খালি ফুটবলই আছে। পঙ্কজকে আমরা চিনি গায়ক হিশেবে। সারা দিন গুনগুন করে গান করে সে। রবি ঠাকুর বলতেই অজ্ঞান সে। নবীন আমাদের সবার জুনিয়র। হালকা-পাতলা গড়নের এই ছেলেটি তার ছোট্ট পেটের মধ্যে দুনিয়ার সব তথ্য ভরে রাখে। তাকে ছোটখাটো একটি এনসাইক্লোপিডিয়া বললে খুব একটি বাড়াবাড়ি হবে না। সবুজ তার নামের মতোই সতেজ। সবসময় মুখে এক চিলতে হাসি জিইয়ে রাখে। চরম দুঃখের মুহূর্তগুলোতেও সে হো হো করে হাসতে পারে। সেকেন্ড ইয়ারে ড্রপ খাওয়ার পরেও সে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'জানিস, আমি না এক বছর ড্রপ খেয়েছি।' তার হাসিখুশি স্বভাবের সাথে পরিচয় না থাকলে সেদিন হয়তো তাকে আমি ম্যান্টালি ডিসঅর্ডারড ভেবে বসতাম। সবুজের একটি ডাকনাম আছে অবশ্য। তাকে আমরা সবাই 'এডিসন' বলে ডাকি। একবার সে মেয়েদের হলে গিয়ে একটি লাইট ঠিক করে দিয়েছিল। সেই থেকেই ওর নাম হয়ে গেছে বিজ্ঞানী এডিসন। আমাদের আজকের আড্ডার সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি হলেন সৌমিত্র দা। ডিবেট ক্লাবে আমি আর সৌমিত্র দা সবসময় এক পক্ষে থাকতাম। আমাকে একেবারে শুরু থেকেই প্রস্তুত করে নিতেন তিনি। বিতর্কের ছলাকলা সব আমি তার কাছ থেকেই শিখেছি।

আজকের আড্ডার টপিক ঠিক করা হলো বিজ্ঞান। বলবেন সৌমিত্র দা। আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'আরিফ, আড্ডা শুরুর আগে তুই আমাদের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনা। সবকিছুরই একটি উদ্বোধনী থিম থাকে। আমাদের আজকের আড্ডার উদ্বোধন হোক তোর আবৃত্তির মাধ্যমে।'

সৌমিত্র দার এই আবদারের সাথে তাল মিলালো পঙ্কজ আর মিলন। বলল, 'একদম ঠিক বলেছ সৌমিত্র দা।' আজকাল আরিফ আর আমাদের কবিতা শোনায় না। কবিতার কথা উঠলেই সে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়।

সৌমিত্র দা আমাকে বললেন, 'কীরে, অভিযোগ কি সত্য? কবিতার সাথে তোর এমন বিচ্ছেদের কারণ কী?'

আমি কিছু না বলে চুপ করে থাকলাম। সৌমিত্র দা আবার বললেন, 'কবিতার সাথে বিচ্ছেদ হোক আর যা-ই হোক, আজকে তোর কবিতা না শুনে আড্ডা শুরু হবে না, ব্যস।'

সৌমিত্র দার সাথে আবার মাথা নেড়ে সায় জানাল মিলন আর পঙ্কজ। তাদের জোরাজুরি কবি হেলাল হাফিজের দুই লাইনের একটি কবিতা শুনিয়ে দিলাম সবাইকে।

'নিউট্রন বোমা বোঝো
মানুষ বোঝো না।'

এই দুই লাইনের কবিতা আবৃত্তি শেষ হলেই সৌমিত্র দা জানতে চাইলেন, 'কবিতা শেষ?'

আমি বললাম, 'হুম'।

'কী বলিস! এত ছোট কবিতা দিয়ে কীভাবে উদ্বোধন হবে? উদ্বোধন হতে হয় বিশাল সাইজের কবিতা দিয়ে। জসীম উদ্দীনের 'কবর' কবিতা, ফররুখের 'পাঞ্জেরি' অথবা রবি ঠাকুরের 'সোনার তরী'র মতো সাইজে বিশাল না হলে কবিতা শুনে মজা আছে, বল?'

আমার বেশ রাগ লাগল। বললাম, 'দেখো সৌমিত্র দা, তুমি শুধু একটি কবিতা আবৃত্তিই শুনতে চেয়েছিলে। আমাকে কিন্তু কবিতার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কেমন হবে তা বলে দাওনি।'

কবিতার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের কথা শুনে খলখল করে হেসে উঠল সৌমিত্র দা। হাসি থামিয়ে বলল, 'রাগ করিস না ভাই। এমনিতেই মজা করলাম। তবে, হেলাল হাফিজের এই ছোট্ট কবিতাটি কিন্তু আমার অলটাইম ফেভারিট। আমি আমার সম্পাদিত লিটল ম্যাগ *স্ফুরণ*-এর স্লোগান হিশেবে এই দুই লাইন ব্যবহার করতাম।'

আমাদের আড্ডাস্থল থেকে অল্প দূরেই একজন বাদামওয়ালা বাদাম বিক্রি করছেন। শুকনো মুখে আড্ডা জমবে না বিধায় নবীন গিয়ে ত্রিশ টাকার বাদাম নিয়ে এলো। বাদাম মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে সৌমিত্র দা বলল, 'আরিফ যখন নিউট্রন বোমা নিয়ে কবিতা শোনাল, তখন আমারও ইচ্ছে করছে নিউট্রন-প্রোট্রন আর পরমাণুর গল্প বলতে। কী বলিস তোরা?'

সবাই 'হ্যাঁ' বলে সম্মতি জানাল। সবার সম্মতি পেয়ে বলতে শুরু করল সৌমিত্র দা। সবুজকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'অ্যাই এডিসন, তুই কি কখনো ডেমোক্রিটাসের নাম শুনেছিস?'

সবুজ কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'তুমি কি গ্রিক ফিলোসফার ডেমোক্রিটাসের কথা বলছ, যিনি প্রথম পরমাণুর ধারণা দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ', বলল সৌমিত্র দা, 'আমি তার কথাই বলছি।'

এই লোক ছিলেন একজন বিখ্যাত ফিলোসফার। যিশু খ্রিস্টেরও অনেক আগে জন্মেছিলেন তিনি। তার সমসাময়িক অন্যান্য দার্শনিকদের মধ্যে একটি প্রশ্ন নিয়েই কেবল হইচই হতো। প্রশ্নটি ছিল, 'এই মহাবিশ্ব আসলে কী দিয়ে তৈরি?'

দার্শনিকদের কেউ বলত মহাবিশ্ব হলো পানির তৈরি, কেউ বলত এই নিখিল বিশ্ব হলো বাতাসের তৈরি। কারও কারও মত ছিল এই মহাবিশ্ব আসলে আগুনের একটি পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। এরকম নানান কথা-উপকথা প্রচলিত ছিল তৎকালীন দার্শনিকদের মধ্যে; কিন্তু ওই সময়টায় বসে একেবারে ভিন্ন চিন্তা করতে পেরেছিলেন ডেমোক্রিটাস। তিনি কী বলেছিলেন জানো?'

'কী?', বলল মিলন।

'ডেমোক্রিটাস বলেছিলেন যে, এই মহাবিশ্ব বাতাস, আগুন, পানি কোনোকিছু দিয়েই তৈরি নয়। এই মহাবিশ্ব আসলে অসংখ্য অদৃশ্য ক্ষুদ্রতম কণার সমষ্টি।

ডেমোক্রিটাস সেই অদৃশ্য কণাগুলোর নাম রেখেছিলেন অ্যাটম।'

আমি বললাম, 'গ্রিক ভাষাতেও অ্যাটমকে কি অ্যাটমই বলা হতো?'

'ভালো প্রশ্ন', বলল সৌমিত্র দা। এরপর তিনি পকেট থেকে কলম আর এক টুকরো কাগজ বের করলেন। তাতে খচখচিয়ে কিছু একটি লিখে সেটি উল্টো করে আমাদের দিকে ধরলেন। আমরা দেখলাম তাতে একটি অপরিচিত ভাষায় লেখা άτομος

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটি কী?'

সৌমিত্র দা বললেন, 'গ্রিক ভাষায় অ্যাটমকে এভাবেই লেখে। ά অর্থ হলো 'Never' আর 'τομος' অর্থ হলো ' I Cut' । তার মানে άτομος শব্দের অর্থ দাঁড়ায়- Uncuttable। মানে, 'যা কাটা যায় না'।

অর্থাৎ ডেমোক্রিটাস বলেছেন, অ্যাটম হচ্ছে কণার সেই অবস্থা, যাকে আর ভাঙা যায় না, কাটা যায় না, বিভাজন করা যায় না। তিনি বলতে চেয়েছেন, এই মহাবিশ্ব এমন কণা দ্বারা তৈরি যেগুলো চাইলেই আর বিভাজন করা যায় না, আলাদা করা যায় না।'

এবার প্রশ্ন করল নবীন। সে বলল, 'তো, ডেমোক্রিটাসের এই কথা তখনকার সময়ে অন্যরা কি মেনে নিয়েছিল?'

'একদমই না', বলল সৌমিত্র দা। 'ডেমোক্রিটাসের সমসাময়িক দার্শনিক ছিলেন অ্যারিস্টটল। তখন তো চারদিকে অ্যারিস্টটলের ব্যাপক জনপ্রিয়তা। অ্যারিস্টটল যা বলত, সবাই তা বিনা বাক্যব্যয়ে বিশ্বাস করে নিত। কেউ কোনো আপত্তি করত না। ডেমোক্রিটাস যখন সবার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বললেন, মহাবিশ্ব আসলে আগুন, পানি আর বাতাসের তৈরি নয়, মহাবিশ্ব অ্যাটম দিয়ে তৈরি, তখন অন্য সবার সাথে ডেমোক্রিটাসের বিরোধিতা করেছিলেন স্বয়ং অ্যারিস্টটলও।'

'অদ্ভুত! অ্যারিস্টটলের মতো এরকম জ্ঞানী লোক কীভাবে ডেমোক্রিটাসের মতের বিরুদ্ধে যেতে পারে?', প্রশ্ন করলাম আমি।

হাসলেন সৌমিত্র দা। বললেন, 'আর বোলো না সেসব কথা। অ্যারিস্টটল জ্ঞানী লোক ছিলেন বটে, তবে তিনি জীবদ্দশায় যে-ভুলগুলো করে গিয়েছেন, সেগুলো

ছিল খুবই মারাত্মক লেভেলের। এমনকি, তার একটি ভুলের কারণে পদার্থবিজ্ঞান অন্ধকারে ছিল পুরো দেড় হাজার বছর।'

'কোন ভুল?', জানতে চাইল সবুজ।

'পৃথিবী ও সূর্যের ঘূর্ণন সম্পর্কে। অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন যে, সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তার কথা যেহেতু গ্রিকবাসীরা ঈশ্বরের বাণীর মতোই বিশ্বাস করত, তাই এই মতের বাইরে কেউ কিছু চিন্তা করলেও সেটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া হতো।'

সৌমিত্র দার কথা শুনে আমি বেশ অবাক হলাম। বললাম, 'আজব তো! অ্যারিস্টটল সত্যিই কি বিশ্বাস করত, সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে?'

'হ্যাঁ', বলল সৌমিত্র দা।

কথা বলতে বলতে ত্রিশ টাকায় কেনা বাদাম শেষ হয়ে গেল। সৌমিত্র দা আবার বলতে লাগলেন, 'যাহোক, প্রথমদিকে সবাই ডেমোক্রিটাসের বিরোধিতা করলেও পরে দেখা গেল ডেমোক্রিটাসই আসলে সঠিক ছিল। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুই ক্ষুদ্রতম সূক্ষ্ম কণার সমষ্টি। এটাকে বাংলাতে বলা হয় পরমাণু। পরম+অণু। পরমাণু হলো বস্তুর এমন একটি পর্যায়, যাকে আর ভাঙা বা বিভাজন করা যায় না। তবে মজার ব্যাপার হলো ডেমোক্রিটাস একটি জায়গায় সঠিক হলেও অন্য জায়গায় একদম ভুল ছিলেন।'

সৌমিত্র দার এই 'ভুল-ঠিক' এর মহড়া শুনতে শুনতে মনে হলো পৃথিবীর তাবৎ মহা ভুলগুলো সম্ভবত এই মোটা মাথার বিজ্ঞানীরাই করে গেছেন। নবীন বলল, 'ডেমোক্রিটাস কোন জায়গায় ভুল ছিলেন?'

'ডেমোক্রিটাস বলেছিলেন, পরমাণুই হলো বস্তুর সর্বশেষ অবস্থা। এরপর আর কোনো অবস্থা নেই। পরমাণুকে ভাঙা যায় না, বিভাজন করা যায় না ইত্যাদি; কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল, পরমাণুই বস্তুর পরম অবস্থা নয়। অর্থাৎ পরমাণুই বস্তুর শেষ অবস্থা নয়।'

পঙ্কজ বলল, 'আমি কিন্তু খুব মজা পাচ্ছি সৌমিত্র দা। আমার তো এখন মনে হচ্ছে এই বিজ্ঞানীদের আসলে বিশ্বাস করাই ঠিক না। হা-হা-হা।'

পঙ্কজের কথা শুনে আমরা সকলে হেসে উঠলাম। সৌমিত্র দা বললেন, 'বিজ্ঞান তো এমনই। ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায়। এ জন্যে এক নাম-না-জানা কবি বিচ্ছেদের পরে প্রেমিকাকে বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করে বলেছিলেন, 'তোমরা উভয়েই ছলনাময়ী।'

এরকম কালজয়ী কবিতা শুনে আমরা আরেক দফা হেসে নিলাম। সৌমিত্র দা আবার বলতে শুরু করলেন, 'ডেমোক্রিটাসের এই তত্ত্ব বিজ্ঞান মহলে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল। সতেরোশো সালেও বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, পরমাণুই হলো বস্তুর সর্বশেষ অবস্থা, যেটাকে আর কোনোভাবে ভাঙা বা বিভাজন করা যায় না। এরপর, ডেমোক্রিটাসের এই তত্ত্বকে আরও মজবুত ভিত্তি দেন ইংরেজ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন। আঠারোশো সালের দিকে এসে তিনি পরমাণুর গঠন নিয়ে একটি মতবাদ দেন। তার সেই মতবাদ পাঁচটি স্বীকার্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার দেওয়া সেই পাঁচটি স্বীকার্যের মধ্যে তিন নম্বর স্বীকার্যটি হলো, 'পরমাণুসমূহ কখনোই বিভাজিত, সৃষ্টি বা ধ্বংস হতে পারে না।'

ডাল্টনের এই মতবাদ আসার পরে ডেমোক্রিটাসের তত্ত্ব আরও শক্ত ভিত্তি পেয়ে যায়। এভাবে চলেছিল আরও বেশ কয়েক বছর। এরপর, আঠারোশো সালের শেষের দিকে এসে বিজ্ঞানী জে জে থমসন এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের ইতি ঘটিয়ে দিলেন।'

'কীভাবে?', প্রশ্ন করল সবুজ।

'বিজ্ঞানী জে জে থমসন পরমাণু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে পরমাণুর ভেতরে আরেকটি নতুন অবস্থা আবিষ্কার করলেন। সেটি হলো ইলেক্ট্রন। অর্থাৎ এতদিন ধরে যে বিশ্বাস করা হতো, 'পরমাণুকে ভাঙা যায় না, বিভাজন করা যায় না, পরমাণুই বস্তুর সর্বশেষ অবস্থা', তার যবনিকাপতন হলো। বিজ্ঞানী জে জে থমসন প্রমাণ করে দেখালেন, পরমাণুকেও ভাঙা যায়, বিভাজন করা যায়। পরমাণুকে বিভাজন করলে ইলেক্ট্রন পাওয়া যায়। ব্যস, রাতারাতি ভেঙে পড়ল ডেমোক্রিটাস আর জন ডাল্টনের মতবাদ। প্রতিষ্ঠিত হলো নতুন তত্ত্ব।'

আমি বললাম, 'কিন্তু বিজ্ঞান তো আর ইলেক্ট্রনেই বসে নেই। পরমাণুকে ভাঙলে এর অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউট্রন আর প্রোটনও পাওয়া যায়।'

'এক্সাক্টলি', বলল সৌমিত্র দা। 'আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হলো, কীভাবে একটি ভুল মতবাদ, ভুল তত্ত্ব দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে বিজ্ঞান মহলে টিকে ছিল চিন্তা করো।'

পঙ্কজ বলল, 'তার মানে আঠারোশো সালের আগপর্যন্ত পৃথিবীর কেউই জানত না—পরমাণুর চেয়েও ছোট বস্তু থাকতে পারে?'

'হ্যাঁ', বলল সৌমিত্র দা। 'বিজ্ঞানী জে জে থমসনের আবিষ্কারের আগে পৃথিবীর কেউই জানত না—পরমাণুর চেয়েও ছোট বস্তু থাকতে পারে। তখন সবাই এটাই বিশ্বাস করত যে, পরমাণুই হলো বস্তুর সর্বশেষ অবস্থা এবং একে আর ভাঙা যায় না।'

এতক্ষণ ধরে সাজিদ একটি কথাও বলেনি। এবার মুখ খুলল সে। বলল, 'সৌমিত্র দা, আমি একটু কথা বলতে চাই।'

সৌমিত্র দা বললেন, 'অবশ্যই অবশ্যই। আমি তো আরও ভাবছিলাম যে—আমার বলা শেষ হলেই আমি তোমার কাছ থেকে শুনব।'

'তোমার কি বলা শেষ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা। তোমার গল্পটি কিন্তু বেশ উপভোগ্য ছিল। তুমি তো জানোই যে, তুমি আমার প্রিয় একজন বক্তা।'

সাজিদের কথা শুনে হাসল সৌমিত্র দা। বলল, 'মাই প্লেজার!'

'তুমি বলছিলে, আঠারোশো সালের আগে পৃথিবীর কেউই জানত না, পরমাণুর চেয়েও ছোট বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে, রাইট?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু, আমি তোমাকে এমন একটি তথ্য শোনাতে পারি, যা শুনলে তুমি নিজেই অবাক হয়ে যাবে।'

'যেমন?'

হাসল সাজিদ। আমরা সবাই হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সে বলল, 'পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে পরমাণুর চেয়েও ছোট বস্তুর অস্তিত্ব থাকার ব্যাপারে ইঙ্গিত দেওয়া আছে।'

সাজিদের কথা শুনে চোখ কপালে উঠে গেল সৌমিত্র দার। ভীষণ অবাক হলো মিলন, নবীন, সবুজ আর পঙ্কজও। আমিও অবাক হয়েছি, তবে সাজিদ যখনই কিছু একটি বলতে চেয়েছে, তখনই বুঝতে পেরেছি যে, সামথিং ইজ দেয়ার!

সৌমিত্র দা বলল, 'রিয়েলি?'

'হ্যাঁ', বলল সাজিদ। 'আমি কি ব্যাখ্যা করব?'

'অবশ্যই করবে', খুব উত্তেজনাপূর্ণ গলা সৌমিত্র দার।

সাজিদ বলতে লাগল, 'কুরআনে সূরা সাবার তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, '[Allah is] the knower of the unseen. Not absent from him is an atom's weight within the heavens or within the earth or [what is] smaller than that or greater, except that it is in a clear register'.

অর্থাৎ, 'তিনি (আল্লাহ) অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডল আর ভূমণ্ডলের অণু-পরিমাণ জিনিসও তার অগোচরে নেই। এমনকি এরচেয়েও (অণুর চেয়েও) ছোট কিংবা বৃহৎ সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে।'

এই আয়াতে 'অণু-পরিমাণ' বোঝাতে আরবী 'যাররা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেটি এসেছে 'যাররাতুন' থেকে। সকল আরবী ডিকশনারিতে এই 'যাররাতুন' শব্দের অর্থ হলো, Atom, Smallest Piece, ক্ষুদ্রতম কণা ইত্যাদি।[১]

অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আয়াতে স্পষ্ট শব্দেই অ্যাটম তথা পরমাণুর কথা উল্লেখ করেছেন এবং এর ঠিক পর পরই তিনি বলেছেন, 'এটার চেয়ে, অর্থাৎ এই পরমাণুর চেয়েও ছোট কিংবা বড় যা কিছুই আছে, তার সবটাই তিনি লিখে রেখেছেন সুস্পষ্ট কিতাবে। পরমাণুর চেয়েও যে ছোট বস্তু থাকতে পারে, সেটি আঠারোশো সালের অনেক আগেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে-ভাষাটি ব্যবহার করেছেন, সেটাই সবচেয়ে চমকপ্রদ। তিনি বলেছেন 'অণুর চেয়ে ছোট জিনিস'। তিনি কিন্তু 'যাররা' তথা অণুর নাম নেওয়ার পরে বলে দেননি যে 'অণুর চেয়েও ছোট বস্তু

---

১ *A word for word meaning of the Quran*, by Mohammad Mohar Ali

ইলেক্ট্রন সম্পর্কেও আল্লাহ জানেন'। তিনি অণুর পরে আর কোনোকিছুর নাম নির্দিষ্ট করে বলেননি। তার মানে হলো, অণুর পরে ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রনসহ কেয়ামত পর্যন্ত যা-ই আসতে থাকবে, তার সবটাই ওই 'ছোট জিনিস' এর আওতায় পড়ে যাবে। এমন চমকপ্রদ ভাষাজ্ঞান আর আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বিষয়াদি কি কোনো নিরক্ষর মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব সৌমিত্র দা? আমরা যেটাকে আঠারোশো সালের জ্ঞান ভাবছি, সেই জ্ঞানের ঝলক তো আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরে এসেছিল।'

একটানা এতক্ষণ কথা বলার পরে থামল সাজিদ। আমাদের বিস্ময়ের রেশ যেন কাটছেই না কোনোভাবে। সৌমিত্র দা বললেন, 'ঘটনা সত্যি হলে এটি আসলেই ভাববার বিষয়।'

হেসে ফেলল সাজিদ। বলল, 'হ্যাঁ। কুরআন কিন্তু ভাবতেও বলেছে। কুরআন বলেছে, 'তারা কি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?'

সাজিদের কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আসরের আযান হচ্ছে মসজিদে। সেন্ট্রাল মসজিদ থেকে ভেসে আসা আযানটি আজ অন্যরকম ভালো লাগছে। এক অপূর্ব সুরের দ্যোতনা যেন মুয়াজ্জিনের গলায়।

লেখক-পরিচিতি

আরিফ আজাদ। জন্মেছেন চট্টগ্রাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সময় থেকেই লেখালেখির হাতেখড়ি। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করতেই বেশি পছন্দ করেন। ২০১৭ সালের একুশে বইমেলায় *'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ'* লিখে ব্যাপক জনপ্রিয়তা কুড়ান। বিশ্বাসের কথাগুলোকে শব্দে রূপ দিতে তার জুড়ি নেই। অবিশ্বাসের দেয়ালে অনুপম স্পর্শে বিশ্বাসের ছোঁয়া দিতে তার মুন্সিয়ানা রয়েছে। ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয় লেখকের পাঠকনন্দিত বই *আরজ আলী সমীপে*। এছাড়াও সম্পাদনা করেছেন *প্রত্যাবর্তন* এবং *মা, মা, মা এবং বাবা*'র মতো জনপ্রিয় বইগুলো। ২০১৯ সালে প্রকাশিত হলো লেখকের তৃতীয় মৌলিক গ্রন্থ, জনপ্রিয় সাজিদ সিরিজের দ্বিতীয় বই *'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২'*।

সমকালীন প্রকাশন-এর বইসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সংকলক সম্পাদক	[illegible]
০১	ফেরা	সিহিন্তা শরীফা এবং নাইলাহ আমাতুল্লাহ	মৌলিক
০২	পড়ো	ওমর আল জাবির	মৌলিক
০৩	আরজ আলী সমীপে	আরিফ আজাদ	মৌলিক
০৪	প্রত্যাবর্তন	আরিফ আজাদ	সংকলন
০৫	সবুজ রাতের কোলাজ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	মৌলিক
০৬	খুশূ-খুযূ	মাসউদুর রহমান	অনুবাদ
০৭	মা, মা, মা এবং বাবা	আরিফ আজাদ	সংকলন
০৮	তিনিই আমার রব	আব্দুল্লাহ মজুমদার	অনুবাদ
০৯	নানান রঙের মানুষ	রেহনুমা বিনত আনিস	মৌলিক
১০	জীবন পথে সফল হতে	আব্দুল্লাহ মজুমদার	অনুবাদ
১১	যে জীবন মরীচিকা	আরিফ আবদাল চৌধুরি	অনুবাদ
১২	নবীজি ﷺ	মুরসালিন নিলয়	অনুবাদ
১৩	তারাফুল	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	মৌলিক
১৪	সেইসব দিনরাত্রি	আব্দুল্লাহ মজুমদার	অনুবাদ
১৫	মেঘ রোদ্দুর বৃষ্টি	রৌদ্রময়ীরা	সংকলন
১৬	আর্গুমেন্টস অব আরজু	আরিফুল ইসলাম	মৌলিক
১৭	মেঘ কেটে যায়	আব্দুল্লাহ মজুমদার	অনুবাদ
১৮	গল্পগুলো অন্যরকম	সমকালীন টীম	সংকলন
১৯	সন্তান : স্বপ্ন দিয়ে বোনা	আকরাম হোসাইন	মৌলিক
২০	সবর	আব্দুল্লাহ মজুমদার	অনুবাদ